অগ্নিগর্ভ

অনুবাদ :

অশোক গুহ

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

আদর্শের জন্য যাঁরা দুঃখ সইছেন,

তাঁদের হাতে দিলাম বইখানি—

লেখক।

১০ই জুলাই, ১৯৩৫

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

অনুবাদক।

১লা মে, ১৯৪৬

লেখকের বক্তব্য

বইখানি লেখা হয়েছে বাস্তবতার উপর একটু বিশেষ জোর দিয়েই, হাঁ, সেদিক থেকেই চেষ্টা করেছি। আজকের এই যুগে যদি বীরত্ব আর ন্যায়ের উপর মানুষের শ্রদ্ধা থেকে থেকে, তাহলে এই বইয়ে যারা ভিড় জমিয়েছেন তাঁদের প্রশংসা করতে শত্রুও বুঝি কুণ্ঠিত হবে না। লেখকের তো মনে হয় সে-ন্যায়নিষ্ঠা মানুষ একেবারে হারায় নি। কিন্তু হায়, তার দেখা তো তেমন ভাবে মেলে না! তাই ঘটনা-সংস্থান আর পারিপার্শ্বিকতাকে বদলে দিতে হলো, বদলে দিতে হলো নাম ধাম আর তারিখ—যাতে ক'রে শত্রু তাঁদের হদিশ না পায় তাই বদলালাম। বইয়ের 'আমি' যে লেখক স্বয়ং নন একথা বলাই বাহুল্য, কিন্তু বইয়ের প্রতি ঘটনা তাই বলে কাল্পনিক নয় বরং বর্ণে বর্ণে তা সত্য—ওজন ক'রে দেখতে হয়েছে পদে পদে। আদর্শের জন্য যারা দুঃখ সইছেন, তাঁদের হাতে দিলাম বইখানি।

লেখার সময় :

১৯৩৪-এর ২৩শে ফেব্রুয়ারি

থেকে

১৯৩৫-এর ১০ই জুলাই

এইচ. এল

হিটলার-জার্মানীর আইন, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৩৭ সাল :

যে বা যাহারা কোনো দল গঠন এবং তাহার অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিবার প্রচেষ্টা করিবে…

যে বা যাহারা ইশতাহার বা পুস্তিকা প্রকাশ এবং বিতরণ করিয়া জন-সাধারণকে প্রভাবিত করিবার প্রচেষ্টা করিবে…

তাহাদের শাস্তি—মৃত্যু।

ভূমিকা

জার্মানী, ১৯৩৩ সাল। ধনতন্ত্রের চরম সঙ্কট তখন উপস্থিত। যে বুর্জোয়া গণতন্ত্র রুটির পরিবর্তে জনগণকে ভোটের অধিকার এতদিন জুগিয়ে আসছিল, তাদের মুখোশ খসে পড়ল। নির্লজ্জ ভাবে প্রকটিত হলো শোষক সমাজ-ব্যবস্থার ক্ষয়িষ্ণুতার বিকৃত রূপ। সেই বিকৃত রূপ ফাসিজম। কিন্তু হঠাৎ তার আবির্ভাব সেদিন হয়নি। জার্মানীর মাটিতে তার বীজ পড়েছিল বহুদিন আগে—১৯১৮ সালে। সেদিন জার্মানীতে এসেছিল বিপ্লব, সৈনিক আর শ্রমিকদের বিপ্লব, জনগণের বিপ্লব। সামরিক শক্তির পতন ক্ষমতা এনে দিল সর্বহারাদের হাতে। বুর্জোয়া আর পুরোনো সামরিক শ্রেণী বাধা দিতে সক্ষম হলো না। কিন্তু এত সুযোগ সত্ত্বেও সেদিন জার্মানীতে সোবিয়েত গড়ে ওঠে নি, সে এক ট্রাজেডি এবং সেই ট্রাজেডির নায়ক সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি।

জার্মানীর সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি একদিন মহান্ বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের উপর গড়ে উঠেছিল। তার শৈশব পুষ্ট হয়েছিল মার্কস-এঙ্গেলসের ভাবধারায়; তার পুরোধা ছিলেন বেবেল আর লিইব্‌নেক্‌ট। গত শতকে বিসমার্কের কূট সাম্রাজ্যবাদী দমন-নীতিকে একদিন পরাস্ত করতেও সে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু ১৯১৮ সালের আগেই সে তার সেই মহান্ উত্তরাধিকার থেকে চ্যুত হয়ে পড়েছিল। সে চাইছিল ধনতন্ত্র আর ক্ষয়িষ্ণু রাজতন্ত্রের সঙ্গে চুক্তি। ১৯১৪ সালের রাজতন্ত্রের যুদ্ধে সে নামল এবং ১৯১৮ সালে জনগণের স্বাধিকারের বিরুদ্ধে সে চুক্তি করল ভগ্নাবশেষ রাজতন্ত্র এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সঙ্গে। সোশ্যাল ডেমোক্রাট এবার্ট রাজতন্ত্র এবং বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি হিণ্ডেনবুর্গের সঙ্গে মিতালী পাতালো; উপ্ত হলো ফাসিজমের বীজ। জনগণের এই স্বাধিকার, সর্বহারাদের এই বিপ্লবকে বাঁচাতে পারে, তাকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারে, এমন কোন শক্তিশালী বিপ্লবী দল তখন জার্মানীতে ছিল না। (জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে গঠিত হয়।) সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি এমনি করেই বিপ্লবের সর্বনাশ করল, ফাসিজমের পথ দিল প্রশস্ত ক'রে।

তারপর পুরোনো সামরিক শ্রেণী আর প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চালাল জনগণের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন। রক্তের স্রোতে

ডুবে গেল বিপ্লব। রোজা লুক্সেমবুর্গ প্রাণ দিলেন ; সৈনিক ব্যারাকে ব্যারাকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির শাসন-যন্ত্রের আড়ালে ফাসিজম মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তাকে পুষ্ট করল ভার্সাঈ-এর দাসচুক্তি, তাকে উদ্দীপ্ত করল ১৯২৪ সালের জার্মানীর মুদ্রাস্ফীতি। তারপর ১৯৩৩ সাল। হিণ্ডেনবুর্গ তখন হিটলারকে চ্যান্সেলরী তখ্‌তে বসিয়ে দিয়েছেন। নির্বাচনী প্রতিযোগিতার দিন ঘনিয়ে আসছে। জাতির রায়ে নিরুপিত হবে জার্মানীর ভাগ্য, তার জনগণের ভাগ্য। কমিউনিস্টরা ফ্যাসিজমের এই বিস্তার দেখে বার বার সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির কাছে এক যোগে বাধা দেয়ার জন্য আবেদন জানাল। তাদের সর্বশেষ আবেদন জানাল রাইখস্টাগ্‌ ভস্মীভূত হবার পরে। কিন্তু সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি তখনও নীরব। তার আসন তখন টলমল করছে, তবু নিয়মতান্ত্রিকতার মোহ সে ছাড়তে পারলো না, ফাসিজমকে জাতির রায় হিসেবে স্বীকার ক'রে নিলো। এমনি ক'রেই বুর্জোয়া গণতন্ত্র ফাসিজমকে জার্মানীতে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে দিল। এই হলো তার ট্রাজেডি, এই ট্রাজেডিরই কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন লাইপমান তাঁর *Fire Underground*-এ।

লাইপমান *Fire Underground* বা 'অগ্নিগর্ভ' লেখেন ১৯৩৪-৩৫ সালের মধ্যে। জার্মানীতে তখন হিটলারী শাসন চলছে। তাই তিনি বস্তুনিষ্ঠ হতে প্রয়াসী হলেও নাম-ধামের বেলায় গোপনতা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি ভূমিকায় বলেছেন, এই গোপন আন্দোলনকারীদের নাম, ধাম, স্থান, কাল এমনভাবে পরিবর্তন করতে হয়েছে, যাতে তাদের হদিশ কেউ না পায়। এমন-কি নিজের জবানীতে বইখানি লিখেও এই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তিনি অস্বীকার করেছেন। তবে একথাও বলেছেন যে, বইএর প্রতি ঘটনাটি সম্পূর্ণ সত্যের উপর ভিত্তি করেই বর্ণিত হয়েছে।

বাস্তবের উপর ভিত্তি বলেই বইখানি উপন্যাসের চেয়েও হয়ে উঠেছে বিস্ময়কর। পাতায় পাতায় আমরা সেই শহীদ বীরদের দেখা পাই যাঁরা সর্বনাশা শত্রু ফাসিজমের হাত থেকে তাদের পিতৃভূমিকে বাঁচানোর জন্য অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু আন্দোলনে তবু বিরতি ঘটেনি। নাৎসী লোহার খুরের তলায়, অবর্ণনীয় ভীতির আড়ালে ছড়িয়ে পড়েছে আন্দোলন। ফাসিজমের উচ্ছেদসাধন হয়ে উঠেছে তাঁদের মূলমন্ত্র। এই শহীদদের একাগ্রতা, বীরত্ব, আত্মোৎসর্গ কি বৃথা হয়ে গেছে ? না। ভবিষ্যতে সাম্যবাদের বিজয়ের প্রতিজ্ঞা-পত্রে বুকের রক্ত দিয়ে স্বাক্ষর করেছেন যাঁরা—লাইপমান তাঁদের কথাই বলেছেন।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। একদিন জার্মানীর মাটিতে ফাসিজম যে শিকর চালিয়ে দিয়েছিল, আজ তা ছিন্নমূল। হিটলার নেই, নেই তার 'রক্ত আর মাটি'র নীতি। সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে জার্মানীর জনগণ। কিন্তু ফাসিজম তবু মরে নি। সাম্রাজ্যবাদের কূটনীতির আড়ালে আজও তার লালন পালন চলছে, তার নিশ্বাসে আর এক সর্বনাশা মহাযুদ্ধের বীজ ছড়িয়ে পড়ছে। জার্মানীর সেদিনকার সেই ইতিহাস তাই পুরাতনের আবর্জনায় আজও পর্যবসিত হয়নি। আজ পৃথিবীকে জানতে হবে তার ইতিহাস --তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য তাকে সতর্ক হতে হবে। জার্মানী রক্তসাগরে স্নান ক'রে যে শিক্ষা দিল, সেই শিক্ষা বিস্মৃত হলে আবার ফাসিজমের ঘূর্ণায় তাকে ডুবতে হবে, তলিয়ে যেতে হবে --একথা উপলব্ধি করার সময় পৃথিবীর এসেছে। লাইপমানের কাহিনীর সার্থকতাও নিহিত রয়েছে এইখানে।

মে দিবস   অশোক গুহ

১৯৪৬

পুনর্‌সংস্কৃত চতুর্থ সংস্করণ প্রসঙ্গে

হাইনৎস্ লাইপমান-এর আসল নাম আমরা জানি না, হিটলারী জল্লাদের হাত এড়িয়ে আজও তিনি বেঁচে আছেন কিনা, জানি না। পূর্ব-জার্মানীর সাংস্কৃতিক বিভাগে খোঁজ নিয়েও এই উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক সম্বন্ধে কোন খবরই আমরা জানতে পারি নি। কোন আলোকপাতই তাঁরা করতে পারেন নি।

বইখানির চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হলো। ইংরেজী বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে সমস্ত বাঙলা অনুবাদটারই পুনর্‌সংস্কার ক'রে গিয়েছেন অশোকবাবু মৃত্যুর কিছুদিন আগে। কিন্তু বইখানি তিনি দেখে যেতে পারেন নি। আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

প্রকাশক

১৯৬৭

———

এক

রাত। চারদিকে ঘন অন্ধকার। শোয়ার ঘরের জানালা দিয়ে দেখা যায় য়ুঙ্‌ফের্নস্টাইগের জনবিরল পথ, আর বসার ঘরের জানালা দিয়ে কলোনাদ। প্রতি জানালায় যদি মেসিনগান বসানো যায়, হামবুর্গের পশ্চিম দিকের প্রতিটি প্রবেশ-পথ শাসন করতে পারব। এই-ই হবে আমাদের ঘাঁটি।

শুয়ে আছি বিছানায়, ঘুম আসছে না। আঁধারে তাকিয়ে আছি ছাদের দিকে। দেয়ালপঞ্জীর পাতাটা বাতাসে ফুরফুর ক'রে উড়ছে। কত তারিখ আজ? একটু ঝুঁকে পড়ে দেখলাম; অন্ধকারের বুকে কালো হরফ চেনা যাচ্ছে—আজ সাতাশে। সাতাশে ফেব্রুয়ারি! বাইরে শান্ত, নিস্তব্ধ রাত, হামবুর্গের রাত। ঘুম আসছে না চোখে।

ক্রিঙ্‌, ক্রিঙ্‌, টেলিফোনটা বাজছে। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিলাম। এত রাতে টেলিফোন! ব্যাপার কী? কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই।

'অটো, অটো বলছি।...রাইখ্‌স্টাগে কারা আগুন লাগিয়েছে। গভর্ণমেণ্ট বেতারে জানিয়েছে কমিউনিস্টদেরই এই কাজ। ওরা নাকি ওখানে একটা লোককে গ্রেপ্তার করেছে, তার পরনে শুধু পাজামা, অথচ সে বলে পার্টি-কার্ডখানা সঙ্গে ক'রে আনতে ভোলে নি!'

'হুঁ...এ গভর্ণমেণ্টের কারসাজি!...'

'তা ছাড়া আর কি! এ নাৎসীদের কাজ। আর কে করবে বলো! নির্বাচনী প্রতিযোগিতার দু'দিন আগে রাইখস্টাগে আগুন লাগিয়ে ওরা একটা গোলমাল বাধাতে চায়।' অটোর উত্তেজিত স্বর ভেসে এল ফোনে। তার ঘন নিঃশ্বাসের শব্দও বুঝি শুনতে পাচ্ছি আমি।

'এখুনি যাচ্ছি, সবাইকে খবর দিয়েছ তো?' রিসিভারটা রেখে দিলাম।

ফোন করা আজকের দিনে বিপদ। হিটলার ক্ষমতা পেয়েছে তিরিশে জানুয়ারি। তারপর থেকে ডাক আর টেলিফোন বিভাগে বাইরে কোনো পরিবর্তন না হলেও ভিতরে ভিতরে অনেকখানি বদলে গেছে। শুধু কি তাই, আরো অনেক বিভাগে এসেছে পরিবর্তন। পিতৃভূমির পুরোনো মূল্য আজ ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। তাই সংক্ষেপে সারতে হলো।

ভাবলাম, উঠে পড়ি, কিন্তু আবার এলিয়ে পড়লাম বিছানায়।

বাইরে চঞ্চল হয়ে উঠেছে রাত, য়ুঙ্‌ফের্নস্টাইগের নীরবতা ভেঙে গেছে।

ভেসে আসছে ভারী বুটের শব্দ, উন্মত্ত পুলিশী মোটরের ভেঁপু। মহানগরী আড়মোড়া ভাঙছে। তার নিশ্বাসে ভেসে আসছে হাজার বোবা মানুষের আর্তনাদ। শুয়ে শুয়ে শুনছি। ইঁট-কাঠ-ইস্পাতের কফিনে শুয়ে কি তারা গোঙাচ্ছে ?

হামবুর্গ, বাণিজ্যকেন্দ্র হামবুর্গ। তার ডক আর কারখানা হাজার হাজার মানুষের জীবনীশক্তি নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, কারখানার চোঙ দিয়ে উড়ে ধোঁয়া হয়ে যায় তাদের রক্ত। তবু এই অপমানিত ও নিগৃহীত জীবনের মধ্যে দেখা দেয় অতীত আর আগামীর জঙ্গী নেতা। জার্মানীর ইতিহাস, জার্মানীর শ্রমিক আন্দোলনেরও জন্ম এইখানেই। কলের সিটির তীক্ষ্ণ চিৎকার, বাষ্পীয় হাতুড়ীর ঝন্‌ঝনানির ভিতরে এল্‌বের জাহাজ মেরামতের কারখানায় জার্মান মজুর একদিন নিজেদের চিনতে শিখেছিল। প্রথম মজুর সঙ্ঘের সভা বসেছিল এখানেই। সে আজ কতদিনের কথা ? বেশি দিনের নয়। কিন্তু আগাষ্ট বেবেলের দেওয়া সে-উত্তরাধিকার তারা হারিয়ে ফেলেছে। তাদের রূপ গেছে বদলে। দারিদ্র্য, অত্যাচার, নিপীড়ন তাদের মজ্জায় মজ্জায় ঘুন ধরিয়ে দিয়েছে, তাদের নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলেছে। আজ আর তাদের কিছু নেই।

কিছু কি নেই ? না, আছে। কিছুই ফেলা যায় নি। আজও ঘুন-ধরা অস্থি-পিঞ্জরের নিচে, ভয়ার্ত মনের কন্দরে লুকিয়ে আছে সাম্যবাদের বীজমন্ত্র, নতুন পৃথিবীর আহ্বান আর সুন্দরের স্বপ্ন। শত নিপীড়নে-নিষ্পেষণে তাকে মারতে পারে নি। ইতিহাসের প্রচণ্ড পদতাড়নায় আবার সে জাগবে, আবার জানাবে তার দাবি। হাঁ, নতুন ক'রে আবার শুরু করতে হবে।

রাইখস্টাগ পুড়ছে, দূরে বার্লিনে পুড়ে যাচ্ছে রাইখস্টাগ। তার সোনার চূড়া গলে গলে পড়ছে। আর আমি হামবুর্গের এই ঘরে শুয়ে আছি, মনে চেপে বসেছে গুরুভার।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম, কোনো রকমে পোশাক পরে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে। শহরের চেহারা যেন বদলে গেছে, বদলেছে রাতের চেহারাও। একেবারে আলাদা এক রাত। আজ আর পথে পথে বারবনিতাদের শিকারের অন্বেষণে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে না। নিঃস্তব্ধ পথে যে-কোন হতভাগ্যকে ম্লান হাসি হেসে অভ্যর্থনা করছে না তারা। দেহ-বিক্রয়ের ব্যবসা ভুলে এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। ঠিক যেন অভিজাত মহিলা। পথে শত শত লোক,

কিন্তু কারো প্রতি তাদের দৃষ্টি নেই। শুধু উত্তেজিত হয়ে ফিসফিস করছে। এমন কি পুলিশ দেখেও তারা আজ ছুটে পালাচ্ছে না। আঁধার-ভরা অলিগলিতে পুলিশদেরও তাদের দিকে নজর দেয়ার সময় নেই আজ। তারা চোখ পর্যন্ত টুপি নামিয়ে দিয়ে চলেছে বুটের শব্দ করতে করতে। প্রতি পদক্ষেপে ছড়িয়ে পড়ছে কিসের এক অশুভ ইঙ্গিত।

শহরের উত্তর দিক থেকে আসছে গুলির শব্দ। আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। বরং ঐ শব্দ না শুনলেই অশুভ আশঙ্কা আজকাল মনে ঘনিয়ে আসে। কিন্তু শব্দের তো বিরাম নেই। রাতের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কলোনাদের পথে আজ রাতের অভিসারের ফিসফিসানি উঠছে না; জনতার পদবিক্ষেপে সে আজ মুখরিত। কুয়াশা ঢাকা আলোগুলো রচনা করেছে বৃত্ত, আর সেই বৃত্তের ভিতরে অসংখ্য মুখ ফুটে উঠেছে। হাজার হাজার পুরুষ আর নারী। না, আজ আর প্রেমের বিলাস নয়, আজ তাদের কণ্ঠ রাত্রির নিস্তব্ধতাকে খান্ খান্ ক'রে ফেলছে। ঝাঁকে ঝাঁকে তারা আসছে, চলে যাচ্ছে, আলোর বৃত্ত পেরিয়ে কুয়াশায় যাচ্ছে মিলিয়ে।

পথের একধারে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম ওদের এই যাত্রা। কি চায় ওরা? কি জন্য আজ ওরা এসে দাঁড়িয়েছে পথে? কে ওদের নায়ক?

ওরা চলেছে; কুয়াশা-ঢাকা ম্লান আলোয় প্রেতের মত চলেছে কলোনাদের ওপর দিয়ে য়ুঙ্‌ফের্নস্টাইগের দিকে বিরাট জনসমুদ্র। রাইফেল কাঁধে পুলিশগুলো ওদের ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে পথ করার চেষ্টা করছে। জনতার মুখের দিকে তাকাচ্ছে পুলিশ, পুলিশের মুখের দিকে জনতা; সরে গিয়ে পথ ক'রে দিচ্ছে। কিন্তু চোখে জ্বলছে আগুন।

নিউ য়ুঙ্‌ফের্নস্টাইগের মোড়ে এসে পড়েছি! সামনেই 'চতুঃঋতু' নামে পান্থ-শালা বা হোটেল। এইখানেই অটোর সঙ্গে দেখা হবে। শুঁড়িখানার পাশেই সদ্য-খোলা নাইট ক্লাব। অভিজাতদের মজলিস। নাচ চলছে, বাজছে জ্যাজ; টেবিলে টেবিলে পুরুষ আর নারী: তরল হাসি আর কাঁটার ঝন্‌ঝনানি।

এখনো ভেসে আসছে গুলির শব্দ, জনতার চিৎকার। ওরা জমায়েত হয়েছে পথে, কেউ ওদের ডাকেনি তবু ছুটে এসেছে। আগামী কালের কর্মব্যস্ততার কথা গেছে ভুলে। কিন্তু এই রাতের অন্ধকারে কেন ওরা ছুটে এল, কি ওরা চায়? পুলিশের সারের পাশ দিয়ে ওরা চলে যাচ্ছে। বুটের খট্‌খট্ শব্দ বাজছে পথে, রাতের গভীরে বেজে উঠছে। য়ুঙ্‌ফের্নস্টাইগে এসে ওদের গতি শ্লথ

হয়ে যাচ্ছে, ওরা থেমে পড়ছে। স্নায়ুতন্ত্র চঞ্চল। ওরা চায় কিছু একটা ঘটুক, কি ওদের করনীয় কাজ হবে, আসুক তার নির্দেশ। রাত অন্ধকার, রাতের বুকে ওরা চাইছে প্রশ্নের হদিশ। হাওয়া বইছে জোরে।

কিন্তু কিছুই তো ঘটলো না। এল না নির্দেশ। পথ রইল অজানা। মানুষ রইল প্রতীক্ষায়। বুকে তাদের হতাশা।

হোটেলে ঢুকে পড়লাম, বাইরের জগত মিলিয়ে গেছে দোরের বাইরে ; এখানে চলছে জ্যাজ, উন্মত্ত, উদ্দাম নৃত্য। জমজমাট ; একেবারে নরক গুলজার !

ম্যাক্স আর হার্বার্ট আমাদের চির পরিচিত কোণটিতে বসে আছে। অটো এখনও আসে নি। ওর ফোন পেয়েই এরা ছুটে এসেছে।

আজ যখন সেদিনের কথা মনে পড়ে, ভাবি কেন সেদিন কলোনাদ দিয়ে ছুটে চলেছিল জনতা ? কেন আমরা অত রাতে সে-দিন অটোর আহ্বানে ছুটে গিয়েছিলাম ? নিজের মনকে উত্তর দিতে গিয়ে দেখি, উত্তর তার নেই। সেদিন ছিল আমাদের ভাগ্য পরীক্ষার দিন। আমাদের দেশের ভাগ্য, আমাদের সংস্কৃতির ভাগ্য, সমস্ত ইয়োরোপের ভাগ্য সেদিন সেই কুয়াশা-ভরা অন্ধকার রাতে স্থির হয়ে গেল। আমাদের নেতারা শুধু জানতে পারলেন না, সে-রাতের গুরুত্ব বুঝলেন না। তাঁরা তখন ঘুমে বিভোর ! অথচ রাতের গহ্বরে ভাগ্যের পাশা যে উল্টে গেল, টেরও তাঁরা পেলেন না। দিনের আলো কিন্তু টের পাইয়ে ছাড়ল, তাঁরা হলেন বন্দী। জাতির নিয়ন্তা যাঁরা, তাঁরা ঘুমের ঘোরে জাতিকে সঁপে দিলেন শত্রুর হাতে ; এক বিয়োগান্ত নাটকের যবনিকা পড়ল। সে-যবনিকা আবার কবে উঠবে কে জানে ! এ কি পাপ নয় ? এ কি ট্রাজেডি নয় ?

ওদের পাশে গিয়ে চেয়ার টেনে বসে পড়লাম। ম্যাক্স হামবুর্গের এক বনেদী সওদাগরী ফার্মের কেরানি। ছোট খাটো মানুষটি, চুল উস্কোখুস্কো, পোশাক আধ-ময়লা, গায়ে দোমড়ানো ওভারকোট। টেবিলের ঢাকনার দিকে চেয়ে একটা রুটির টুকরো নিয়ে অন্যমনস্কভাবে ভাঙছিলো। একেবারে নিশ্চুপ।

হার্বার্ট আমার দিকে তাকিয়ে বললে : 'এসেছ ?'

ম্যাক্সের সম্পূর্ণ বিপরীত হার্বার্ট। বেশভূষায় সৌখীন, এখানকার রঙ্গালয়ের সে অভিনেতা। প্রতিভাও আছে। কিন্তু টাকা আর প্রতিভার ব্যবহারে দিল্‌খোলা। পার্টির তালিকাভুক্ত সভ্য নয়, তবু পার্টির সঙ্গে আছে তার অন্তরের যোগাযোগ। সে অবশ্য তা স্বীকার করতে চায় না।

'বেশ, বেশ,' হার্বার্ট হাত ঘসতে ঘসতে বললে: 'এইবার আমরা অনেক কিছু দেখতে পাব। কে জানে, হয়তো গোয়েরিং নিজেই রাইখস্টাগে দেশলাই জেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। যদি দিয়ে থাকে, খুব ধড়িবাজ বলতে হবে, কিন্তু নাৎসীরা যেরকম দিন দিন ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছিল, আগুন এবার ওদের চাঙা ক'রে তুলবে। ওদের বাজার দর কমছিল, এবার হু হু ক'রে দর বেড়ে যাবে।'

ম্যাক্স এতক্ষণ আমাদের কথা শোনে নি। এবার সে জিজ্ঞেস করল: 'কি ব্যাপার?'

হার্বার্ট বলল: 'ঐ যে অটো আসছে!'

ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, অটো আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। দীর্ঘ চেহারা, সুপুরুষ, দেহে স্বাস্থ্যের দীপ্তি, মুখে দৃঢ়তা। ছ'বছর সে বেকার ছিল, সম্প্রতি এক মোটরের কারখানায় মিস্ত্রীর কাজ পেয়েছে। সে আমাদের কাছে এসে বসল। এই আমার বন্ধু অটো, এদের চেয়ে ওকেই আমার বেশি পছন্দ। ওর স্বচ্ছ উজ্জ্বল চোখে, দৃঢ় মুখে, পুরুষোচিত হাসিতে কি যেন আছে!

সে-রাতের কথা ভুলব না। তারপর কত দুঃখের রাত এসেছে, কেটে গেছে। কে তার হিসেব রেখেছে! কিন্তু সে-দিন—, সে-রাতে দুঃখের প্রথম রজনী শুরু হয়েছিল বলেই তার কথা আজও মনে স্পষ্ট আঁকা আছে। এক টেবিলে আমরা চার জন বন্ধু। নাচ চলছে, উঠছে নীল রক্তের পানোন্মত্ত হল্লা, ওদিকে বাইরে গুলির শব্দ, জনতার পদবিক্ষেপ, মেঘলা আকাশ। দুর্যোগের প্রথম রজনী এমনি করেই নেমে এল। তারপর শুরু হলো একটানা দুর্যোগের দিন। আমাদেরই একজন প্রাণ দিলে, একজন হলো পাগল, আর একজন উন্নীত হলো মহত্ত্বের পর্যায়ে।

ম্যাক্স অটোকে দেখেই জিজ্ঞেস করল: 'কি করব আমরা বল?'

হাবার্ট টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল: 'আমাদের জানতে হবে, রাজনৈতিক দলগুলো এখন কি করবে।'

আমি তাকিয়ে রইলাম অটোর মুখের দিকে। গম্ভীর মুখ, চিন্তার রেখা কপালে, মুখে দৃঢ় কাঠিন্য।

ব্যাণ্ড বাজিয়ে চলেছে জ্যাজ, উন্মত্ত জ্যাজ; নাচের ঢেউ বয়ে গেল, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে চলল আমাদের পরামর্শ। মাঝে মাঝে ছেদ পড়ছিল আলাপে, তখন ভেসে আসছিল বাইরের জনতার চিৎকার: "আমরা ভুখা মানুষ, আমাদের রুটি দাও—রুটি দাও।" এরই মধ্যে পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ

ক'রে দিল। এবার পথঘাট ফাঁকা, নেই ভুখ জানানোর জিগির। এদিকে চলছে নাচ-গান হল্লা।

হামবুর্গের আমোদ-প্রমোদের এলাকার নাম সেণ্ট পলি। সেণ্ট পলির পথে এসে পড়লাম আমরা। মিলের্নথরের কাছে এসে আমরা বিদায় নিলাম। ম্যাক্স বাড়ি চলে গেল। এক কামরার সাজানো-গোছানো ফ্লাট ওর। ও বারান্দা বেয়ে দরজার কাছে এল, নিঃশব্দে খুলে ফেললো দরজা, আলো জ্বাললো। ওর সামনে তখন দু'জন মানুষ নিঃশব্দে রিভলভার উঁচিয়ে আছে। ওর জন্য অপেক্ষা করছে তারা। ম্যাক্স গ্রেপ্তার হলো। বাকি আমরা তিনজন। আমরা গেলাম বিভিন্ন রাজনৈতিক সভায় সে-রাতে।

এখানে একটা কথা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, হাল-আমলের যুবকদের সন্ধ্যেটা কাটে এই রাজনৈতিক সভাগুলিতে। বসন্তের রাতেও তারা সঙ্গিনী জুটিয়ে নাচতে যায় না। মানুষের জীবন আর ভাগ্য নিয়ে তারা তর্ক করে না। বিশ থেকে ত্রিশ বছরের যুবকরা রাজনীতির চর্চাই করে। রাজনীতি তাদের কাছে প্রেম, সৌন্দর্য, ধর্ম, সবকিছুরই চাইতে বড়। এটা ভালো কি মন্দ, সে-প্রশ্ন আমি তুলতে চাই না। কিন্তু তাদের অন্য কোনো উপায় নেই। ১৯৩৩ সালের জার্মানীর সত্যিই রাজনীতি-চর্চা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। তারা জানত, ধর্মের কোনো অর্থ নেই তাদের জীবনে, ভালোবাসা তাদের কাছে বিলাস, জীবন নিয়ে তর্কের ধূলো ওড়ানো নিছক মুহূর্তের অপব্যয়। একমাত্র নতুন দিনের ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে এই রাজনীতির মাঝখানে, তাই তাকে তারা সবকিছু ছেড়ে আঁকড়ে ধরেছিল। ইয়োরোপের তরুণরা সেদিন প্রকৃতির সৌন্দর্য, ভালোবাসা আর ধর্মের স্থানে বসিয়েছিল রাজনীতিকে।

আমরা তিনজন তিনটি বিভিন্ন সভায় যোগ দিলাম। হাবার্ট তরুণ সোশ্যালিস্টদের সভায় চলে গেল। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যে এই দলটির বেশ প্রতিপত্তি। অটো চলে গেল ডক অঞ্চলে। আমি ইন্দ্রা রেস্তরাঁয় গিয়ে হাজির হলাম। আমরা তিনজন, না শুধু আমরা তিনজনই নই, লাখে লাখে লোক সে-রাতে শুধু একই প্রশ্নে মুখর হয়ে উঠল : 'কি করবো, কি করবো আমরা? কি করতে পারি আমরা?'

ইতিহাস একদিন এই প্রশ্ন আমাদের জিজ্ঞেস করবে, কি করতে পারতাম আমরা সে-রাতে? হাঁ, কি করতে পারতাম?

সেদিনকার জার্মানীর রাজনীতিক পরিস্থিতি ছিল জটিল। ন্যাশনাল-

সোশ্যালিস্ট, যারা চরম দক্ষিণপন্থী বলে লোকসভায় অভিহিত হ'তো, চৌদ্দ বছর ধরে যারা ছিল বিরোধীদল—তারা রাষ্ট্রপতির 'সাময়িক প্রয়োজনীয়তার আইনের' বলে জার্মানীর জাতীয়তাবাদী দলের সঙ্গে ভাগাভাগি ক'রে দেশ শাসনে এগিয়ে গেল। অন্যান্য দল এই নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানাল। হিণ্ডেনবুর্গ তাদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য ক'রে ৩০শে জানুয়ারি হিটলারকে চ্যান্সেলর মনোনীত করলেন। হিটলার রাইখস্টাগ বাতিল ক'রে নতুন নির্বাচনের আদেশ দিল। সেই নির্বাচনের তারিখ ৫ই মার্চ।

কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্টরা জার্মান পার্লামেণ্টে তখন দু'টি প্রধান দল। নির্বাচনী আসনগুলোর প্রায় অর্ধেক তাদের হস্তগত। কিন্তু হিটলারের বিরুদ্ধে এই দুই দল একযোগে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল না। কমিউনিস্টরা হিটলারের চ্যান্সেলর হবার পর এক সাধারণ ধর্মঘটের আন্দোলন তুলল। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা কিন্তু তাদের 'গণতান্ত্রিক আদর্শ' থেকে কিছুমাত্র বিচ্যুত হতে চাইল না। তারা জাতির 'শেষ রায়ে'র আশায় বসে রইল। সেই শেষ রায় বেরুবার দিন ৫ই মার্চ।

হিটলার ওদিকে জাতির রায়ের জন্য চুপ ক'রে বসে রইল না, সাহসও তার হলো না। ১৯৩২এর নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় একথা পরিষ্কার ভাবে বোঝা গিয়েছিল যে, ন্যাশন্যাল-সোশ্যালিস্টদলের প্রভাব জাতির উপর বেশ কমে এসেছে। তাদের সভ্যসংখ্যা প্রতিদিন হ্রাস পাচ্ছে। হিটলার তাই এমন একটা চাল চালল যাতে তার শত্রুরা বিপন্ন হয়ে পড়ে। এখন এই তার প্রয়োজন। এই চালের ফলে রাইখস্টাগ পুড়ল।

অগ্নিকাণ্ডের পরদিনই হিটলার-'সরকার' ঘোষণা করল, এই কাজের জন্য দায়ী হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি, আর তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে সোশ্যালিস্টরা। হিটলার একথাও বলল, জাতির আজ সাবধান হওয়ার দিন এসেছে, এই বদমায়েসদের প্রলোভনে তারা যেন প্রলুব্ধ না হয়। অগ্নিকাণ্ডের আগেই বামপন্থী পার্টিগুলির দলপতিদের নামে হুলিয়া বেরিয়ে গিয়েছিল, এগুলি বহুদিন আগেই তৈরি ক'রে রাখা হয়েছিল। এবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের খবরের কাগজ বাজেয়াপ্ত হলো, সভা, বিজ্ঞাপন, প্রচার-পুস্তিকা পর্যন্ত নিষিদ্ধ হলো। আজ সে-কথা স্মরণ করলে হিটলারী দলের অদ্ভুত কার্যকলাপের আর কর্মতৎপরতার কথা ভেবে অবাক হয়ে যেতে হয়। একটা মিথ্যাকে খাড়া করতে গিয়ে তারা কতখানি শঠতার আশ্রয় সেদিন নিয়েছিল! আর সেই মুখোশের আড়ালে

চলেছিল তাদের, নৃশংস নরমেধযজ্ঞ। পরবর্তীকালে প্রধান নাৎসী আদালত স্বীকার করতে বাধ্য হয়, কমিউনিস্ট বা সোশ্যালিস্ট পার্টি অগ্নিকাণ্ডের জন্ত দায়ী নয়। কিন্তু এতে নাৎসীরা লজ্জিত হয়নি। এই তো হিটলারী দলের স্বরূপ!

৩০শে জানুয়ারি থেকে ৫ই মার্চ পর্যন্ত দিনগুলো যেন কাটল দুঃস্বপ্নের ভিতর দিয়ে। এই ক'দিনে সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল। খসে পড়ল মৈত্রীর বন্ধন, ধসে গেল নীতি। বন্ধু, ভ্রাতা, নাগরিক-, মানবিক-মূল্যবোধ প্রভৃতি কথাগুলো যেন সব অর্থহীন হয়ে যেতে থাকলো। একদিকে রইল ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্ট —তারা চাইল শঠতা আর রক্তপাতে ক্ষমতা কেড়ে নিতে; আর অন্যদিকে আমরা—যাদের দল গেছে অথবা যাদের কোনো দল নেই।

কি করব আমরা? হত্যা করব? চেঁচিয়ে উঠব? না, পালিয়ে যাব? না, ওদের কাছে নতি স্বীকার করব, স্বীকার করব বশ্যতা? এড়িয়ে যাবার আর উপায় নেই। কি করব আমরা?

সেই রাতেই পাঁচ হাজার কমিউনিস্ট নেতা আর বুদ্ধিজীবীদের গ্রেপ্তার করা হলো। নাৎসীরা বুঝতে পেরেছিল, এঁদের আহ্বান শুনলে জার্মান জনগণ জেগে উঠবে, তাই তারা প্রথমেই কণ্ঠ রুদ্ধ ক'রে দিল তাঁদের। কারাপ্রাচীরে ব্যহত হয়ে হয়ে তাঁদের আহ্বান শুধু প্রতিধ্বনি তুলবে, বাইরের জনগণের কাছে এসে পৌছুবে না। সোশ্যালিস্টরা অবশ্য তাদের এই অপকর্মের ভাগীদার করার জন্য প্রতিবাদ জানাল, কিন্তু সে তো দুর্বলের প্রতিবাদ! রাইখস্টাগের আগুন তাতে নিবল না। অন্য দলগুলো রইল বোবা হয়ে।

আর আমরা জনগণ? ন্যাশনাল-সোশ্যালিজমের উন্মত্ত ঢেউ ধেয়ে এল আমাদের গ্রাস করতে, প্রতিরোধের কোনো উপায় রইল না। এই বিরাট বিশাল জার্মানীতে আমরা জনগণ পড়ে রইলাম একান্ত অসহায় অবস্থায়।

ইন্দ্রা রেস্তরাঁটা স্মুকস্ট্রাসের ঠিক কোণটিতে। আশে পাশে আরও কতকগুলো একই ধরনের রেস্তরাঁ। ঢুকেই সিঁড়ি, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে বিরাট হল্; ফাঁপা বেলুনের মত পর্দা ঝুলছে চারদিকে। ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে মিটমিট ক'রে, কেমন যেন একটা আলো-আঁধারি ভাব। প্রতি টেবিলে ছোট্ট আধারে শেড-দেওয়া আলো, ব্যাণ্ড বাজছে। হল্ লোকে ভর্তি, নাচের জন্য সবাই তৈরি হচ্ছে।

আল্টোনার ইন্দ্রা রেস্তরাঁয় বেশির ভাগ আসে বারেনফেলড্ কাগজ-কলের আর কনক্রিটের কারখানার মেয়েরা। বিকেল চারটে থেকে এগারোটার সিফ্‌টে কাজ সেরে মেয়েরা আর বাড়ি যায় না, সোজা এখানেই চলে আসে। যারা সকাল নটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত কাজ করে, তাদের কাউকে এখানে রাতে দেখা যায় না। এই মেয়েরা বেশীর ভাগই ঢেঙা দেখতে, মুখে কেমন একটা ম্লান ভাব, পোষাক তাদের অশ্লীল রকমের খাটো। লম্বা ধ্যাবড়া পা, সুঠাম গড়ন নয়। শিশুদের মত ড্যাবডেবে তাদের চোখ, ভাবলেশহীন। মনের দিক থেকেও এরা অতি হীন। কারখানার হাড়ভাঙা খাটুনী, পুরুষদের কাছ থেকে বিলোল কটাক্ষে রাতের পান-ভোজনের দাম আদায়, আর চলচ্চিত্রের নট-নটীদের কাহিনীর ভিতর দিয়ে এদের জীবন কাটে। তাদের সঙ্গে যারা নাচে, তারা বেশির ভাগই সেণ্ট পলির অন্ধকারের মানুষ। বেকার, চোর, নাবিক আর পুং-মৈথুনকারী। কখনও কখনও দু'-একজন উচ্চশ্রেণীর জীব উদ্দাম জীবনের সন্ধানে আসে এখানে। তারা ওদের সঙ্গে নাচে, পান-ভোজন করে, হৈ-হল্লায় উদ্দাম জীবনের খোঁজ পায়।

ইন্দ্রার ভেতরে আছে একটি ছোট ছবিঘর, সেখানে নির্বাক যুগের পুরোনো ছবি দেখানো হয়। এর জন্য পয়সা দিতে হয় না। ঘরটা সব সময়ই অন্ধকার। এটি শহরের চীনাদের আড্ডা। জাহাজের চীনা খালাসী, চীনা ধোপা, কারখানার চীনা শ্রমিকরা সাদা যুবতী মেয়েদের এখানে হামেশাই নিয়ে আসে। ছবি দেখার চেয়ে ওরা কথাই বলে বেশি। হঠাৎ যখন বাজনা থেমে যায়, তখন ওদের ফিসফিসানিও কমে আসে।

আমার কয়েকজন পরিচিত এখানে আসেন। আজ তাঁদের সন্ধানেই হল্-এ এসে দাঁড়ালাম। চার্লি চ্যাপলিনের ছবি শুরু হয়েছে পর্দায়। অন্ধকারে পথ ধরে এগিয়ে এগিয়ে চললাম। কিছু দেখা যায় না। হঠাৎ একটা চেয়ারে পা বেধে পড়ে গেলাম। কে একজন আমাকে হাত ধরে বসিয়ে দিল। এবার অন্ধকার চোখে সয়ে এসেছে। পাশে তাকিয়ে দেখলাম জন আর এস্ (—ওদের নাম আপনাদের কাছে গোপন করলাম)। ওরা দু'জন শালা আর ভগ্নীপতি, পার্টির নেতাবিশেষ। ওদের স্বাগত জানিয়ে করমর্দন করলাম। পর্দায় চলেছে চার্লির একটা পুরোনো ছবি। চারদিকে তাকালাম। আমার পেছনের সারে একটি চীনা তার স্বর্ণকেশী সঙ্গিনীর কোমর জড়িয়ে ধরে কানে কানে কি বলছে। সামনে কেউ নেই।

এস্ আস্তে আস্তে বললে: 'ফালেন্‌ৎসিন্‌কাম্পের পার্টির অফিসে ওরা এখনও হানা দেয়নি। আমাদের এখন অপেক্ষা করতে হবে। ওদের মতলব কি বুঝতে পারছি না।'

নৃত্যশালা থেকে ট্যাঙোর সুর ভেসে আসছে, পায়ের শব্দ আর হাল্কা হাসির টুকরো।

ফালেন্‌ৎসিন্‌কাম্প হামবুর্গের প্রাচীন রাজপথ। ভাসারকান্ট এলাকার কমিউনিস্ট পার্টির অফিস ওখানে। আগে ওখানে ছিল নীলরক্তের বাড়িগুলো, তাই শহরের প্রাণকেন্দ্র ছিল সে। এখন নীলরক্তের দল বাসা বেঁধেছে অন্যত্র, তাদের বাড়ি ভেঙে তৈরি হয়েছে মজুরদের আস্তানা। কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান ঘাঁটি এখানে, এখান থেকেই তাদের পত্রিকা "হামবুর্গ ফলকৎশাইতুঙ" বেরোয়। নিচের তলায় ছাপাখানা। তবে অফিস তার আলটোনায়ই আছে। যদি কোনদিন পত্রিকা প্রুশিয়ায় নিষিদ্ধ হয়, তাহলেও হামবুর্গে বেরুবে, তাই এই বন্দোবস্ত।

ট্যাঙো থেমে গেল, আবার আর-একটা গৎ বেজে উঠল। সবাই আবার নাচের আসরে জমায়েৎ। এক ফাঁকে এস্-কে জিজ্ঞেস করলাম: 'তুমি কি পার্টি-অফিস থেকে জিনিসপত্র সব সরিয়েছ?'

'আমি যে কি করব ভেবে পাচ্ছি না,' এস্ ইতস্ততঃ ক'রে বলল: 'বার্লিনে সংবাদ পাঠাবার কোন উপায় নেই। চার ঘণ্টা ধরে এখানে বসে আছি, জানি না এর মধ্যে হয়তো কত কি ঘটছে! বার্লিন থেকে নির্দেশ না পেলে তো কিছুই করতে পারছি না। অথচ বার্লিন থেকে টু শব্দটি নেই।'

জন হাসলো: 'ঘাবড়াচ্ছ কেন? সবে তো বিশেষ কিছু ঘটবার উপক্রম হয়েছে, গুন্‌গুনানি শোনা যাচ্ছে মাত্র, এখনি যদি ঘাবড়ে যাও তো, পার্টি বে-আইনি হলে কি করবে? চোদ্দ বছর ধরে পরিশ্রম ক'রে যে পার্টি আমরা গড়ে তুলেছি, শত্রুর একটা হুমকিতে তাকে ভেঙে দেব? মাথা ঠাণ্ডা রাখা এখন বিশেষ দরকার। বার্লিন-কেন্দ্র যদি চুপ ক'রে থাকে, আমরা আমাদের কাজ করব। আমরা পার্টির সব জিনিসপত্র, এমনকি পার্টির মুখপত্র "হামবুর্গ ফলকৎশাইতুঙ"এর সংখ্যাগুলো পর্যন্ত সরিয়ে ফেলেছি। অনেকে বলছিল, এ আমাদের মিথ্যে ভয়। হোক না মিথ্যে ভয়, সত্যিকারের ভয়ের দিনের জন্য একটা পোশাকী মহড়া দিয়ে রাখা গেল! তাই বা মন্দ কি?'

'কতক্ষণ লাগল কাজ শেষ করতে?' জনকে জিজ্ঞেস করলাম। জিনিস-পত্র তো আর কম নয়!

'কতক্ষণ আবার ? তিনঘণ্টা। এখন যা কিছু পড়ে আছে, তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আর কাজ কিন্তু খুব শক্ত হয় নি। এই দিন দুয়েক ধরেই তো এই কাজ চলছে।'

'কেউ দেখতে পায় নি তো ? কেউ লাগে নি তো আমাদের পেছনে ?'

জন হেসে বলল : 'অত কাঁচা কাজ করব নাকি ? একটা লোকও টের পায় নি। কি করলাম জানো ? ঘটা ক'রে মালপত্র নামালাম। সবাই জড় হলো দেখতে, পুলিশ, নাৎসী গোয়েন্দা, আমাদের দরদী—সবাই। চারটে ঠেলা গাড়িতে মালপত্র চাপিয়ে দিলাম। নাৎসী গোয়েন্দাটি ছুটল তার কর্তার কাছে ফোন করতে। এদিকে ঠেলা গাড়ি ডেকে মাল নামিয়ে ট্যাক্সিতে তুলে দিলাম। ট্যাক্সি-চালকরা আমাদেরই লোক !'

জন চুপ করল। পর্দা এবার সাদা হয়ে এল। আলো জ্বলে উঠল। দেখলাম, জনের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল। পরিচারিকা এসে আমাদের মদ পরিবেশন ক'রে গেল।

সেণ্ট পলির সবচেয়ে নোংরা পাড়ায় আমরা বসে আছি। আমাদের আশে পাশে সব ধাড়ি বদমায়েসের দল। হৈ হল্লায় তারা মগ্ন। বাজনা বাজছে। বাইরে য়ুঙ্‌ফের্নস্টাইগে শ্রমিকের দল চিৎকার করছে, "রুটি, রুটি চাই আমাদের, রুটি চাই !" তাদের মেয়েরা নাচছে ইন্দ্রায়, বাজনার তালে তালে পড়ছে পা, খাটো স্কার্ট অশ্লীলভাবে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। ওদিকে নগরী ঘুমে বিভোর।

বাজনা চলল। সাড়ে তিনটে বাজে। এক চীনা এসে খবর দিল : 'কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে পুলিশ হানা দিয়েছে।'

চীনারা এবার জোড়ায় জোড়ায় তাদের সঙ্গিনীদের নিয়ে বিদায় নিলো। আমরা চুপ ক'রে বসে রইলাম।

এক সময়ে এস্ উঠে পড়ে বলল : 'চল দেখি, বার্লিনের কোনো খবর পাওয়া যায় কি না !'

জন মাথা নাড়ল।

আমরা স্মুকৃস্ট্রাসের গেট গলিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। আসবার সময় দেখতে পেলাম, ক্লোকরুমে সিগারেট মুখে কে একটা লোক চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখেই সে টুপি তুলে অভিবাদন জানালো।

এস্ জিজ্ঞেস করল : 'কে ?'

'জানি না।' জন আমার মুখের দিকে তাকাল।

'আমি জানি।' আমি বললাম : 'ওকে এখানে সবাই "ডিউক" বলে ডাকে।'

ওঁরা আমাকে আর কোনো প্রশ্ন করল না। তাকিয়ে দেখলাম ডিউক আমাদের পেছনে পেছনে আসছে।

সে-রাতের কথা আমি ভুলব না। দুরন্ত শীতের রাত। স্মকুস্ট্রাসের চীনা রেস্তরাঁগুলোর দরজা-জানালা অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। একটা আলোর রেখাও এসে পড়ছে না পথে। মনে হয় সব যেন মৃত। হোটেলের পরিচারকরা রাতের কাজের শেষে আস্তানায় ফিরে চলেছে। কোটের কলার তাদের তোলা। আমাদের সামনে দিয়ে একদল বারবনিতা চলে গেল। আজ আর শিকার ওরা পায় নি, তাই ফিরে যাচ্ছে নিঃসঙ্গ ঘরে।

টালস্ট্রাসের মোড়ে এসে আমরা দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ আগে এখানে একজন চীনা খুন হয়েছে, তার হত্যাকারী ধরা পড়ে নি। এখানে ওখানে পুলিশ ; বিচ্ছিন্ন জনতা। জন আর এস্-এর মধ্যে তর্ক বেধে গেল।

'বার্লিনের নির্দেশ চাই—' এস্ বললে।

'না, বার্লিন নয়। আমরাই সব দায়িত্ব নিচ্ছি।'

এইখানেই ঠিক হলো পার্টি এবার গুপ্তভাবে কাজ করবে, প্রকাশ্যে আর পার্টির কোন চিহ্নই থাকবে না।

সেণ্ট্রাল স্টেশনে এবার আমরা এসে হাজির হলাম। ফোনে আরও কয়েকজনকে স্টেশনে আসতে বলা হলো। আধঘণ্টা পরে স্টেশনের বিশটা টেলিফোনের মধ্যে বারোটাতেই আমাদের কাজ চলতে লাগল।

রেলের টিকিটঘরের কর্মচারীরা তন্দ্রায় ঢুলছে, ওদিকে চলছে আমাদের ফোনে সংবাদ পাঠানো। দু'জন পুলিশের হঠাৎ কি জানি কেন সন্দেহ হলো। তারা আমাদের দিকে এগিয়ে আসতেই কোত্থেকে একটি ছোকরা ছুটে এসে তাদের একজনকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল। পুলিশ দু'জনও ছুটল তার পেছনে। আমরা আরো আধঘণ্টা সময় পেলাম।

স্টেশনের এলাকার মধ্যেই তারা তাকে ধরে ফেলল। তখন তার নাক দিয়ে ঝরছিল রক্ত। এদিকে আমাদের সংবাদ পাঠানো তখন শেষ। স্টেশনের কর্মচারীরা তখনো নিদ্রামগ্ন। তারা জানতে পারল না, আধঘণ্টার মধ্যে এক বিরাট গুপ্ত প্রতিষ্ঠানের জন্ম হলো তাদেরই নিদ্রালু চোখের সামনে একেবারে নাকের নিচে। আমরা এবার স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ফোনগুলো নীরব হলো। যাদের আমরা আহ্বান জানালাম, সেই নামহীন জনগণ বিছানা

ছেড়ে উঠে পড়ল। আজ এসেছে তাদের কঠোর কর্তব্যের মুহূর্ত। তারা যে বিশ্বাসকে এতদিন বুকের নিচে লালন-পালন করেছে, আজ সেই বিশ্বাসের জন্য এসেছে জীবন আহুতি দেবার প্রয়োজন। দশ মিনিটের মধ্যে তারা পারিবারিক পরিবেশ, সুখ শান্তি ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই মহান্ আত্মোৎসর্গে।

ভোরবেলা পার্টির কোনো নেতাকে নাৎসীরা তাঁদের বাড়িতে খুঁজে পেল না। তাঁদের স্ত্রীরা বলতে পারলেন না তাঁরা কোথায় গেছেন। কড়া পাহারা বসল স্টেশনে, উড়ো জাহাজের ঘাঁটিতে, হামবুর্গের পথে পথে। কিন্তু কোনো পাত্তা নেই তাঁদের। পার্টি তখন অন্তরালে চলে গেছে, কাজ শুরু হয়েছে। আর তার ভার নিয়েছেন অন্তরালের জেলা কমিটি।

এক বিরাট বামপন্থী সংস্থাকে গোপন আন্দোলনের কাজে রূপান্তরিত করা সহজ নয়। নতুন সংগঠনের ভিত্তি পত্তন করাই দুষ্কর। তাই পার্টি অন্তরালে গিয়ে প্রথমে নিপুণভাবে কাজ চালাতে পারল না। বেতারে তাদের খবর পাঠাবার বা পাবার কোন উপায়ই ছিল না। এমনকি, পার্টির যে দশহাজার বিশেষ সংবাদবাহক তৈরি হয়েছিল, চিঠি এবং ফোনে খবর পাঠানোও তাদের পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠল। ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্টরা আমাদের এই অসুবিধের কথা জানতো বলে আগে থেকেই তারা আটঘাট বেঁধে বসেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল জার্মানীর বামপন্থীদের ধ্বংস করতে হলে চাই হঠাৎ এবং অতর্কিত আক্রমণ। তারা যদি গুপ্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুযোগ পায় তাহলে নাৎসীদের আর জয়ের আশা নেই। তাই তারা রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে আক্রমণ ক'রে জার্মানীর প্রতি শহরের বামপন্থী নেতাদের বন্দী করার বেড়াজাল পেতেছিল।

এদিক থেকে তারা যে একটুও ভুল করে নি, একথা আমরা একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারি। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি বা ঐ ধরনের বহু বামপন্থী প্রতিষ্ঠান তাঁদের এই চাল ধরতে পারে নি বলেই সে-রাত নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে কাটিয়েছিল। তার ফলে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল জার্মানী থেকে। আর অন্যান্য বামপন্থী ছোটখাটো দল নিজেদের সত্তা বিসর্জন দিল ন্যাশনাল-সোশ্যালিজমের ঘূর্ণিতে। কমিউনিস্ট পার্টিতেও এই মিথ্যা নিরাপত্তাবোধের জন্য কম ক্ষতি হয় নি। পার্টির প্রধান অফিস সে-রাতেই ধ্বংস হলো, সেক্রেটারীরা যে যেখানে পারলেন পালালেন; তার ফলে বহুদিন

পর্যন্ত তাঁরা পার্টির গোপন আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলেন না। শুধু ভাসেরকাণ্ট এলাকায় নাৎসীরা পার্টি-অফিসের কাগজ-পত্র নষ্ট করতে পারে নি এবং জনের জন্যই তা সম্ভব হলো। সে রাইখস্টাগ-অগ্নিকাণ্ডের স্বরূপ বুঝতে পেরেছিল। তাই সে বার্লিনের নির্দেশের জন্য বসে থাকে নি। বার্লিনের নির্দেশের আশায় বসে থাকলে আজ এই গুপ্ত প্রতিষ্ঠানের জন্ম সম্ভব হতো না। হামবুর্গের পার্টিকে বাঁচাল জন, বাঁচাল জার্মানীর বামপন্থী আন্দোলন।

পরদিন ২৮শে ফেব্রুয়ারি ভোরে হামবুর্গের 'ফেম্‌ডেন্‌ব্লাৎ'এর প্রথম পাতায় প্রধান শিরোনামা দিয়ে বেরুল রাইখস্টাগের অগ্নিকাণ্ডের খবর। এই পত্রিকা প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় বিক্রি হয়। ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্টরা রাইখস্টাগ পোড়াবার ব্যাপারে এতো মেতে উঠেছিল যে, তারা লক্ষ্যই করতে পারল না এই কথাটি : মধ্যরাত্রির পরের বার্লিনের ঘটনার সংবাদ হামবুর্গের সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় ছাপা হয়ে পাঁচটার সময় শহরের পথে পথে বিলি হওয়ার মধ্যে কোনো অসম্ভব কিছু থাকতে পারে। এতেই বোঝা যায় ব্যাপারটাতে নাৎসীদের কতখানি হাত ছিল। যাঁদের বিপ্লবের দলিল সংগ্রহ করার বাতিক আছে, তাঁদের কাছে হামবুর্গের পত্রিকাটির এই সংখ্যাখানি অমূল্য সন্দেহ নেই। কিন্তু আজ জার্মানীতে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলেও এই সংখ্যাখানি মিলবে কি না সন্দেহ! কোনো জার্মান নাগরিকের হাতে এর একখানা কপি থাকলে তার মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য। নাৎসীরা ভুল করেছিল বটে, তবে তার প্রতিকারের জন্যও চেষ্টা করেছে। কিন্তু উৎপীড়ন ক'রে কি ভুলের প্রতিকার করা যায়?

যাক্‌, এবার আমরা নিজের কথায় ফিরে আসছি। ২৮শে তারিখ ভোরবেলা আমার বাড়িউলী এসে আমাকে জাগিয়ে খবর দিল, কমিউনিস্টরা রাইখস্টাগ পুড়িয়ে দিয়েছে।

কি চমৎকার ব্যবস্থা নাৎসীদের! কয়েক সপ্তাহ ধরে পুলিশের দপ্তরখানায় প্রায় হাজার হুলিয়া এসে জমা হয়েছিল; তাদের প্রত্যেকটির তারিখ ২৭শে ফেব্রুয়ারি। ২৭শে ফেব্রুয়ারি জাতির শত্রু, দেশের শত্রু কতকগুলো শয়তান রাইখস্টাগ পুড়িয়ে দেবে—পুলিশের কর্তারা নখদর্পণে একথা জেনেছিল, তাই আগে থেকেই হুলিয়া তৈরি হয়ে রইল। ২৭শে এল, পুড়ল রাইখস্টাগ, এক ঘণ্টার মধ্যেই জাতির শত্রুদের বিরুদ্ধে পরোয়ানা বেরুল। তারা ধরা পড়ল, উৎপীড়িত হলো আর বহু বহু হলো নিহত।

নাৎসীরা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নয়?

॥ দুই ॥

সেদিন ভোরে ঘুম ভাঙতে দেরী হয়ে গেল। রাতে শরীরের উপর কম ধকল যায় নি। আমার সেক্রেটারী দোরে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে না তুললে কতক্ষণ ঘুমোতাম ঠিক নেই। সে জানিয়ে গেল, কে এক ডিউক আমাকে ফোনে ডাকছে। একটু অবাক হলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার ঘরে কেন যোগাযোগ ক'রে দেয়া হয় নি। সেক্রেটারী উত্তর দিল, কদিন ধরে 'কল' সব বসবার ঘরেই আসছে। শোবার ঘরের ফোনের সঙ্গে 'যোগাযোগ' ক'রে দিতে 'রিসিভারটা' তুলে নিলাম। বুঝতে পারছি, গুপ্তচর এখন আমার পেছনেও লেগেছে। এই ফোনের ব্যাপারটায় তা বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল।

'হ্যালো! কে?'

'ডিউক, আমি ডিউক। আপনার সঙ্গে আমার জরুরী কথার দরকার। শুনুন, ভীষণ দরকার।'

'বেশ তো,' উত্তর দিলাম: 'সোমবার কি মঙ্গলবার কোথাও দু'পাত্র কফি খাওয়ার ব্যবস্থা করলেই তো হয়। তখন শোনা যাবে, কি বল?'

'না, না, আজই, সোম-মঙ্গলবারের জন্য ফেলে রাখলে চলবে না।'

'আরে তুমি যে উতলা হয়ে উঠলে বন্ধু! কি, কিছু টাকা ধার চাই? বেশ তো, আজই চারটের সময় আলস্টার প্যাভিলিয়নে যেখানে সংবাদপত্রের স্টলটা আছে, ওখানে চলে এস, ঠিক চারটে—মনে থাকে যেন!'

রিসিভার রেখে দিলাম। চিন্তার কথাই বটে। প্রথমত, আমার ফোনটার উপর শত্রুর গুপ্তচরের নজর পড়েছে। তার উপর সেন্ট পলির সেরা বদমায়েস ডিউক আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়! ব্যাপার কি?

আমি সাংবাদিক, সংবাদ সংগ্রহের খাতিরে কতরকম লোকের সঙ্গে আমাকে আলাপ করতে হয়। ডিউকের সঙ্গে আলাপ সেই পর্যায়েই পড়ে। কিন্তু নাৎসী-কর্তারা একথা বিশ্বাস করবে কি? ওরা যদি খবর পায়, সংবাদ সংগ্রহের পেছনে আমার আর-একটা উদ্দেশ্য আছে, আর সেটা নিছক রাজনৈতিক, তাহলে আর রক্ষে থাকবে না। যারা বন্দীশিবিরে, মৃত্যুদণ্ডিতের ডিগরীতে, কি পাগলা গারদে পচে মরছে, আমাকেও তাদের ভাগ্যের অংশীদার

হতে হবে। তাই ঠিক করলাম, এখন থেকে আমার কাজই হবে আমার সাংবাদিকতা ওদের চোখে বড় ক'রে দেখানো। উঠে-পড়ে খবর যোগাড় করতে লেগে গেলাম। সাংবাদিকতার মুখোশের আড়ালে রইল রাজনীতি, নাৎসীদের চোখে ধূলো দিলাম। আমার সঙ্গে সরকার আর বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টি—দুটোরই সমান যোগাযোগ রইল। ১৯৩৩এ যখন আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন সরকারের আর আমার উপর বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু আজ পর্যন্ত নাৎসীরা আমার সম্বন্ধে ঠিক ধারণা করতে পারে নি। এখনও তারা ভাবে আমি কে—সাংবাদিক, না, বে-আইনী সঙ্ঘের স্তম্ভ-বিশেষ?

সাংবাদিক হিসেব এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্রের প্রতি অলিগলি আমার চেনা। অন্ধকারের মানুষ যারা তাদের খবর আমি জানি। ওরা আমার সত্তার সঙ্গে যেন মিশে গিয়েছিলো। ডকের কুলি, সেণ্ট পলির বদমায়েসের দল, এল্‌বের মজুর-মজুরাণী, সবাই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাদের ভাবধারা, তাদের কথাবার্তা, সবই আমার চিরপরিচিত। আমার তিন-তিনখানা উপন্যাসের রসদ জুগিয়েছে তারাই। আজ বিপ্লবের আগুন যখন চারদিকে জ্বলে উঠেছে, তাদের মনে কি হচ্ছে, সে-কথা আমি জানব না তো কে জানবে?

১৯৩৩ সালের বসন্ত এল। ভীতি, নির্যাতন, নিপীড়নের পালা শুরু হলো। এল্‌ব আর ডক এলাকার উপর দিয়ে বয়ে গেল এক প্রবল অনুভূতির ঝড়। সাংবাদিক আমি, ওদের মধ্যে তখন কাজ করছি। আমার চোখ ছিল সজাগ, কান ছিল খাড়া। আর ছিল বিবেক।

হামবুর্গ আর আল্‌টোনার মাঝখানে, ফিন্‌কেনস্ট্রাস রাজপথ দিয়ে কিছুদূর গেলেই রাস্তার উপর একটা সাজানো বাড়ি দেখা যায়। শহরের ম্যুলেনকাম্প পাড়ার এক ফটোগ্রফোরের স্টুডিও। সেখানে দিবারাত্রি ফটো তোলা হয়। এই দুটি হলো গুপ্তদলের আস্তানা। কাজ চলেছে পুরোদমে।

৫ই মার্চের নির্বাচনী প্রতিযোগিতার ঠিক আগের দিন ম্যুলেনকাম্প-এর আস্তানায় গিয়ে উঠলাম। ফটোগ্রাফার ভদ্রলোকটি বেশ মোটা সোটা, মাথায় চক্‌চকে টাক। ১৮৯০ সাল থেকে তিনি সোশ্যালিস্ট। পুরো বারোটি বছর তাঁর কয়েদখানায় কেটেছে। তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয় ১৯৩৩এর নভেম্বর মাসে। ঝঞ্ঝাবাহিনীর হাতে নির্যাতিত হয়ে তিনি পরে বার্লিনের সেণ্ট হেডভিগ হাসপাতালে মারা যান।

স্টুডিওতে ঢুকে দেখলাম ফটোগ্রাফার একটা কাজে ব্যস্ত। আতসী কাঁচ আর সাঁড়াশি নিয়ে কি সব করছেন। আমাকে দেখেই বললেন: 'আর পারি না। আজ এরই মধ্যে ষোলখানা ছবি তুলেছি। তিনদিন ধরেই এমনিধারা চলছে। এর মধ্যে ছ'ঘণ্টা মোটে ঘুমিয়েছি। বসেছি সেই বিষ্যুদবারে বেলা চারটের সময়, আর এখনো জিরোবার সময় পাচ্ছি না। এই তো আজ চারটের সময় একটি পরিবার এসে হাজির। তাদের চারজনকে আজই জাহাজে ওঠার বন্দোবস্ত ক'রে দিতে হবে। আবার কাল এল আর-একজন। তাকেও দিতে হবে সুবিধে ক'রে। তারও ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছি। কিন্তু আমার কাজ কে করে?'

ভদ্রলোক কথা বলছিলেন আর কাজ করছিলেন। আরো দু'জন লোককে দেখলাম, তারাও নিঃশব্দে কাজ ক'রে যাচ্ছে। আমার কৌতূহল হলো, ঝুঁকে পড়ে দেখলাম, কি করছে ওরা। পাসপোর্ট জাল করছে। এমন সময় ওদের মধ্যে একজন কেসে উঠল। কাসির দমকে আমার সঙ্গে ওর মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। ফটোগ্রাফার বুঝতে পেরে বললেন: 'ও! আমাদের খেলা আপনি ধরে ফেলেছেন দেখছি! কিন্তু এ খেলা নয়, এর উপর অনেকের জীবন-মরণ নির্ভর করছে।'

তারপর তিনি বললেন, কি ক'রে তারা এক সোশ্যালিস্ট কমরেডের সাহায্যে সরকারের ছাপাখানা থেকে কাগজ চুরি ক'রে এনে এই পাসপোর্ট জাল করছেন। কাল দুপুরের মধ্যে অনেকগুলো পাসপোর্ট তৈরি ক'রে ফেলবেন, অনেকগুলো জীবন বাঁচবে।

যারা কাজ করছিল তাদের মধ্যে একজন বলে উঠলো: 'যদি চারটে মানুষের মুখের খাবার না যোগাড় করতে হতো, দেখতেন কি করতাম।'

এ তার গর্ব, নিছক গর্ব। অথচ ফটোগ্রাফারের মুখে গর্ব নেই। তিনি ইনামের আশা রাখেন না, পার্টির সভ্যও নন, শুধু মতবাদের প্রতি তাঁর আছে দৃঢ় বিশ্বাস, তাই এ কাজ করছেন।

ফটোগ্রাফারের স্টুডিও থেকে বেরিয়ে চললাম এস্‌প্লানেডের দিকে। এই-খানেই কমিউনিস্টদের প্রধান অন্তরালের ঘাঁটি। পথে নেমে লক্ষ্য করলাম, এক অদ্ভুত দৃশ্য। হাজার হাজার লোক শহরতলী থেকে শহরে আসছে। পথে ভয়ানক ভিড়। পুলিশ, ধূসর কোর্তাধারী নাৎসীরা পথের কোণে কোণে জটলা করছে। তাদের পোশাকের 'স্বস্তিকা' বিকেলের আলোয় চকচক ক'রে উঠছে।

এস্প্লানেড়ে এসে খবর পেলাম সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের দলের প্রধানরা এক গোপন বৈঠকের জন্য হামবুর্গে এসেছেন। খবরটা গোপন কেন্দ্রে দিয়েছেন একজন ওয়াকিবহাল ইংরেজ সাংবাদিক। আমি সাংবাদিকটির চিঠিখানা দেখলাম। উত্তেজনাপূর্ণ চিঠি। সব সাংবাদিকই বুঝি তখন পরিবেশের উত্তেজনায় অস্থির; কেউ জানে না কি হবে। সেই দিনগুলির কথা আজও ভুলিনি, উত্তেজনাই তখন জীবন। মনে হতো, আমরা যেন যুদ্ধ-সীমান্তে বসে আছি। খবর যোগাড় করছি।

গোপন বৈঠকের খবরের জন্য সর্বসাধারণের ব্যবহারের টেলিফোনে ভাণ্ডারলিককে ডাকলাম। ভাণ্ডারলিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের বিখ্যাত মুখপত্র "হামবুর্গ একো"র সম্পাদক। সন্ধ্যেয় লেসিং থিয়েটারের সামনে দেখা করার বন্দোবস্ত হলো।

ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম ফিন্‌কেন্‌স্ট্রাসে। ফটোগ্রাফার বন্ধুটি এইখানে আমাকে আসতে বলেছিলেন। পরিচারিকারা যে দরজা দিয়ে আসে-যায় সেখানে এসে ঘণ্টি টিপলাম। টিপতেই একটি সুশ্রী মেয়ে এসে দোর খুলে দিল। সে-ই বাড়ির কর্ত্রী। এখানে আমাকে সেই শ্রান্ত ক্লান্ত ফটোগ্রাফার বন্ধুটির সঙ্গে দেখা করতে হবে। তিনি বসে ঝিমুচ্ছিলেন। তাঁকে আর বিরক্ত করলাম না। মেয়েটি আমার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল; বলল: 'এত কাজ পড়েছে, কি বলব। আমি কার্লের সঙ্গে খাটছি তবু শেষ ক'রে উঠতে পারছি না। আরও দু'একজন লোক হলে ভাল হতো।'

'অসম্ভব—' ফটোগ্রাফার নড়েচড়ে বসলেন: 'নির্বাচনের পরে লোকের কথা বোলো। এখন বেশী লোক আনলেই বিপদ। আর তোমাকে কি খুবই খাটাচ্ছি?''

ফটোগ্রাফার পকেট থেকে কতকগুলো ফটো বার ক'রে গুনতে লাগলেন। বারোখানা, তোমার কাছে আটখানা। সবশুদ্ধ বিশখানা। এ ক'খানা তুমি করতে পারবে না?'

'বারে! আরো যে চারখানা আছে! ট্রালফ তখন দিয়ে গেল?'

'ট্রালফ! কে ট্রালফ?'

'আইম্‌স্‌বুত্তেল থেকে যে এসেছিল। সে বললে, সোশ্যালিস্ট-ওয়ার্কার্স পার্টির লোক সে।'

ফটোগ্রাফার লাফিয়ে উঠে বললেন: 'যাও, যাও শিগগির ফটোগুলো নিয়ে এস তো!'

মেয়েটি কাছেই একটা দেরাজের টানা খুলে বার করলো ফটো।

'কখন আবার আসবে, কিছু বলে গেছে ?'

'সাতটায়।' মেয়েটি ভয় পেয়েছে। তার মুখ ফ্যাকাশে।

আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। এখন ছ'টা পনেরো।

ফটোগ্রাফার ছবিগুলো উল্টে দেখে চিৎকার ক'রে বলে উঠলেন : 'কথা যদি শোন, তাহলে এই মুহূর্তেই বাড়ি থেকে পালাও। সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করো না। সাতটা কেন, সাড়ে ছটা পর্যন্তও করা উচিত হবে না।'

মেয়েটি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

'হাঁ ক'রে দেখছ কি, পালাও।'

'কিন্তু কার্ল—কার্ল যে রইল ?'

'তা হলে যা খুশি করো, আমি জানি না।' ফটোগ্রাফার বন্ধুটি উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। 'আমি তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে চাইনে, তাছাড়া হুকুম দেবারও আমার এক্তিয়ার নেই।'

মেয়েটি ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলল।

আমি ওকে বুঝিয়ে বললাম : 'কার্লের জন্যে ভেবো না। তাকে কমরেডরা আগেই সাবধান ক'রে দেবে। তোমার কোন ভয় নেই। আর ফটোগ্রাফারের ভুলও হতে পারে। রাতে ফিরে এসে দেখবে সব ঠিক আছে।'

অনেক বুঝিয়ে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বেরিয়ে প'ড়লাম। কাগজপত্র, ফটোগ্রাফ সব সঙ্গে নেওয়া হলো, শুধু পড়ে রইল কলটা। ফটোগ্রাফার বন্ধুটি কলটার দিকে একবার তাকালেন হতাশভাবে। আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। নবিস্টর পাড়ায় এসে ফটোগ্রাফার কা'কে ফোন করলেন। দশ মিনিট পরে কার্লের বাড়ির উল্টো দিকের একটা সরাইখানায় একজন মজুরকে দেখা গেল। কার্ল সাড়ে ছটায় ফিরল, তাকে সতর্ক ক'রে দিল মজুরটি। পুলিশ এল সাতটা বাজতে দশ মিনিটে। পাখী তখন উড়ে গেছে। আস্তানা ফাঁকা।

এবার এই ট্রালফের উপর রাখা হলো কড়া নজর।

নাৎসীরা নিজেদের দলে বিশ্বাসঘাতকের সন্ধান পেলে গোপনে বিচার ক'রে তাকে হত্যা করে। তারা আদিম মানুষের সোজা পথ ধরে চলে। মধ্যযুগের জার্মানীতে এমনি গোপন বিচার চলত। সেই সব গোপন বিচারালয়ের নাম ছিল 'ভেমি'। কিন্তু কমিউনিস্টদের অন্য পথ। যদি তারা বুঝতে পারে যে, লোকটা এখনো জানতে পারেনি, পার্টি তাকে সন্দেহ করছে, তাকে তারা তাড়িয়ে

দেয় না। পার্টির মধ্যেই সে ঘোরাফেরা করে, তবে তার উপর থাকে কড়া নজর যাতে সে ক্ষতি করতে না পারে। ট্রালফ পার্টিতেই রয়ে গেল, তার গতিবিধির উপর বসল পাহারা। ট্রালফ ছিল সোশ্যালিস্ট লেবার পার্টির সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র-বিশেষ। আমার উপর ভার পড়ল ট্রালফের কথা তাদের জানিয়ে দিতে।

সোশ্যালিস্ট লেবার পার্টির সভ্যরা কমিউনিস্ট আর সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যপন্থী। পঞ্চাশ হাজার তাদের সভ্য সংখ্যা, পাঁচশো সঙ্ঘে তারা বিভক্ত। বার্লিন, ব্রেসলাউ, হামবুর্গ আর স্যাক্সনিতেই তাদের প্রভাব বেশী। আমি একজন উকিলকে ফোনে বার বার ডাকলাম। এই লোকটি সোশ্যালিস্ট লেবার পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু তার পাত্তা মিললো না।

চারটের কিছু আগেই আলস্টার প্যাভিলিয়নে এসে পৌঁছলাম। এখানে ডিউকের সঙ্গে দেখা হবার কথা। বসন্ত এসেছে, হাওয়া বইছে, সূর্যের আলো পড়েছে প্যাভিলিয়নের উপর। আকাশ নীল। বহুলোক জমেছে প্যাভিলিয়নে। টেবিলে কথার গুনগুনুনি; বাজনা বাজছে। আমিও একটা টেবিলে বসে পড়লাম, এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডির ফরমায়েস দিয়ে আপন মনে ভাবছিলাম, কি অদৃষ্ট। বাঁচবার জন্য না লিখে লেখার জন্য আজ বেঁচে থাকার প্রয়োজন এসেছে। আর তারই তাগিদে ঘুরে বেড়াচ্ছি এই গুপ্ত আবহাওয়ার অন্ধকারে। অথচ আমি কোনো দলের কেউ নই, আমি একজন সাংবাদিক, খবর ফেরি ক'রে আমার দিন চলে।···

হঠাৎ কার ডাকে চিন্তার খেই হারিয়ে ফেললাম। তাকিয়ে দেখি, ডিউক পাশের একটা টেবিল থেকে আমাকে ডাকছে। আজ সে বেশভূষায় ফিট-ফাট। দাড়ি কামানো, নখগুলো পর্যন্ত ভালো ক'রে কাটা। সামনে এক গেলাস-ভর্তি টকটকে লাল সুরা। দেখে মনে হলো বেশ খানিকটা টেনেছে। তবে বেসামাল হতে এখনো ঢের বাকি। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম: 'কি ব্যাপার?'

দূরে দেখলাম হার্বার্ট আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

ডিউক একটা চেয়ার টেনে আমাকে বসিয়ে বলল: 'আমি কাজ করতে চাই।'

'কত বয়েস তোমার?'

'উনত্রিশ। আমি সত্যিই কাজ করতে চাই, আপনার সঙ্গে চালাকি খেলার ইচ্ছে আমার নেই। আমি ওদের ডেকে বলেছি, ভাই সব, কোকেন আর মেয়ে নিয়ে খেলার দিন ফুরিয়ে গেছে। এখন এসেছে কাজের সময়। এখন আপনি

ছাড়া আর কে উপায় বাতলে দেবে! আপনি মস্ত লিখিয়ে, আপনি আমাদের নাড়ীর খবর রাখেন।'

বাজনা বাজছে, ওয়াল্‌ৎসের সুর ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের পাশের টেবিলে এক বুড়ি গোগ্রাসে কেকের পর কেক গিলছে; ও কোণে হার্বার্ট আর কে-একটি মেয়ে। একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, তারপর আস্তে আস্তে বললাম:

'কাজ! কাজের ভাবনা কি! এর জন্যে আমার সঙ্গে দেখা করার কোন দরকারই ছিল না। যে কোন একটি বামপন্থী দলে নাম লেখালেই তো পারতে?'

'আমার তো সুনামের অন্ত নেই। ওরা আমাকে নেবে কেন? আমার একটা কথাও কি ওরা বিশ্বাস করবে?'

'আমি এখন কি করব বল?'

'আপনি তো আমাদের চেনেন, আমরাও আপনাকে চিনি। তাই তো আপনার কাছে ছুটে এলাম।'

'তোমার সেণ্ট পলির দল জানে, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ?'

'না, তারা কিচ্ছু জানে না। শুধু জানে, আমি কাজ খুঁজছি। কেউ আমার পেছু পেছু আসেনি। তা ছাড়া—ওদের তো আপানি জানেন।'

'কিন্তু দু'জনে মিলে কি কাজ করব বলতো?'

ডিউক আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর ধীরে ধীরে বলল: 'আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না?' তার মুখ করুণ।

আমি টেবিলের তলায় তার হাতখানা ধরে একটু চাপ দিলাম। তার মুখ উজ্জল হয়ে উঠল। সে এবার হাতখানা সরিয়ে নিয়ে পকেট থেকে কি একটা বার করল। নিচের দিকে চেয়ে দেখলাম। তার হাতে একটা রিভলভার। ভয় পেলাম, এদিক ওদিক তাকালাম, আজকাল সঙ্গে রিভলভার থাকা মানেই বিপদ। পুলিশ পথে পর্যন্ত খানাতল্লাসী করছে। ডিউক রিভলভারটা পকেটে রেখে, ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে বার করল ঝঞ্ঝাবাহিনীর কার্ড। তার নাম আর ফটোযুক্ত। আমি হাতে নিয়ে দেখলাম, তারপর ফিরিয়ে দিলাম।

সে শান্তভাবে বলল: 'ঝঞ্ঝাবাহিনীর সভ্য হিসেবে রিভলভার আমি সঙ্গে রাখতে পারি। যদিও আমি বেশী দিনের পুরোনো নই, তবুও এরই মধ্যে আমার বেশ নামডাক হয়েছে। হয়তো শীগগিরই একজন হোমরা বনে যাবো। আমাকে আপনি ঠিকানা বাত্‌লে দিলে সেখানে হামেশা আপনার সঙ্গে দেখা-করা চলবে।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত ক'রে বললাম: 'য়ুঙ্‌ফের্নস্টাইগে সাধারণের টেলিফোন-

কুঠরীটা জান তো? ঐ যে পথের বাঁ দিকে পড়ে। ওখানে ঢুকে ফোন ডাইরেক্টরীর ২৩৪ পৃষ্ঠা খুলে তোমার যা খবর আছে লিখে রাখবে। পুরোপুরি লিখো না। প্রতিটি শব্দের তৃতীয় অক্ষর বাদ দেবে। পরদিন গিয়ে আবার ঘসে তুলে ফেলবে লেখা। কিন্তু সাবধান, নাম-টাম কখনো লিখো না। আর খুব নজর রাখবে, কেউ পিছু নিয়েছে কিনা।'

আমি এবার মদের দাম চুকিয়ে দিয়ে টেবিল থেকে উঠে পড়লাম।

হার্বার্ট এখনো কোণটিতে বসে আছে, সঙ্গে এক স্বর্ণকেশী মেয়ে। আমাকে দেখেই হার্বার্ট ডাকল। মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় হলো। ইনি ফ্রাউ বি, অভিনেত্রী। হার্বার্টের সঙ্গে একই থিয়েটারে কাজ করে। দেখে মনে হয় মেয়েটি বুদ্ধিমতী, ব্যক্তিত্ব আছে।

পরিচয়ের পালা শেষ হয়ে গেলে হার্বার্ট আমাকে জিজ্ঞেস করল: 'টেবিলে কার সঙ্গে কথা কইছিলে হে।'

বড় মুশকিলে পড়লাম। হার্বার্ট কি একথা জানে না যে রাজনীতির খেলায় যারা নেমেছে, তাদের প্রতিমুহূর্তে সাবধান হয়ে প্রশ্ন করতে হয়, উত্তর দিতে হয়? হার্বার্ট এখনো এইটুকু শিখল না! কি উত্তর দেব? মেয়েটির দিকে তাকালাম সে যেন কিছু শোনে নি এমনি তার ভাবখানা। বাজনা শুনছে কান পেতে, আর আঙুলগুলো টেবিলের উপর মৃদু সংগত করছে।

'এমন বিশেষ কেউ নয় হে,' বললাম। ছোকরা কোকেন ব্যবসা ক'রে বেশ দু'পয়সা করেছে, এখন ইচ্ছে ভদ্দরলোক সাজবে। তা এখন কার কাছে আর যায় বল? আমাকেই এসে ধরেছে, ওকে পুরোদস্তুর ভদ্র ক'রে তুলতে হবে।'

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, তারপর বলল: 'ও আপনি যতই বলুন না, ওকে দেখে কিন্তু অন্য রকম মনে হয়। রাজনীতির চোরা গলিতে ওর আনাগোনা আছে। ও আপনার রাজনীতিক বন্ধু।'

হো হো ক'রে হেসে উঠলাম। হার্বার্টও আমার সঙ্গে যোগ দিল।

ফ্রাউ বি একটু অপ্রতিভ হলো। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল: 'ইস্, পাঁচটা বাজে। আমাকে ক্ষমা করবেন, আমাকে এক্ষুণি একটা জরুরী ফোন করতে হবে।'

ফ্রাউ বি চলে গেলে হার্বার্ট আমাকে বলল: 'তুমি একটা গাধা। তোমার জানা উচিত ছিল, ডিউক ঝঞ্ঝাবাহিনীর লোক। তোমার সঙ্গে ডিউকের অত ভাব দেখে ওকি মনে করেছে কে জানে! ফোন করতে কেন গেল জানো?

ডিউকের উপর যাতে নজর রাখা হয়, সেই কথাই বলতে ও ছুটল। ফ্রাউ বি নাৎসীদের দলে একথা কি জান না?'

আমি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ডিউকের কানে কানে কয়েকটা কথা বলে চলে এলাম হার্বার্টের টেবিলে। ডিউক বেরিয়ে গেল। চেয়ারে বসতে না-বসতেই ফ্রাউ বি ফিরল। মুখে তার হাসি। ডিউকের টেবিলের দিকে তাকিয়ে তাকে দেখতে না পেয়ে বি'র মুখের চেহারা বদলে গেল। হার্বার্ট ঠিকই বলেছে।

ফ্রাউ বি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললে: 'কি রকম বিশ্রী গুমোট হয়ে আছে, আকাশে—'

সে কথা শেষ করল না। তাকিয়ে দেখলাম, তার মুখে লেগেছে বিস্ময়ের ছোপ, চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে গেছে। কি ব্যাপার! ডিউক ফিরেছে আর সে এগিয়ে আসছে আমাদের টেবিলের দিকেই। আমি উঠতে গেলাম। বি আমাকে উঠতে দিল না, দু'একটা বাজে প্রশ্ন ক'রে আমাকে বসিয়ে রাখল।

ডিউক আমাদের টেবিলে এসে হাজির। নিপুণ অভিনয় করছে সে। আমি ফ্রাউ বি'র দিকে তাকিয়ে বললাম: 'আমি একটা জিনিস ওকে আনতে বলেছিলাম, ও তাই নিয়ে এসেছে।'

আমি হাত পাতলাম, ডিউক আমার হাতের মুঠোর মধ্যে কি একটা মোড়ক গুঁজে দিল। পকেট হাতড়ে একটা মার্ক বার ক'রে তাকে দিতেই সে চলে গেল। পাশের টেবিলের কেউ জানতেও পারল না। ব্যাণ্ড বাজছে, পরিচারকরা টেবিল পরিষ্কার করছে। ভেসে আসছে টুকরো হাসি আর কথা।

'ও লোকটা আপনাকে কি দিয়ে গেল?' ফ্রাউ বি অত্যন্ত অভদ্র প্রশ্ন ক'রে বসল।

'কে?—' আমি অবাক হবার ভান করলাম: 'আপনি কার কথা বলছেন?' তাকিয়ে দেখলাম, ডিউক মিলিয়ে গেছে। ফ্রাউ বি উঠে পড়ল। বুঝলাম সে ডিউকের অনুসরণ করতে চায়। হাসতে হাসতে মুঠো-করা হাত দেখিয়ে বললাম: 'বলুন তো হাতের মুঠোয় কি আছে?'

ফ্রাউ বি উদ্গ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইল, কোন কথা বলল না।

হাতের মুঠো খুলে ফেললাম, হাতের পাতার উপর রয়েছে অয়েল পেপারের ছোট্ট একটি মোড়ক। ফ্রাউ বি বাজের মত ছোঁ মেরে মোড়কটা নিয়েই খুলে ফেলল। মোড়কের ভিতরে খানিকটা সাদা গুঁড়ো।

'কো-কে-ন!' ফ্রাউ বি হতাশ হয়ে বসে পড়ল। সে ভেবেছিল, রাজনৈতিক

কিছু আবিষ্কার করবে ঐ মোড়কের ভিতর। 'আপনি কোকেন দিয়ে কি করবেন?'

হাসতে হাসতে বললাম: 'আমার একজন মহিলা বন্ধু নেশাটা ধরতে চান, তাঁরই জন্যে।'

'আপনি তাঁকে এমন সর্বনেশে নেশা ধরাচ্ছেন।'

'মেয়েদের কৌতূহল না মিটিয়ে কি নিস্তার আছে!' হার্বার্ট হাসল।

এবার এসে ঢুকল একটি খোঁড়া লোক। তার একখানা পা কাঠের তৈরি। কাকে যেন খুঁজছে। ফ্রাউ বি তাকে দেখেই উঠে পড়ে বলল: 'আমার একজন পুরোনো বন্ধু আমাকে খুঁজছেন। কিছু মনে করবেন না।'

খোঁড়া লোকটার সঙ্গে সে আর-একটা টেবিলে গিয়ে বসল।

হার্বার্ট আমাকে চুপে চুপে বলল: 'লোকটাকে চিনে রাখ। নাৎসীদের গুপ্তচর বিভাগে কাজ করে, সয়তানীতে সবার সেরা। ওর নাম মিয়ের। ওর কিন্তু সত্যিই কাঠের পা। ড্রেসডেনে ওই সয়তানটা কি কম ক্ষতি করেছে? তুমি বি'কে ডিউক সম্বন্ধে ভাঁওতা দিয়ে ভালোই করেছ।'

আমি লোকটাকে ভালো ক'রে দেখলাম। কে বলবে ওই লোকটা নাৎসী গুপ্তচর বিভাগের। ওকে দেখে মনে হয়, সার্কাসের ভাঁড়।

ফ্রাউ বি এবার ফিরে এল আমাদের টেবিলে; লোকটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল বাইরে। আধঘন্টা ধরে নানা আলাপ-আলোচনা চলল।

ওদের কাছে বিদায় নিয়ে সন্ধ্যের সময় গেলাম হের্ পেটারসেনের কাছে। পেটারসেন জার্মান গণতন্ত্রের একটি স্তম্ভ বিশেষ, হামবুর্গ তাঁকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। তিনি হামবুর্গের বনেদী ঘরানা। গণতান্ত্রিক দলের তিনি একজন বিশিষ্ট সভ্য, এমন কি রাষ্ট্রপতি পদের জন্যও একবার মনোনীত হয়েছিলেন। এই সঙ্কটাপন্ন মুহূর্তে একমাত্র তিনিই জার্মানীকে বাঁচাতে পারেন।

পেটারসেন বললেন: 'রাইখ পুড়িয়ে নাৎসীরা ক্ষতি করেছে সত্যি, কিন্তু অন্য পার্টির থেকে তাতে তাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে বেশি। জার্মান জাতি এখন স্বাধীন চিন্তা করতে শিখছে; আজ কেউ যদি তার চিন্তা বা কাজের উপর কর্তৃত্ব করতে চায়, তার সে-দাবি কেড়ে নিতে চায়, সে তা শুনবে না। সে অস্ত্র নিয়ে রুখে দাঁড়াবে।'

আমি তাঁকে ভূতপূর্ব চান্সেলার ফন প্যাপেনের ব্রেমেনের বক্তৃতার কথা

উল্লেখ ক'রে বললাম : 'ঐ বক্তৃতায় উনি কিন্তু বলেছেন, জার্মানীর লুপ্তগৌরব ফিরে আসবে নিচুতলা থেকে—তার জনগণের প্রচেষ্টায়। আবার তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করবে, আবার তারা অধিনায়কের ইঙ্গিতে চালিত হবে। ফন প্যাপেন কি বলতে চান জনগণ আবার অধিনায়কের হাতের পুতুল হয়ে উঠবে?'

'নিশ্চয়ই, তাছাড়া আর কি? আজ ইংলণ্ডে যদি', পেটারসেন গম্ভীর স্বরে বললেন : 'একথা কেউ চিৎকার ক'রে বলত, জনতা তাকে ঘাড় ধরে নামিয়ে দিত বক্তৃতামঞ্চ থেকে।'

বললাম : 'কিন্তু, আপনার এই গণতান্ত্রিক জার্মানীতে জনগণ ফন প্যাপেনকে বক্তৃতামঞ্চ থেকে নামিয়ে তো দেয়নি, বরং তাঁর প্রস্তাবে হর্ষধ্বনি ক'রে তাদের সম্মতি জানিয়েছে।'

এইখানেই আমাদের কথাবার্তায় ছেদ পড়ল। দুটি ভিন্ন দলের প্রতিনিধি দেখা করতে এলেন। আমি বসেই রইলাম। হের্ পেটারসেন তাঁদের বললেন, তাঁর মনে হয়, বার্লিনে আজ রাতে কোনরকম গোলমালের ভয় নেই। তিনি তখনো বোধহয় পট্‌স্‌ডামে ঝঞ্ঝাবাহিনীর হানা দেবার চেষ্টার খবর পাননি। আর পাননি ফন হিণ্ডেনবুর্গের নাৎসীদের হাত থেকে মুক্তি পাবার প্রচেষ্টার খবর।

প্রতিনিধিরা তাঁকে বললেন, এখন জার্মান গণতন্ত্রের, জার্মানীর স্বাধীনতার একমাত্র ভরসা তিনি। গণতন্ত্র, স্বাধীনতা আর মানুষের অধিকার—এই তিনটি জিনিসই তাঁর উপর নির্ভর করছে। তিনি একবার এসে তাদের মধ্যে দাঁড়ান, জার্মানজাতি আবার উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে গণতন্ত্রের আদর্শে, নাৎসীদের অস্তিত্ব থাকবে না। কিন্তু তিনি ক্লান্ত মানুষ, বৃদ্ধ। তাঁদের অনুরোধে কান না দিয়ে বললেন :

'তোমাদের কথা আমি শুনলাম, কিন্তু এখন আমি তোমাদের কথামত কাজ করতে পারব না। আগামীকাল নির্বাচন পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব, যদি সমস্ত লোক মাথা নোয়ায় নাৎসীবাদের পায়, আমাকেও তাই ক'রতে হবে; জনগণের বিরুদ্ধে আমি যাব না, যেতে পারি না। আমি যে গণতান্ত্রিক।'

তাঁর মতো গণতান্ত্রিকরা যে-কথা বলে থাকেন, তিনি তাই বললেন।

হের্ পেটারসেনের কাছ থেকে ফিরলাম, ফিরলাম নিরাশ হয়ে। সবচেয়ে সেরা, সবচেয়ে সাধু রাজনীতিজ্ঞদের একজন এই পেটারসেন। কিন্তু তিনি বিনা যুদ্ধে জার্মানীর স্বাধীনতা সঁপে দিচ্ছেন নাৎসীদের হাতে। সঁপে দিচ্ছেন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার।

তাড়াতাড়ি খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম অটোর সঙ্গে দেখা করতে।

সোশ্যালিস্ট লেবার পার্টির উকিলটিকে আবার ফোনে ডাকলাম। এবারও তার পাত্তা মিলল না।

উফা সিনেমার সামনে অটোর দেখা পাওয়া গেল। অটোর মুখ ম্লান। সে আমার কাছে এসে বলল: 'হের কাইসার সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?'

তাকিয়ে দেখলাম, অনেক লোক চারদিকে ছড়িয়ে আছে। সবাই অপেক্ষা করছে, কখন সিনেমা-ঘরের দরজা খুলবে। মনে হলো, অটোর সঙ্গে এখানে দেখা ক'রে ভালো করি নি। অটো এক বিশেষ দলের প্রতিনিধি, একথা বহুলোকই জানে। আমি কোন দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নই। এখানে অটোর সঙ্গে আমাকে দেখলে হয়তো তারা সন্দেহ করবে। তাই তাড়াতাড়ি একখানা টিকিট কেটে নিলাম।

কাইসার সম্বন্ধে আমার কি ধারণা? আজকাল একথা জিজ্ঞেস করার মানেই হচ্ছে, অটো কাইসারকে সন্দেহ করে। কাইসার? হাঁ, হাঁ, মনে পড়েছে, সেই বেঁটে লোকটি, ছেলে মানুষের মত যার চেহারা, মনে হয় কখনো বাড়বে না। কমিউনিস্ট মুখপত্র "ভল্‌কজেইতুঙ"-এর অফিস-ম্যানেজার ছিল, এখন ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিতে কাজ করছে।

'হঠাৎ কাইসার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছ যে?' একটু থেমে অটোকে জিজ্ঞেস করলাম।

'আমাদের পার্টিতে একদল লোক আছে যারা গুপ্তচরের কাজ করে। পার্টির বেশির ভাগ লোকের সঙ্গেই তাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। তাদের কাজ হলো, নেতা বা ঐ ধরনের পার্টির সভ্যদের উপর নজর রাখা। তাদের মধ্যে একজন খবর দিয়েছে, কাইসারের চলাফেরা সন্দেহজনক। আমি জেলা-কমিটিকে জানিয়ে দিয়েছি। তোমার সোস্যালিস্ট বা ফ্যাসিবিরোধী বন্ধুদেরও খবরটি জানিয়ে দিও। তাঁরা যেন ওকে…'

বাধা দিয়ে কি বলতে যাচ্ছিলাম, অটো তাড়াতাড়ি বলল: 'না না, উত্তেজিত হয়ো না। জানি, তুমি রাজনীতিক দলের লোক নও। কিন্তু একটা বিশ্বাস-ঘাতক তার সাথীদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করবে আর তার বিরুদ্ধে চুপ ক'রে থাকবে—এমন মানুষ নিশ্চয়ই তুমি নও।'

'কিন্তু একজন পুরোনো কমরেডকে শুধু একজনের কথায় সন্দেহ করা কি উচিত?' আমি শান্ত স্বরে বললাম।

'উচিত বই কি! আমাদের এখন ভাবে গদগদ হয়ে থাকলে চলবে না। আমরা যুদ্ধে নেমেছি। যদি আমাদের সন্দেহ ঠিক হয়, তাহলে কাইসার আমাদের পার্টির একশ'জন নেতার সর্বনাশ করবে। সে অনেককেই চেনে। তাকে সন্দেহ করা নিশ্চয়ই উচিত। আর আজকাল সন্দেহ সবাইকেই করতে হবে। যে যত বেশি পার্টির ভিতরের ব্যাপার জানে, তাকে তত বেশি সন্দেহ করব। কেন না সে বিশ্বাসঘাতক হলে ক্ষতির পরিমাণ হবে সাংঘাতিক।'

অটো চলে গেল। আমি ঢুকে পড়লাম সিনেমায়। বসে বসে ছবি দেখলাম, কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না। সমস্ত হল্ লোক ভর্তি। মাঝে মাঝে হাসির শব্দ উঠছে। চোখ বুজে রইলাম অনেকক্ষণ। মাথাটা ঘুরছে।

আজ শনিবার, ৪ঠা মার্চ, রাত দশটা। এখন কয়েক হাজার লোকের সঙ্গে বসে ছবি দেখছি। পর্দার উপর নেচে চলেছে ছবি, অন্ধকারে বাজছে অর্কেস্ট্রা। কিন্তু কাল কি হবে? কাল? বাইরে আলোর মালা। দেয়ালে বিজ্ঞাপন রক্তচক্ষু মেলে চেয়ে আছে। স্বস্তিকার নিচে জ্বলছে বড় বড় হরফ:

সব বদলে যাবে

—এডল্‌ফ্ হিটলার

সব বদলে যাবে কাল!

আজ এখানে, এই সিনেমায় হাজার হাজার লোক হাসছে!

আমি আর বসে থাকতে পারলাম না। বেরিয়ে এলাম হল্ থেকে। ফোনে উকিলবন্ধুকে ডাকলাম আবার। তার সঙ্গে সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতাদের যোগাযোগ আছে। উত্তর এল, সে শহর ছেড়ে চলে গেছে।

ভাণ্ডারলিকের সঙ্গে দেখা করার এখনও একঘণ্টা দেরী। কাইসার ভিল্‌হেল্‌ম্ স্ট্রাস দিয়ে চললাম গাণ্ডাইরটলের দিকে। এই শহরের সবচেয়ে নোংরা পাড়া, ইতর বদমায়েসের আস্তানা। অন্যদিন এপাড়ায় এত রাতে চলায় বিপদের আশঙ্কা থাকে। আজ কিন্তু পথে একটি লোকও দেখা গেল না। একটা পুলিশও নেই রাস্তায়। শুধু মিটমিট ক'রে আলো জ্বলছে, নির্জন গলি এঁকে বেঁকে চলে গেছে। আর নিঃসাড়ে ঝিমিয়ে আছে বস্তিগুলি। মনে হয় যেন ধ্বংসীভূত শহর! কোনো বাড়ির জানালায় একটা আলোও আজ নেই।

চারদিকে থমথমে নীরবতা। নিজের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। একঘেয়ে ধ্বনি বাজছে, মন ভারি। এখানে যারা থাকে আমি তাদের চিনি। তারা চুরি করে, কোকেন বেচে, খুন-জখম করতে দ্বিধা করে না সামান্য টাকার

লোভে, কিন্তু তাদেরও আছে মন, তারাও মানুষ। শুধু গরীব বলেই তাদের অন্য উপায় নেই। তারা কি ভাবে, আঁধার-কুঠরীতে বসে বসে কি বলাবলি করে, তাও আমার জানা। আমি তাদের সঙ্গে একাত্মা।

একটা বাড়ীর সামনে এসে পড়লাম। ঘা দিতেই দরজা খুলে গেল। এ হলো ডিউকের রাজ্য, তার আস্তানা। ঢুকে দেখলাম ডিউক বসে আছে চুপ ক'রে। একটা তেলের বাতি জ্বলছে। ঝঞ্ঝা-বাহিনীর ধূসর কোটটা ঝুলছে এক কোণে। রিভলভার বাতিটার পাশে পড়ে আছে।

আমাকে দেখে সে একবার তাকাল, কোন কথা বলল না। তার চোখ দুটো জ্বলছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ শুনলাম ডিউকের স্বর :

'আজ দু'বছর চার মাস হলো এই কোকেনের দলে কাজ করছি। পয়সা পেয়েছি, দু'হাতে উড়িয়েছি কিন্তু আজ? হাঁ আজ—'

'আমি তোমাকে ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছি না, ডিউক। নাৎসী শাসন-ব্যবস্থা এলে তোমার কি ক্ষতি হবে? তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকবে!'

'মশাই, এইখানেই আপনি আমাদের ভুল বুঝেছেন। আপনার আর দোষ কি, সবাই এই ভুলই করে। তারা ভাবে যাদের চোখে আছে একচোখো চশমা, যাদের পকেটে আছে চেক্ বই, তারাই যত রাজ্যের চিন্তা করবে। আর গরীবগুলোর মনই নেই, তাদের আবার চিন্তা কি! না মশাই, আমরাও একটু-আধটু চিন্তা করি, তবে কাউকে জাঁক ক'রে বলার আমাদের উপায় নেই।'

লজ্জিত হয়ে বললাম : 'তোমার যা বলার আছে, বল শুনব।'

'আমি অনেকদিন থেকে ভেবে দেখেছি, এই পৃথিবীটার সবই কেমন উল্টো-পাল্টা। এখানে কেমন ক'রে বাঁচতে হয় তারও একটা মোটামুটি উপায় ভেবেছি। কিন্তু ভাবলে কি হবে, টু শব্দটি করার যো নেই। অমনি দশজন এসে গলা টিপে ধরে বলছে, পৃথিবী ঠিকই চলেছে। শেষে ভয়ে ভয়ে আমাকেও তাই মেনে নিতে হয়েছে, আমাকে তারা বুঝিয়েছে, পৃথিবীতে একদল থাকবে, যারা চিরদিন মার খাবে, আর একদল দেবে মার। আমরা মশাই, মার-খানেওয়ালার দলে! শুধু শুধু পড়ে পড়ে মার খাওয়ার চাইতে চুরি, ডাকাতি, কোকেন চালানোর ব্যবসা ক'রে মার খাওয়াই তো ভাল। আর সেই পথ বেছেও নিয়েছি। কিন্তু বলুক তো কেউ, ডিউক এক ফোঁটা কোকেন কারখানার মজুরদের বেচেছে কিনা? এক ফোঁটাও না। যারা মার দেনেওয়ালার

দলে, তাদের কোকেন খাইয়ে খাইয়ে একেবারে জানোয়ার বানিয়ে ছেড়েছি। এই আমার একমাত্র হাতিয়ার। অনেক বাজে বকছি, না? কিন্তু কি করব, মশাই, বলতে বলতে আমি নিজেই ক্ষেপে যাই। ঐ মার-দেনেওয়ালাদের এমনি ক'রে শায়েস্তা করতে আমার ভালই লাগে।'

ডিউক চুপ ক'রে গেল। তার হাড়সার দেহ আর শীর্ণ মুখের দিকে তাকালাম। এক সময়ে মুখ বোধ হয় সুশ্রীই ছিল, হয়তো ওতে ভেসে উঠত নম্রতা, ভদ্রতার ছায়া। কিন্তু এখন সে-মুখ কঠিন-কঠোর, বলি-রেখায় আচ্ছন্ন। চোখে এখন দেখা দিয়েছে অস্থির নির্মমতা, চারদিকে যেন সে নজর রাখছে। এক সময়ে যে-মুখ ছিল সুশ্রী আজ তা নির্মম, ভয়ংকর এক মুখ-ভঙ্গীতে পরিণত। এমনিই বুঝি হয়। মাথা নেড়ে জানালাম, সে বাজে একটুও বকছে না।

ডিউক আবার বলতে লাগল: 'সারা পৃথিবী জুড়ে এই মার-খানেওয়ালার দলই বেশি। রাশিয়ায় ওরা জোট ক'রে মার-দেনেওয়ালাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু ঈশ্বরকেও যে তাড়িয়েছে—ঐটেই কেমন একটু খারাপ লাগে। যাক্ ওদের ব্যাপার ওরা ভালো বোঝে। রাশিয়ায় এই ব্যাপারের পর থেকে মার-দেনেওয়ালাদের কিন্তু টনক নড়েছে। এখন তারাই উল্টো গাইছে, তারাই মার-খানেওয়ালাদের দলে ভিড়তে চায়। এই নাৎসী বেটাদের দেখুন না! এরা সব মার-দেনেওয়ালার দল, কিন্তু এমন কাঁদুনিই গাইছে যেন এরা চিরদিন পড়ে পড়ে মারই খেয়ে এসেছে! এই ভোটের ইস্তাহারগুলো পড়ে দেখলেই তা বোঝা যায়। কিন্তু এদের আসল চেহারা আমরা ধরতে পারিনি বলে আমাদের ভাই-বেরাদাররা সব ওদের দলে ঢুকে পড়েছে। মশাই, এখন উপায় কি? এই নাৎসীগুলোর হাত থেকে কি ক'রে বাঁচব?'

ওর কথার তিক্ততায় এবার দেখা দিল দুঃখের রেশ। সে-দুঃখ মানুষকে শিউরিয়ে দেয়। আমিও শিংরে উঠলাম।

ও আবার বললে: 'কিন্তু নাৎসীদের তো শুধু ঘেন্না করলেই হারাতে পারব না। ওরা জানে ওদের এই শেষ চেষ্টা, আমরাও জানি। এবার যে-লড়াই হবে, সে-লড়াই ভয়ানক। আমি মুখ্যু মানুষ, বলতে পারছিনে। কিন্তু আপনি তো আমার কথা বুঝতে পারছেন।'...আমাকে উত্তর দেবার সময় না দিয়ে ও আবার বলতে লাগল: 'জানি না, কি করব কিন্তু এটা জানি—কিছু একটা করতে হবে। আমার মতো লাখো লাখো মানুষ একথা ভাবছে। কিন্তু তারা জানে না কি করবে! তারা তাই তৈরি হতে পারছে না। আমি যেটুকু বুঝি,

জানি, তাই নিয়েই গড়ে উঠেছে আমার বিশ্বাস। কিন্তু এও জানি—বিশ্বাস বড় কথা নয়, জানাটাই বড় কথা। যখন মানুষের জানার উপায় থাকে না, তখনই আসে বিশ্বাসের পালা।...আবার বক্‌বক্‌ করছি কিন্তু আমি যে ভাবি! আমার নীতির বালাই নেই, নীতি যার আছে সে উঁচুতলার মানুষ। যখন মার-খানেওয়ালারা নীতি ঘুচিয়ে দিয়ে নতুন নীতি বহাল করবে, তখন আমিও নীতিবাদী হবো। এই দুনিয়াটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে। বড় উল্টো-পাল্টা চলছে, ধসে তো পড়বেই। আপনি তো এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল।'

'এসব যাদের ব্যাপার তাদের হাতে ছেড়ে দাও না, তোমার এত মাথা ঘামাবার দরকার কি?'

'দরকার কি!' ডিউকের স্বরে ফুটে উঠল ক্রোধ। 'আপনি বলতে পারলেন দরকার কি! এত আমাদেরই ব্যাপার, আমরা মার-খানেওয়ালার দল যদি এবার সজাগ না হই, তাহলে যে আমাদের উপায় নেই।'

ডিউক এবারে উঠে একটা টানা খুলে এক তাড়া কাগজ বার করল। তাকে কমিউনিস্ট পার্টি কখনও সভ্য-তালিকা ভুক্ত করে নি, কিন্তু পার্টি-স্কুলে মার্কস্‌বাদ সম্বন্ধে যে শিক্ষা পেয়েছে, তারই প্রমাণ এই কাগজের তাড়াটা।

আমি কি বলব ভেবে পেলাম না, ডিউক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইল। কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল। হঠাৎ সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল: 'যদি এই সমাজ-ব্যবস্থা না থাকত, যদি আমরা সবাই খেতে-পরতে পেতাম, লক্ষ লক্ষ লোকের কান্না না উঠত, আমি দাগী বদমাস হতাম না, হতাম মানুষ।'

আমি ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম। রাত গভীর। কেমন একটা থমথমে ভাব চারদিকে। ঝঞ্ঝাবাহিনীর সৈন্যরা এখানে ওখানে জটলা করছে। একটা কিছু হয়তো ঘটবে আজ রাতে—বার্লিনে, নয় হামবুর্গে।

'একো'র সম্পাদক ভাণ্ডারলিকের সঙ্গে লেসিং থিয়েটারের সামনে দেখা। কথাবার্তা হলো কম। তাঁর কাছেই জানলাম, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের বেশির ভাগই হিটলারের সঙ্গে চুক্তি করতে উদ্‌গ্রীব। প্রবীণরা তো এই মর্মে কথা চালাচ্ছেন। তরুণরা কিন্তু তুমুল আপত্তি তুলেছেন। তাঁরা হিটলারের কাছে মাথা তো নোয়াবেনই না, বরং লড়াই করবেন।

'এক বিরাট সাধারণ ধর্মঘট আমরা ঘোষণা করব,' ভাণ্ডারলিক বললেন: 'হ্যাঁ, তাই-ই ঠিক হয়েছে।'

তাঁর গলার স্বর কাঁপছিল। আকাশে মেঘ জমেছে, একটি তারাও নেই। তবু ভাণ্ডারলিকের চোখের জল আমি দেখতে পেলাম।

তিন

রবিবার। পাঁচই মার্চ। সকাল থেকে কেমন গুমোট ক'রে আছে। বাড়ি থেকে বেরুইনি। প্রায় দুপুর হবে তখন, বাড়িউলি এসে খবর দিল, কে একজন দেখা করতে চায়। একটু বিরক্ত হলাম, কে আবার এল এমন দিনে? কিছুক্ষণ পরেই হাইন্‌ৎস্‌ নিকল এসে ঢুকল ঘরে। তাকে দেখে খুশি হতে পারলাম না। নিজে সে বার্লিনের একজন হোমরা-চোমরা র‍্যাডিক্যাল। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী। রাইখস্টাগ অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। শুনলাম কিরিৎস্‌ থেকে সাইকেলে সে এইমাত্র এসে পৌঁচেছে হামবুর্গে।

'কি করতে এখানে এলে বল তো?' তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

নিকল সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বললে: 'বার্লিনে ভীষণ ব্যাপার! কমিউনিস্টদের সব ধরে ধরে জেলে পুরেছে। সোশ্যালিস্টদের এখনও ধর-পাকড় শুরু হয় নি। তাদের বিরুদ্ধে নাৎসীরা শুধু অভিযোগ করছে যে, আগুনের ব্যাপারে তাদেরও হাত ছিল। এ যে নাৎসীদের একটা মস্ত বড় চাল, একথা সোশ্যালিস্টরা বুঝতে পারছে না। তারা ভাবছে কমিউনিস্টদের সর্বনাশ হোক্‌ না, আমাদের পার্টি তো বাঁচল! অথচ এই দুই দল মিলে যদি আজ এক বিরাট ধর্মঘট চালাতে পারত, বামপন্থীদের জয় ছিল সুনিশ্চিত। কিন্তু নাৎসীরা খাসা চাল চেলে তাদের ভুলিয়ে রেখেছে। কমিউনিস্টদের উপর চালাচ্ছে জুলুম আর সোশ্যালিস্টদের শুধু বন্ধুভাবে সতর্ক ক'রে দিচ্ছে। সোশ্যালিস্টরা ভাবছে, নাৎসীদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চললে, তারা তাদের দলটা টিকিয়ে রাখতে পারবে। তাই কমিউনিস্টদের তফাতে রেখেই চলেছে। বামপন্থীদের আর আশা রইল না। একে কি বলব বলত, একটা বিয়োগান্ত প্রহসন—তা ছাড়া কি নাম দেয়া যেতে পারে!'

নিকল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

'বার্লিনের খবরাখবর কি?' তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

নিকল দ্বান্দ্বিক জড়বাদের একজন বিশিষ্ট ব্যাখাকারক। কিন্তু বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বলে র‍্যাডিক্যালদের মধ্যে তার তেমন খাতির নেই। তবু সে পার্টিতে নিজের মর্যাদা বজায় রেখেছে। সে আমাকে বার্লিনের খবর দিল।

'আর খবরাখবর! কমিউনিস্ট পার্টির অফিসগুলিতে সরকারী তালাচাবি, শীলমোহর পড়েছে। পার্টি অবিশ্যি বে-আইনিভাবে গোপন আন্দোলন চালাচ্ছে। কিন্তু কাজ করার স্থযোগ কোথায়? সোশ্যালিস্টরা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছে।'

এমন সময় দরজায় ঘা পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল ফ্রাউ হাক্‌মেসার, আমার বাড়িউলি।

'মাপ করবেন, আপনার ঘরে কোনো ভদ্রলোক আছেন, জানতুম না!'

'বারে, এঁকে তুমি চেন না? আমার দরজি হের্ মউস!'

'রোববারে কাজ করতে এসেছে?'

'হাঁ, একা মানুষ, রোববারে কাজ না করলে চলবে কেন? রিপু করাবার দরকার আছে নাকি?'

'হাঁ, হাঁ, হের্ বস্ দু'টো ট্রাউজার আমাকে দিয়েছিলেন বটে', বাড়িউলি তাড়াতাড়ি পাশের ঘর থেকে দুটো ট্রাউজার এনে ফেলে দিল।

নিকল বলল: 'কাল আমি এগুলো রিপু ক'রে দিয়ে যাব।'

বাড়িউলি চলে গেল। এবার আমরা দু'জনে খুব হাসলাম। তবে আমার হাসি প্রাণখোলা নয়, তিক্ততা স্পষ্টই ফুটে উঠল।

একসময় আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম: 'তুমি আমার এখানে কেন এলে?'

বুঝতেই পারছো, আমি দলের সঙ্গে যোগ রাখতে চাই। এদিকে ফালেন্‌ৎসিন্‌স্কাম্পে গিয়ে দেখি সাড়াশব্দটি নেই। অফিসগুলোরও ঐ এক অবস্থা। কেউ কোন খোঁজ খবর দিতে পারে না।'

'তা আমার এখানে এলে কেন? আমি একজন সাংবাদিক। আমি ওসব দলটল বুঝি না। আমি—'

নিকল আমাকে বাধা দিয়ে বললে: 'তোমার ও-ধরনের কথা শুনতে আমি আসিনি। আমি প্রাণের মায়া করি না, এবং ভবিষ্যতেও করব না। তুমি দলের লোক কি না আমার জানা নেই, কিন্তু এইটুকু জানি দলের সবাই তোমাকে বিশ্বাস করে। অবশ্য তুমি ইচ্ছে করলে এখনই পুলিশ ডেকে আমাকে ধরিয়ে দিতে পার। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলতে চাই, তুমি

একজন সাংবাদিক, রাজনীতির দলাদলিতে সংশ্লিষ্ট না থাকলেও তোমার নীতিবোধ নিশ্চয় আছে। সেই নীতিবোধের খাতিরে আমাকে সাহায্য করা তোমার উচিত!'

'আমার যথাসাধ্য আমি করব', নিকলের হাত চেপে ধরলাম। 'মঙ্গলবার দিন সকালে ডাক্তার এক্সের সঙ্গে দেখা কোরো। তার রোগী দেখার সময় এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটা। সেখানে যে নার্সটি থাকে, তাকে তোমার পরিচয় দিয়ো, তোমার কাগজ-পত্রও দেখিয়ো।'

'কিন্তু—'

'না, তোমাকে কেউ চিনতে পারবে না। আর-একটা কথা, তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে স্বীকার করি, কিন্তু এখানে আর এসো না,—এই আমার অনুরোধ।'

নিকল হাসল, তারপর ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

এবার নির্বাচনী প্রতিযোগিতা দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। ঘাঁটিতে গিয়ে হাজির হলাম। অপেরা হাউসের ঠিক মুখোমুখি ঘাঁটিটি। এখানে ভিড় নেই। ভোট দিয়ে পাশের রেস্তরাঁয় গিয়ে আমার সহযোগী এক ইংরেজ সাংবাদিককে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কর্তাদের মনোভাবের কথা জানালাম।

ফোন ক'রে বেরিয়ে আসছিলাম, হঠাৎ খেয়াল হলো, খানিকক্ষণ বসে দেখা যাক না, ক'জন ভোট দিতে আসে। একটা টেবিলে বসে ফরমাস করলাম খাবার আনতে। এদিকে চোখ রইল নির্বাচনী ঘাঁটির দিকে। ওই যে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী একটা আলাদা টেবিলে বসে আছেন, তার পাশের টেবিলে সাত আটজন যুবতী, প্রত্যেকের হাতে লম্বা তালিকা। প্রতিদল থেকে এক-একজন ক'রে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে প্রতি নির্বাচনী কেন্দ্রে। তাদের কাছে আছে কেন্দ্রের যাবতীয় ভোটদাতার তালিকা। ওদের কাজ হলো, যারা ভোট দিল, তাদের নাম তালিকা থেকে কেটে দেওয়া। এমন ক'রে কাটতে কাটতে তাদের নামই শুধু তালিকায় থাকবে যারা ভোট দেয় নি। এই নামগুলো নিয়ে ওরা নিজেদের দলের অফিসে ফিরে যাবে। প্রতি দল ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখবে, এই নামগুলির মধ্যে তাদের নিজেদের সভ্য বা দরদী কেউ আছে কি না। যদি থাকে, তাহলে তারা লোক পাঠাবে, তাদের ভোট দিতে অনুরোধ করার জন্য।

সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ওখানে বসে বসে দেখলাম। মাঝে মাঝে দু'একজন

লোক আসছে। প্রতিনিধিরা তালিকা থেকে নাম কাটছে। আবার চুপচাপ। ওদের দেখলেই চেনা যায়, কোন্ দলের কে। ঐ যে বিবাহিতা মেয়েটি, ওটি সোশ্যাল-ডেমোক্রাট ; ছাত্রীটি নাৎসী ও ঐ শ্রমিকটি কমিউনিস্ট।

সাড়ে তিনটে বাজতেই ওরা উঠে পড়ল। আমিও উঠে পড়ে কমিউনিস্ট মেয়েটির পেছনে পেছনে চললাম। এখনও সরকারী হিসেবে পার্টি যদিও বে-আইনী হয় নি, কিন্তু তবুও মেয়েটি বার বার পেছনে তাকিয়ে দেখছিল। বোধ হয় ভাবছিল, লোকটাকে পার্টি অফিসে নিয়ে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে কি না।

কিছু দূর গিয়ে একটা ছোট রেস্তরাঁর ভিতর সে ঢুকে পড়ল। একটা পুলিশ ধীরে ধীরে সামনে দিয়ে চলে গেল।

এবার রেস্তরাঁ থেকে একটি যুবক বেরিয়ে এল। আমি ওকে বহু সভায় বক্তৃতা দিতে দিখেছি। কি নাম ওর যেন ? ব্রুনো—ব্রুনো !

ব্রুনো পথে নেমে ছুটে গিয়ে একটা চলতি ট্রাম ধরল। আমি ওর পেছনে ছুটলাম ট্যাক্সিতে। হ্বিণ্টারউডের কাছে ও নেমে পড়ল, আমিও ট্যাক্সিওলার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে নেমে পড়লাম। কিন্তু কোথায় গেল ব্রুনো ? এই এক মুহূর্তের মধ্যে সে কোথায় যাবে ? আশে পাশের বাড়িগুলোর দিকে নজর রেখে এগিয়ে চললাম। হঠাৎ এক ধাক্কা ! চমকে দেখি একটা বাড়ির সামনে ব্রুনো আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

'আরে ব্রুনো যে।'

ব্রুনো অবাক হয়ে গেল। একটা কথা ফুটল না তার মুখে।

'ঘাবড়িয়ো না বন্ধু—' হাসতে হাসতে বললাম : 'তোমার পিছু পিছু দলের সন্ধানে এসেছি।'

'ভেতরে আসুন !' ব্রুনো বিড় বিড় ক'রে বলল : 'আপনার কাছে পিছু পিছু আসা রসিকতা হতে পারে, কিন্তু –'

আমি বললাম : 'তোমাদের পক্ষে এই রসিকতা ভয়ঙ্কর, কেমন এই কথা তো তুমি বলতে চাও ? কিন্তু তুমি যে রকম নির্বোধের মত আসছিলে, যে-কোনো নাৎসী তোমার পিছু নিতে পারত। যাক গে, আমি রসিকতা করতে এখানে আসি নি। আমি দলের সভ্য না হলেও দলের বন্ধু, একথা ভুলে যেও না। তোমাকে সতর্ক ক'রে দিয়ে গেলাম, ভবিষ্যতে সতর্ক হয়ে পথ চলো। চলি—'

'না, না, আপনি যাবেন না,' ব্রুনো আমার হাত ধরল : 'আমাকে ক্ষমা

করুন! আমি সত্যিই নির্বোধের মত কাজ করেছিলাম! আসুন, ভিতরে আসুন! এখানে আপনার বন্ধুদের দেখা পাবেন।'

একটি বেশ সাজানো-গোছানো ঘরে এসে আমরা ঢুকলাম। দেয়ালে চিত্র আঁকা, আসবাবপত্র সব ইস্পাতের। আবার কয়েকটা ফুলের টবও আছে। কয়েক বছর আগে কমিউনিস্ট পার্টি স্থির করে যে, বিলাসী পল্লীতে তারা কয়েকটি ঘাঁটি ক'রে রাখবে। পার্টি বেআইনী হলেও এই সব ঘাঁটির উপর পুলিশের নজর হঠাৎ পড়বে না। এই বাড়িটি তেমনি একটি ঘাঁটি।

চার পাঁচজন লোক ঘরে। মারিচেন (এস্‌-এর স্ত্রী) খুব বিচলিত হয়ে পড়েছে। তার স্বামী এস্‌ পার্টির কাজে অন্যত্র গেছে, তাই বুঝি তার ভাবনা। জন উদাসীন ভাবে পাইপ পরিষ্কার করছে। বাইরে একটানা বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে। ভেসে আসছে বাজনার সুর। ঘরে সবাই নীরব। হামবুর্গ, মনে হয়, সব চাইতে শান্ত শহর এই হামবুর্গ।

আমারও মন অস্থির, কি এক চরম সংবাদের আশঙ্কায় আশঙ্কিত। ওদের দিকে তাকালাম। সবার মুখের উপর ঘনিয়ে এসেছে চিন্তার ছায়া। এতক্ষণ তাদের বিশ্বাস ছিল, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা তাদের সঙ্গে মিলবে, শুরু হবে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট। কিন্তু সে-আশা আর নেই। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মাতব্বরেরা নাৎসীদের সঙ্গে চুক্তি করেছে। আর সাধারণ ধর্মঘটের আশা নেই। এখন তারা বুঝতে পেরেছে, আন্দোলন তারা একা-চালাতে পারবে না।

তবে এখনও ক্ষীণ আশা আছে। নির্বাচনের ফলাফল এখনও নিক্তিতে ঝুলছে। প্রেসিডেন্ট ফন হিণ্ডেনবুর্গ নাৎসীদের ভয়ে রাইস্‌ভের-এর হাতে নিজের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়েছেন। হিটলার আর হিণ্ডেনবুর্গের বন্ধুত্বে চিড় খেয়েছে। লাখো লাখো লোকের ধারণা বিকেলেই নাৎসী আর তাদের সহযোগীদের মধ্যে লড়াই শুরু হবে। এখানেও নিক্তিতে ঝুলছে ভাগ্য।

গোপন আন্দোলন কি ক'রে চলবে তারই পরামর্শ চলছিল। নতুন গোপন আন্দোলনের নেতারা পুরোনোদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখবেন না, পুরোনোদের উপর এখন পুলিশের কড়া নজর—এই মর্মেই সিদ্ধান্ত হলো। এর যৌক্তিকতা আমি বুঝতে পারলাম। নাৎসীরা পুরোনো নেতাদের গ্রেপ্তার ক'রে ভেবেছিল বেআইনী ঘাঁটির সন্ধান পাবে। এমনকি তার জন্য তাঁদের উপর উৎপীড়নও কম হয়নি। কিন্তু তাঁরা চুপ করেই রইলেন, তাছাড়া গোপন

আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁরা তখন ওয়াকিবহালও নন। অত্যাচার উঠল চরমে। এতে আর-একটা ফলও হলো। সারা দেশ শিউরে উঠল ভয়ে। বহু বিপ্লবী আর গণতন্ত্রী কাজ ছেড়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রইলেন।

এখানে ঠিক হলো, নেতারা ছদ্মনামে জার্মানীর বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়বেন। সেখানে কেউ তাঁদের চিনতে পাববে না। তাঁরা গোপনে ছদ্মনামে থাকবেন, অন্তরালে কাজ করবেন।

জন এবার বলল: 'আমাদের একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা দরকার।'

ব্রুনো আপত্তি তুলল: 'আমরা পরিকল্পনা একটা কেন, দশটা করতে পারি। কিন্তু আজকের দিনটা কি আমরা ধৈর্য ধরে চুপ ক'রে থাকতে পারব না? আমি বিশ্বাস করি না, আমরা ফ্যাসিবাদের বন্যায় ডুবে যাব। এতদিন ধরে তাহলে আমরা যে ভাবধারা প্রচার করেছি তা কি মিথ্যে? জনগণের মনে কি তার শেকড় গিয়ে পৌঁছয় নি? না না, একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আজ রাতেই শুরু হবে লড়াই। তারপর—'

ব্রুনোর স্বর আবেগে রুদ্ধ হয়ে এল। সে যা বলতে চাইছিল, আমরা জানতাম। নিঃশব্দে আমরা সিগারেট টানতে লাগলাম।

আমি অনেকক্ষণ পরে ওদের জানালাম: 'নিকল এসেছিল, তাকে আমি ডাক্তারের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছি।'

ওরা সবাই বলল: 'আমরা ওকে এখানে থাকতে দিতে রাজি নই। হানোভার কি লুনেবার্গেই ওর এখন যাওয়া ভাল। সেখানে এখন সত্যিকারের কর্মীর দরকার। আর চেনা লোকও কম। এখানে তো পথেঘাটে চেনা লোকের ভিড়।

অন্ধকার হয়ে এল। আলোচনার মোড় ফিরল; এই আসন্ন যুদ্ধের কার্যসূচী সম্বন্ধে পরামর্শ হলো। এখনও পার্টি বেআইনী হয় নি কিন্তু বহু কমরেড বন্দী হয়েছেন। যাঁরা বাইরে আছেন, তাঁদের নাৎসীরা অস্ত্র-স্বরূপ ব্যবহার করছে। নাৎসীরা তাঁদের উপর কড়া নজর রেখে গুপ্ত কেন্দ্রের সন্ধান জেনে নিচ্ছে। এদিকে কমিউনিস্টদেরও নিশ্চিন্তে বসে থাকলে চলবে না। স্থির হলো, এই হামবুর্গ শহরে নেতারা যখনই পথে বেরুবেন, তাঁদের ছায়ার মতন অনুসরণ করবে এক-একজন কমরেড। এই কমরেডের কাজই হবে নেতাদের সাবধান ক'রে দেয়া এবং নাৎসী গুপ্তচরদের ভোলানো। এই পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া তাদের উপায় নেই। কারণ ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্টরা দেশের

সবচেয়ে শক্তিশালী দল, অন্যদিকে কমিউনিস্টদের না আছে ক্ষমতা, অস্ত্র বা অর্থ। তাদের আছে প্রভূত মনের বল। আর এই বলের জন্যই তো শক্ররা ওদের এত ঘৃণা করে।

কার্যত সুফলই ফলল। একদিন পথে একজন কমরেড জনকে ইঙ্গিতে সাবধান ক'রে দিতেই সে নাৎসীদের হেড কোয়ার্টার্সে ঢুকে তাদেরই একগাদা প্রচার-পত্র নিয়ে এসে স্বেচ্ছায় বিলি করতে শুরু করল। যে নাৎসী-গুপ্তচরটি তার পেছনে পেছনে আসছিল, সে ভাবল, নিশ্চই তার ভুল হয়েছে। সে চলে যেতেই প্রচার-পত্রের গাদা ফেলে দিয়ে জন গুপ্ত আস্তনার দিকে রওনা হলো।

যেসব নেতারা পরিচিত তাঁদের কথা উঠল। তাঁরা কি ভাবে কাজ করবেন? জন আর ব্রুনোর উপর ভার পড়ল তাঁদের সম্বন্ধে পরিকল্পনা রচনার। তাঁর অন্য কামরায় চলে যাচ্ছিলেন, আমাকেও তাঁরা সঙ্গে নিলেন, যদিও আমি অতিথি মাত্র।

সেদিনকার সেই জরুরী বৈঠকে আরো নানা বিষয়ে পরামর্শ হলো। ব্রুনো আর জন আমার সামনেই খোলাখুলিভাবে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করল। মনে গর্ব হলো, আমি দলের কেউ না হলেও এরা আমাকে বিশ্বাস করে, ভালোবাসে। আমি সে-কথা তাদের বললামও।

জন হেসে বলল : 'তোমার উপর আমাদের বিশ্বাস আছে, সেকথা সত্যি কিন্তু তাই বলে খুব গোপনীয় পরামর্শ তোমার সামনে বসে তো করছি না। এখানে যে আলোচনা হলো, এগুলো পার্টি থেকে নানা সূত্রে হয়তো বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়বে। তুমি দুঃখিত হয়ো না, বুঝতেই তো পারছ, এ খেলা নয়, সত্যিকারের যুদ্ধ। শত্রুরা রিভলভার আর রাইফেল নিয়েই যুদ্ধ করছে না, আমাদের বিরুদ্ধে মানুষের মনও বিষাক্ত ক'রে তুলছে। এখানেই তোমাকে আমাদের প্রয়োজন। তুমি সাংবাদিক। নাৎসী, সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, আমাদের—সকলের কর্মসূচী জানার সুযোগ তোমার আছে। এবার তোমার কাজ হবে, ন্যায়ের পক্ষে যারা যুদ্ধ করছে তাদের হয়ে ওকালতী করা। আশা করি, অন্যায় হুমকি তোমার কলমকে থামিয়ে দিতে পারবে না, সেখানে তোমার বিবেক তোমাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে।'

করমর্দন ক'রে বিদায় নিলাম। আজ বহুদিন পরে সে-রাতের কথা মনে পড়ছে। জনের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, রক্ষা করেছি। আমার বিবেক আমি হারাই নি।

সেই রাতের আগে সাংবাদিক হিসাবে আমি ছিলাম নিরপেক্ষ দর্শক ; নিরপেক্ষ দর্শকের চোখ দিয়ে দেখেছি রাজনৈতিক ঘূর্ণি। ভাবালুতা সেখানে হানা দিয়ে চোখ ঝাপসা ক'রে ফেলতে পারেনি। এতদিন কার্য-কারণের ঘটনার বিশ্লেষণ করেই আমার দিন কেটেছে। জনের ইঙ্গিতে আমার কাছে একটা নতুন দিক খুলে গেল। ব্যস্তবতা নিয়েই শুধু আমার কারবার চলবে না, নিরপেক্ষতার ঘোর চোখ থেকে দূর ক'রে দিতে হবে। বাস্তবতা তো সত্যিকারের অনুভূতির পরিপন্থী। ভাবাবেগকে দিতে হবে তার প্রকৃত স্থান। এই যে অনুভূতির শৃঙ্খলা, নিরপেক্ষতা একি আজ আর সাজে! বিশ্বাসঘাতকতা, হত্যা, পাশবিকতা আর মূর্খতার সঙ্গে কি এগুলো খাপ খায়? রাজনৈতিক দলভুক্ত না হ'লেও আমি জানি কারা আজ এক মদমত্ত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে, কারা নির্যাতন সইছে, কারা তাদের আদর্শের জন্য উৎসর্গ করেছে জীবন। তাদের সঙ্গে এক হয়ে আজ আগুনের অক্ষরে তাদেরই কথা যদি ফুটিয়ে না তুলি খবরের কাগজের পাতায়, তা হ'লে আমার সাংবাদিক জীবনের সার্থকতা কোথায়, কোথায় বা আমার বিবেক, আমার নীতিবোধ?

সন্ধ্যের দিকে অটোর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তার বাড়িতে। গাভো-ভিষের্তেল পাড়ায় একটা নড়বড়ে কাঠের বাড়িতে তার বাস। একটা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তার ঘরে যেতে হয়। সিঁড়ির দু'দুটো ধাপ নেই। অটো ঐ দুটো ধাপ দেখিয়ে কতদিন হেসে বলেছে: 'ঐ দুটো হচ্ছে আমার দুর্গের পরিখা, পার হয়ে আসুক তো দেখি কোন শত্রু?' সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ছোট দু'খানা ঘর। আলো বাতাস খেলে না। একটা রান্নাঘর, সেখানেই অটোর ছেলে ডুটি ঘুমোয়। আর-একটা ঘরে থাকে অটো আর তার স্ত্রী পলা। খাবার ও বসবার ঘর হিসেবেও এইখানাকেই ব্যবহার করা হয়। ঘরে আসবাবপত্র বিশেষ নেই। ছোট দু'খানা খাট, একটা টেবিল, দু'তিনটে হাতল-ভাঙা চেয়ার; দেয়ালে বই-ঠাসা আলমারী। রাজ্যের বই সেখানে, বহু ব্যবহারে তারা বিবর্ণ।

ঘরে ঢুকে দেখলাম, পলা বসে পড়ছে, অটো লিখছে। আমরা পরস্পরকে সম্ভাষণ জানালাম। গ্যাসের বাতিতে শব্দ উঠল। অটো আবার লিখতে বসল।

এই আমার বন্ধু অটো। প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় তার মুখ, উজ্জ্বল তার চোখ, স্বল্পভাষী, নেতৃত্বের দাবি নিয়েই সে জন্মেছে। ইজি-চেয়ারটায় শুয়ে শুয়ে ওকে দেখছিলাম। অটো লিখে চলেছে, খস্ খস্ শব্দ উঠছে কাগজে, ঘরে গ্যাসের

আলোটা কাঁপছে, শব্দ উঠছে। ওর স্ত্রী বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। চারদিক নীরব। ঝড়ের মধ্যে এই ঘরটুকু ওদের বন্দর, ওদের আশ্রয়।

অটো আমার মুখের দিকে তাকাল। এই মুহূর্তে সে যে-কাজ করছে তার গুরুত্ব সব চেয়ে বেশি। সে যা লিখছে তার একটি ছত্র শত্রু জানতে পারলে তার মৃত্যু অনিবার্য। অথচ তার কীর্তি-কাহিনী ক'জনে জানে, ক'জনেই বা শুনেছে তার নাম? যখন তার মৃত্যু হলো, তার ছেলেরা তখন একেবারে শিশু, পলা তাদের জন্য একমুঠো খাবার যোগাড় পর্যন্ত করতে পারে নি। কেউ আসেনি সহানুভূতি জানাতে, তার মৃতদেহের ভস্মাবশেষের উপর ওঠেনি স্মৃতিস্তম্ভ। তবু বীর বলে কোনও বিশেষ শব্দ যদি অভিধানে থেকে থাকে, একমাত্র অটোর ভিতরেই আমি দেখেছি সেই বীরত্ব। উন্নত হৃদয়, অনমনীয়-শির অটো। সে না থাকলে হাজার হাজার লোক সেদিন জার্মানীতে নির্যাতিত হতো, হাজার হাজার মানুষ বিশ্বাসঘতকতা করত, হাজার হাজার লোক হারাত প্রাণ। এই গোপন আন্দোলন গড়ে উঠতে পারত না।

কিন্তু তার আত্মোৎসর্গের মূল্য সে কি পেল? তার স্ত্রী, যে তাকে ভালোবাসত, সে-ই স্বামীর মঙ্গল কামনায় হলো বিশ্বাসঘাতিনী; তার ছেলে-মেয়েরা অনাহারে কাঁদল পথে পথে, হত্যাকারীর নির্যাতনের প্রত্যুত্তর দিল সে ঘৃণা দিয়ে। এই কি তার দেশপ্রেমের মূল্য? না না, মূল্য সে পেয়েছে বই কি! আজ জার্মানীর অন্ধকার বুকে হাজার হাজার মানুষ একসূত্রে বদ্ধ হয়ে জীবন-পণ ক'রে যে মুক্তি সংগ্রাম চালাচ্ছে, আগামীতে যারা হবে কমিউনিস্ট, মুক্ত জার্মানীর সেই বীরেরাই তো হয়ে রইল তার জীবন্ত কীর্তিস্তম্ভ, তার বংশধর। অটো নাৎসী শাসন-যন্ত্রের চাপে গুঁড়িয়ে গেল, কিন্তু তার আত্মা রইল বেঁচে। সেই আত্মাই জাগাবে জার্মানীকে। নাৎসী-শৃঙ্খল যেদিন খসে পড়বে, সেদিন জার্মানী হবে জনগণের জার্মানী।

অটো—এই আমার বন্ধু অটো!

অটো আমার কাছে এসে বসল। সে যেন কি বলতে চায়। পলা চুপ ক'রে আছে।

'কি ব্যাপার?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

অটো নীরব। পলা বইখানা মুড়ে রেখে উঠে দাঁড়াল।

'না পলা, তুমি যেও না,' অটো বলল: 'তোমারও কথাটা শোনা দরকার। পলার এক ভাই আমাদের এখানে থাকত, সে ঝঞ্ঝাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে।'

পলা তার পাশে এসে বসে পড়ল। বলল : 'যোগ না দিয়ে উপায় ছিল না। আজ চার বছর ও বেকার। কিন্তু ও তো নাৎসী নয়, শুধু চাকরির জন্যই দলে নাম লিখিয়েছে। চার বছর বেচারা কত কষ্ট সহ্য করেছে! এখন ও চাকরি পেয়ে বেশ সুখে আছে। তুমি তো জানো অটো, চাকরি ছাড়লে ওকে উপোস ক'রে কাটাতে হবে। তাছাড়া একটি মেয়েকে ও ভালোবাসে, বিয়ে করতেও তো হবে।'

অটো চুপ ক'রে রইল, পলা তার কাঁধে হাত রেখে আদর ক'রে ডাকল : 'অটো!'

অটো এবার তাকাল পলার দিকে। তার স্বরে উত্তেজনা নেই, কিন্তু স্পষ্ট সে-স্বর। 'পলা, আমাকে যদি কর্তাও ক'রে দেয়, তবু কি আমি ঝঞ্ঝাবাহিনীতে যোগ দিতে যাবো? এতদিন যে আদর্শ বুকের উত্তাপ দিয়ে পালন করলাম, তাকে কি সামান্য অনাহারের লাঞ্ছনায় ত্যাগ করব? উপোস কি আমি করি নি পলা, দুঃখ কি আমি সই নি? নিজে আমি যা করছি, আমার শ্রেণীও তা-ই করবে এই আমি চাই। একি খুব বেশি পলা? বলো, তুমিই বলো?'

'কিন্তু ওর আদর্শ হয়ত বদলায় নি', আমি বললাম : 'নাৎসী দলে অমন কত লোক তো যোগ দিয়েছে। পার্টি থেকেও তো লোক পাঠাচ্ছে!'

'না, এ সে ব্যাপার নয়। আমার এই শ্যালক নিজেকে কমিউনিস্ট বলে জাহির করত। কিন্তু যতই পার্টির কাজ জটিল হয়ে উঠছিল ততই সে দূরে সরে যাচ্ছিল। ছ'মাস আগে সে পার্টির সভ্য-তালিকা থেকে নাম কাটিয়ে নিয়েছে। এ বাড়িও সে ছেড়ে চলে গেছে। এখন সে ঝঞ্ঝাবাহিনীর সভ্য। পলাকে সে প্রায়ই এসে অনুরোধ করে, যাতে আমি আমার রাজনৈতিক কাজ ছেড়ে দিই।'

সবাই চুপ ক'রে রইল অনেকক্ষণ। এবার আমি আস্তে আস্তে বললাম : 'তাহলে সে পুরোদস্তুর নাৎসী হয়ে গেছে দেখছি!'

'সম্ভবত তাই', অটো বললে। পলা তখনো চুপ ক'রে আছে।

কি উত্তর দেবে পলা? পলার ভাই একটি মেয়েকে ভালোবাসে, তাকে সে বিয়ে করবে। তাই সে রাজনৈতিক আদর্শ বদলে নাৎসী দলে গিয়ে ঢুকেছে। কিন্তু আদর্শ যাদের ধর্ম, তারা কি কেউ এত সহজে বিশ্বাসঘাতক হতে পারত? এই তো আমার বন্ধু অটো, এত দুঃখ সয়েও তার আদর্শ সে আঁকড়ে ধরে আছে। আদর্শের জন্যই সে বেঁচে আছে, আদর্শই তার জীবন।

পলা তার স্বামীকে ভালোবাসে, ভালোবাসে তার একমাত্র ভাইকে। ওরা

নির্যাতিত শ্রেণীর নরকে একই সঙ্গে বেড়ে উঠেছে; চোখের উপর দেখেছে না-খেতে পেয়ে ভাই-বোনের মৃত্যু, ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করেছে। এখন সেই ভাই তার স্বামীর শত্রু। আজকের দিনে তৃতীয় কোন অভিধা নেই। হয় মিত্র, নয়ত শত্রু। এই দারিদ্র্য-পীড়িতদের এলাকায়, অনাহারের অলিতে গলিতে— যেখানে আলো জ্বলে না, যেখানে প্রকৃত জীবনের আশা-আনন্দের কোন হদিশ পাওয়া যায় না, এখানে অন্য কোনো অর্থ নেই। এখানে এরা শুধু আলোচনার খোরাক যোগায় বুদ্ধিজীবীদের অথচ এখানেই একদিন বুভুক্ষা আর নির্যাতন জন্ম দেবে নতুন দিন, নতুন পৃথিবী।

'অটো, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো?' পলার স্বর কেঁপে উঠল।

অটো চুপ। পলা কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অটোর কোন সাড়া শব্দ নেই। ঘরে গ্যাসের আলো কেঁপে কেঁপে জ্বলছে। কোথায় যেন শব্দ হচ্ছে। পলা এবার দৌড়ে রান্না ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিল।

অটো তখনো বসে আছে চুপ ক'রে। আট বছর তাদের বিয়ে হয়েছে। প্রথম ছেলেটির জন্ম হয় বিয়ের দু'বছর পরে। তার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এল বেকারত্ব। আবার দু'বছর পরে এল আর-একটি। পলা তখন মরণাপন্ন। অটো পলার জন্য দুধ যোগাড় করতে গিয়ে নিজে রুটি ছাড়া আর কিছু খেত না, জল ছাড়া সে পানও করে নি কিছু। ১৯২৬এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৩২এর নভেম্বর —এই ছ'বছর সে বেকার রইল। এই ছ'বছর পলাও তার সঙ্গে সহ্য করেছে চরম দারিদ্র্য। দুঃখ তাদের দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরিয়ে দিতে পারে নি। পাঁচ মাস হলো সে এক মোটর কারখানায় চাকরি পেয়েছে। এখন অবস্থা স্বচ্ছল। গোড়া থেকেই সে পার্টির সভ্য।

অটো আস্তে আস্তে আমাকে বলল: 'তুমি হয়ত ভাবছ, আমার ওকে আঘাত দেওয়া ঠিক হয় নি। হয়ত মনে করছ, দুঃখের দিনে আমাদের যে প্রেম ছিল আজ তা মিথ্যে হয়ে গেছে। ভুল, ভুল বন্ধু! এখনো সব আছে। পলা আমার স্ত্রী, আমার সন্তানের সে মা। ওর ভালোবাসার এতটুকু অসম্মান আমি করতে চাই নি। কিন্তু পার্টি যে কাজের ভার আমার উপর দিয়েছে, শুধু তার জন্য পলাকে আজ ক'টা কড়া কথা শোনাতে হলো। এখানে অটো বা পলা কেউ নয়। একটা কথা যদি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ হয়ে পড়ে, পার্টির কত ক্ষতি হবে ভাবো তো? আমিই যে শুধু মরব তা নয়, আমাদের একশো কি হাজার জন সাথী—সমস্ত কিছু বানচাল হয়ে যাবে।'

'কিন্তু অটো,' আমি বললাম : 'তুমি পলাকে সত্যিই বিশ্বাস করো না ?'

'কে বললে করি না। পলা বিশ্বাসঘাতকতা করবে, একথা একবারও আমার মনে হয় নি। কিন্তু এমন কথা সে হয়ত প্রকাশ ক'রে ফেলবে যার গুরুত্ব সে নিজেই জানে না। তারপর পার্টির লোকেরা আমার স্ত্রীকে ঝঞ্ঝাবাহিনীর একটা লোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখলে, কি ভাববে বলো তো ?'

রান্নাঘরের দরজা খুলে গেল। পলা এসে ঢুকল ঘরে।

'অটো তুমি ঠিকই বলেছ। হোক্ সে আমার ভাই, আমি তার সঙ্গে দেখা করব না।'

পলা চেয়ারে বসে পড়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। অটো দাঁড়াল তার পেছনে। চুলে আলতো ভাবে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল : 'এইতো লক্ষ্মী মেয়ে ! এইবার সব ঠিক হয়ে গেছে।'

আমার কিন্তু মনে হলো অটোর বিপদ এতে আরো বেড়ে যাবে। হঠাৎ পলা তার ভাই-এর সঙ্গে দেখা করতে না চাইলে, সে হয়ত রেগে গিয়ে অটোকে ধরিয়ে দেবে। আজকের দিনে প্রমাণের কথা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। শুধু গোয়েন্দা বিভাগে জানিয়ে দিলেই হলো, অমুক লোকটার রাজনৈতিক মতামত নাৎসীদের সঙ্গে মেলে না। তখনো কিন্তু নাৎসী সরকারের কুখ্যাত আইন বিধিবদ্ধ হয় নি। সে-আইনে ছিল জার্মানীর নাগরিকদের প্রতি হুকুম —তারা অপর নাগরিকদের রাজনৈতিক মতামতের খবর জোগাবে সরকারকে। যাহোক, বুঝলাম, অটো আর তার স্ত্রীর মধ্যে, মনের মিল থাকলেও, কোথায় যেন দেখা দিয়াছে অসঙ্গতি। তাই অটোর বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

সাড়ে ন'টার সময় আমরা বেরিয়ে পড়লাম। গ্যান্স্মার্কৎএ লোকের ভিড় জমেছে। নির্বাচনী প্রতিযোগিতার ফলাফল জানতে তারা উদগ্রীব। পার্ক অন্ধকার, এখানে ওখানে দু'চার জন ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফ্যালেন্‌ৎসিন্‌কাম্পে কমিউনিস্টদের দেখা যাচ্ছে ; ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্টরা দাঁড়িয়ে আছে স্টেফান্‌স্-প্ল্যাৎস্‌এর মুখে আর য়ুঙ্‌ফের্নস্টাইগ্‌এ অভিজাতদের গাড়ির ভীড়।

অটোকে ভিড়ের ভিতরে হারিয়ে ফেললাম। শহরের কোষাগারের সামনে পুলিশের বিরাট গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশগুলো চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে। কিসের জন্য তাদের এই অপেক্ষা ? তাদের রবারের চাবুকের উপর পড়েছে অস্পষ্ট আলো।

আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখলাম। হঠাৎ মনে হলো কে

যেন আমার কাঁধে হাত রেখেছে। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, ভাণ্ডারলিক। আমি ফিরে তাকাতেই সে হন্ হন্ ক'রে চলতে শুরু করল, আমিও পিছু পিছু চলতে লাগলাম। য়ুঙ্ফের্নস্টাইগ্এ এসে গেলাম। একটা ডাক্তারখানার সামনে থেমে দাঁড়িয়ে আমার হাত চেপে ধরে কানে কানে বলল : 'আজ কিছু একটা হবেই। পুলিশরা কিছুই বুঝতে পারছে না। এখন আমরা যদি... পুলিশরা তাই চাইছে। আমাদের শুধু শুরু করতে হবে।'

ভাণ্ডারলিকের এই উত্তেজনার কারণ আমি বুঝতে পারলাম। আজ বেশ কয়েক বছর ধরে হামবুর্গের পুলিশ বিভাগের কর্তা সেনেটর স্তোয়েন-ফেল্ডের্ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট দলের একজন প্রধান সভ্য হয়েছে। সে নিশ্চয়ই চুপ ক'রে থাকবে না। ভাণ্ডারলিক হয়ত তার কাছ থেকে ভরসা পেয়ে এসেছে। তাই জিজ্ঞেস করলাম : 'তিনি কি বলেছেন ?'

'সেই হতভাগাটার কথা আর বলো না।' ভাণ্ডারলিক উত্তেজিত হয়ে উঠল : 'বুড়ো হয়ে বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। বুড়োদের দিয়ে কোন কাজই হবে না। কিন্তু আমরা, আমরা যুবক-সোশ্যালিস্টের দল চুপ ক'রে বসে থাকব না।' ভাণ্ডারলিক একটু থেমে আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল : 'আমরা যুবক, আর-একটা সর্বনাশা মহাযুদ্ধ আমরা চাই না। আমরা চাই না কারো একনায়কত্ব, চাই না বর্বরতা। বিপ্লব আনতে হবে আমাদের। ডি. পুলিশের প্ল্যান যোগাড় করেছে ; জেনেছে, তাদের ভিতরে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। তুমি জানো, এমস্বুত্তেলে ওরা নাকি পাহাড়া দিতে রাজি হয়নি ?'

'ডি. এখন কোথায় ?'

'হেডকোয়ার্টার্সে। সেখানে সে চুল ছিঁড়ছে রাগে। কমিউনিস্টরা তাকে বিশ্বাস করে না। আমরা যুবক-সোশ্যালিস্টরাও বুঝতে পারছি না তাকে বিশ্বাস করবো কি করবো না। সে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কেন্দ্রে বসে পুলিশ বিভাগের প্ল্যান বিক্রি করতে চাইছে। এখন কি করবো বল তো ?'

'আমি আসছি, তুমি "চতুঃঋতু" হোটেলে আমার জন্য অপেক্ষা কোরো।' এই বলে ওর কাছে বিদায় নিয়ে আবার চলতে শুরু করলাম।

পথে পুলিশ আর জনতার ভিড়। কমিউনিস্টদের দেখা যাচ্ছে। জনতার দুর্ভেদ্য দেয়াল তুলে দাঁড়িয়ে আছে তারা। সে দিকে কেউ যেতে পারছে না। আমি ওদের পথ ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলাম, কিন্তু ওরা চুপ ক'রে রইল।

ধমকালাম, তর্ক-বিতর্ক করলাম, কিন্তু ওরা তেমনি বোবা। দূরে জনকে দেখা গেল। ডাকলাম, সে শুনতে পেল না। এবার ফিরে চললাম হোটেলে।

নাচ চলছে। জোড়ায় জোড়ায় সুন্দরী আর বিলাসী পুরুষের দল নাচছে; পরিচারকরা ঘুরছে ব্যস্ত হয়ে। পিয়ানোয় বাজছে হাল্কা সুর। একটি লোক বাজাচ্ছে পিয়ানো, এবার সে চোখ বুজে গান জুড়ে দিল।

ভাণ্ডারলিক আমাকে দেখে বললে: 'তুমি তাহলে এসেছ দেখছি, ভালোই হলো। খবর শোনো, আমরা এবার ঝাঁপিয়ে পড়বো। দুপুর রাতে পাহারা-বদলির সময়। তখন আমরা হানা দেব ডেভিডস্ট্রাসের থানায়, আর দুটোর সময় এমস্বাত্তেলে।'

'প্ল্যান ক'রে তা হ'লে বিপ্লব করছ বলো?'

'ঠিক তাই, দুপুর রাতে পাহারা বদলাবার সময়। তখন আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো তাদের উপর। আমাদের দলের লোকজন সব প্রস্তুত।'

ওর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলাম। হঠাৎ বাজনা থেমে যাওয়ায় চুপ ক'রে যেতে হলো। এবার লাউড স্পীকারে চিৎকার উঠল। যারা নাচছিল তারা যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল; মুখ গম্ভীর। ঠোঁটে তখনও ফুটে আছে হাসি। তারা নিঃশব্দে গিয়ে বসল যে যার জায়গায়।

স্বর শোনা গেল, চাপা স্বর। নির্বাচনী প্রতিযোগিতার ফলাফল বলছে।

এক মুহূর্তে রেস্তরাঁ বোবা হয়ে গেল। বাইরে থেকে শুধু ভেসে আসছিল জনতার শব্দ।

সাইরেন বেজে উঠল ডকে। কোটি কোটি লোক চুপ ক'রে শুনল ঘোষকের সেই চাপা স্বর। কোন্ দল কত ভোট পেয়েছে তার সংখ্যাগুলো সে বলে চলল। ঘোষক তার প্রাপ্য মজুরী পেয়েছে, বলে যাচ্ছে তোতাপাখীর মতো। সেগুলো ঠিক কিনা সে-কথা কেউ ভেবে দেখল না। এখন তা নিয়ে মাথা ঘামিয়েই বা লাভ কি? হিটলার জিতেছে। অসম্ভব হ'লেও এটাই এখন রূঢ় সত্য। জার্মানীর ভাগ্য স্থির হয়ে গেছে, আর হিটলার এখন সেই ভাগ্যবিধাতা। এ এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। জার্মানী, তোমার ক্ষেত্রে সত্যই অবিশ্বাস্য। কিন্তু অবিশ্বাস্য ব্যাপারই তো ঘটে গেল!

ঘোষক শেষে বললে: 'নির্বাচনী প্রতিযোগিতা নির্বিঘ্নে শেষ হয়ে গেছে।'

সবাই চুপ। একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ঝরে পড়ল। বেতনভুক পিয়ানোবাদক শুরু করল জাতীয় সংগীত। মেয়েরা সুরে সুর মেলালো।

আমি ভাণ্ডারলিকের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম ঘর ছেড়ে।

এগারোটা বাজে। এবার আমরা এসে পৌঁছলাম ট্রেড ইউনিয়নের অফিস-রেস্তরাঁয়। একটা টেবিল ঘিরে আটজন লোক বসে আছে। ওদের মধ্যে হার্বার্টকে চিনতে পারলাম। চোখে দুটো তার জ্বলছে উত্তেজনায়। আমাকে দেখেই বলল : 'অভিনয়ের দিন ফুরিয়ে গেছে বন্ধু! এসেছে কাজের সময়। জার্মানীর ভাগ্য আজ যারা স্থির করল, তাদের পাশা আমরা উল্টে দেব। আমরা ঠিক করেছি—'

জিজ্ঞেস করলাম : 'আমরা বলতে তুমি কাদের কথা বলছ? সোশ্যাল-ডেমোক্রাট যুবসঙ্ঘ নাকি? সোশ্যালিস্টরা কি করছে? অন্য ইউনিয়নগুলোর খবর কি? কমিউনিস্টরা কি করছে?'

'ইউনিয়ন গোল্লায় যাক!' হার্বার্টের চোখ জ্বলে উঠল উত্তেজনায়। আমরা জিতলে ওরা আমাদের সঙ্গেই হাত মেলাবে, আমরা হারলে ওরা হবে আমাদের শত্রু। ওদের কথা নিয়ে মাথা ঘামায় কে? কিন্তু কমিউনিস্টদের সঙ্গে আমরা এখনো যোগাযোগ করতে পারি নি। আর সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কথা বলছ? ওরা তো অকেজো বুড়োর দল! ঠিক করেছি, বিপ্লবে আমরাই প্রথমে ঝাঁপিয়ে পড়ব। তখন সবাই এসে যোগ দেবে আমাদের সঙ্গে। হাঁ, তারা যদি খাঁটি হয় যোগ দেবেই, শুধু শুরু হওয়ার প্রতীক্ষায় আছে। আমরা নেব সেই শুরু করার ভার।'

তাকিয়ে দেখলাম, হার্বার্টের মত আরো ক'জন যুবক জড়ো হয়েছে তাদের প্রাণ উৎসর্গ করতে : দু'জন সাংবাদিক, দু'জন শ্রমিক, একজন অভিনেতা, একজন আইনজীবী আর একজন শিক্ষক। শেষের লোকটির দিকে চোখে পড়তেই চমকে উঠলাম। বেঁটে-খাটো, টাক্‌পড়া একটি লোক কোণে চুপ ক'রে বসে আছে। মাথা ঘুরে গেল, মনে হলো মূর্ছিত হয়ে পড়ব বুঝি। পাগলের মত চিৎকার ক'রে বললাম :

'আমি তোমাদের এই আড্ডায় কেন এসেছি জানি না। আমি সাংবাদিক। রাজনীতির কোন ধারই ধারি না।'

হার্বার্ট অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ভাণ্ডারলিক ছুটে এল আমার কাছে। সে ভাবল, আমি মাতাল হয়ে গেছি।'

তাকে বললাম : 'আমি চললাম।' তারপর ছুটে গিয়ে রেস্তোরাঁর প্রস্রাবখানায় ঢুকে কাঁপতে শুরু করলাম।

ঐ বেঁটে খাটো লোকটা কাইসার।

কাইসার!

আমার বুকের ভিতর তখনো কাঁপছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মোটে দশ মিনিটের ভিতরে এই কাণ্ড হয়ে গেল। কিন্তু হার্বার্টকে সাবধান করে দিতে হবে।

প্রস্রাবখানার দরজা খুলে গেল। হার্বার্ট ঢুকেই বলল: 'কি হয়েছিল তোমার?'

'কি হয়েছিল? তুমি জান না হার্বার্ট, ঐ কাইসার লোকটা কে? ও কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটির সভ্য ছিল। কালই মাত্র সবাই জানতে পেরেছে যে, এখন ও নাৎসী পার্টির গুপ্তচরের কাজ করছে। বিপ্লবের প্ল্যান তোমাদের এক্ষুণি পাল্টে ফেলতে হবে। তুমি এখনি রেস্তরাঁ ছেড়ে পালাও। যাও, যাও, তোমার উপর হাজার হাজার মানুষের মরা-বাঁচা নির্ভর করছে।'

মনে হলো হার্বার্ট আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না।

ওকে আর বোঝাবার শক্তি আমার ছিল না। ছুটে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসলাম। সেণ্ট্রাল স্টেশনে যখন পৌছলাম, তখন এগারোটা বেজে চৌদ্দ মিনিট।

ঘটনাটা শুনলাম পরে। পুলিশ এগারোটা বেজে কুড়ি মিনিটে ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে হানা দিল। তার তিন মিনিট আগে হার্বার্ট এবং আরো দু'জন চলে এসেছিল। হার্বার্ট সবাইকে গোপনে সাবধান ক'রে দিয়েছিল, কিন্তু কেউ তার কথা বিশ্বাস করে নি। এদিকে পাঁচজন টেবিলে বসে রইল। একজন ঘড়ি দেখে বলল, এগারোটা বেজে কুড়ি হয়েছে। বারোটা বাজতে কুড়ি মিনিটে আমাদের পৌছুতে হবে প্রধান কেন্দ্রে। এবার আমরা উঠে পড়ি।

কাইসার হাসতে হাসতে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলল: 'আমাদের পরবর্তী সভা বসবে স্বাধীন জার্মানীতে! হয়ত কালই আসবে সেদিন—'

এমন সময় বাইরে বিউগলের কর্কশ ধ্বনি শোনা গেল। ব্রেক্-কষার শব্দ উঠল। রিভলভার হাতে দলে দলে পুলিশ এসে ঢুকল রেস্তরাঁয়। সবাই লাফিয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে, একমাত্র কাইসার টেবিলে বসে রইল; তার মুখে মৃদু হাসি। এবার সবাই বুঝতে পারল, হার্বার্ট ঠিকই সন্দেহ করেছিল। ভাণ্ডারলিক চামড়ার খাপ থেকে রিভলভার খুলে নিঃশব্দে এগিয়ে এল কাইসারের

কাছে। পুলিশ এদিকে চারদিকে ঘিরে ফেলেছে, খানাতল্লাস চলেছে টেবিলে টেবিলে ; কারো কারো হাতে পড়েছে হাতকড়া।

কাইসার দেখতে পেল না, ভাণ্ডারলিক তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল ভাণ্ডারলিক, তার রিভলভার কাইসারের মুখের উপর উদ্যত। কাইসার চিৎকার ক'রে উঠল। সকলের দৃষ্টি পড়ল এবার কাইসারের দিকে। ভাণ্ডারলিক তার মুখ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল।

কাইসার উঠল চিৎকার ক'রে। কিন্তু রিভলভার গর্জন ক'রে উঠল না। তারপর শুরু হলো হাতাহাতি। সংকীর্ণ জায়গার জন্য পরস্পরের গুলি চালাবার উপায় ছিল না, চেয়ার-টেবিল ছুঁড়ে সোশ্যালিস্টরা পুলিশদের আক্রমণ করল।

বেশিক্ষণ যুদ্ধ স্থায়ী হলো না। দু'জন সোশ্যালিস্টকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল, দু'জন পালিয়ে গেল ; তাদের একজন ভাণ্ডারলিক স্বয়ং।

বারোটা বাজতে বিশ মিনিটে পুলিশ সোশ্যালিস্টদের দু'টি প্রধান কেন্দ্রে হানা দিল। হার্বার্ট আগেই সাবধান ক'রে দিয়েছিল বলে কারো দেখা মিলল না। গ্রস্নয়মার্কৎ-এর শূন্য পার্টি-অফিসে টেবিলের উপর হের্ কাইসার, এই শিরোনামা যুক্ত একখানা খাম পাওয়া গেল। খামের ভিতর ছোট্ট চিঠিতে লেখা : 'রিভলভারটা খারাপ ছিল বলে আমি খুশি হয়েছি সব চাইতে বেশি। তোমার মত লোক মরবারও উপযুক্ত নয়। তুমি বেঁচে থাকো। বেঁচে থেকে যাদের সঙ্গে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ, তাদের মৃত্যু-আর্তনাদ শোনো। সে-ই হবে তোমার চরম শাস্তি।'

পরদিন বন্দী সোশ্যালিস্টদের একজনের মৃতদেহ আলাস্টার থেকে তোলা হলো। তার মাথার খুলি গুঁড়িয়ে গেছে। এই সেই শিক্ষকটি। নাম আর্হেন।

প্রতিবার নির্বাচনী প্রতিযোগিতার ফলাফল বার হবার পর ডেমোক্রাটিক পার্টির সভ্যরা বিজয় উৎসব করে—যদিও নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় কয়েক বছর ধরে তারা হেরে আসছে। এবারও কিউরিও হাউসে বিজয় হলো। ডেমোক্রাটরা ভোটে দু'টি আসন মাত্র পেয়েছে এবার। অথচ দশ বছর আগে এরাই ছিল রাইখস্টাগের তিনটি শক্তিশালী পার্টির অন্যতম, পাঁচমিশেলী সংযুক্ত ভাইমার মন্ত্রীসভার স্তম্ভবিশেষ।

পার্টির তরফ থেকে নির্বাচনী প্রতিযোগিতার ফলাফল সম্বন্ধে পেটারসেন আর ল্যাণ্ডাল্ বক্তৃতা করলেন। তাঁরা বললেন যে, নাৎসী পার্টির এই

আশাতীত সাফল্যে তাঁরা বিস্মিত হয়ে গেছেন। গত নির্বাচনে নাৎসীরা বিশ লক্ষ ভোটে হেরেছিল, এবার গতবারের চাইলেও শোচনীয় পরাজয় তাঁরা আশা করেছিলেন।

একজন দর্শক উঠে জিজ্ঞেস করলেন: 'ভোট গণনায় কোন ভুল হয় নি তো?'

ল্যাণ্ডাল্ বললেন: 'লোকের মনে এ সম্বন্ধে সন্দেহ্ জাগা স্বাভাবিক। কেন না, রাজতন্ত্র এবং রিপাবলিকের শাসনকালে যার উপর ভোট গণনার ভার দেয়া হতো, সেই ওয়াগ্‌মানকে এবার সরিয়ে দিয়ে একজন ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্টকে সে-ভার দেয়া হয়েছিল। সে-যাই হোক্, ডেমোক্রাটরা সরকারী গণনাকেই অভ্রান্ত বলে মেনে নিয়েছেন।'

আমি হল্ থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। অটোর বাড়ি গিয়ে তাকে পেলাম না। একখানা চিঠি লিখে রেখে এলাম। তারপর ফিরলাম বাড়ি।

রবিবার, পাঁচই মার্চ, উনিশশ' তেত্রিশ সাল। য়ুরোপের ভাগ্য আজ স্থির হয়ে গেছে। কাল পৃথিবীর সংবাদপত্রগুলোতে বড় বড় শিরোনামায় খবর বেরুবে রাইখের নির্বাচনী প্রতিযোগিতা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেছে।

॥ চার ॥

পরদিন সমস্ত সকালটা কাটল আমার সেক্রেটারীর সঙ্গে নির্বাচনী প্রতি-যোগিতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখার কাজে। আমরা নির্বাচনী দ্বন্দ্বের খুঁটিনাটি ব্যাপারও বাদ দিলাম না। দুপুরে দু'জন বন্ধু এলেন। তাঁদের জিজ্ঞেস করলাম, নির্বাচনী দ্বন্দ্বের কোনো নতুন খবর তাঁরা দিতে পারেন কি না। বন্ধুদের নিয়ে লাঞ্চ খেতে গেলাম একটা রেস্তোরাঁয়। বুদ্ধিজীবী আর হামবুর্গের রাজ-নৈতিক দলগুলোর এটি একটি প্রধান আড্ডা। রেস্তরাঁয় ঢুকতেই পরিচারিকা আমাকে খবর দিল, আমারে উকিলবন্ধু এম্ তাঁর স্ত্রীকে গুলি ক'রে নিজে আত্মহত্যা করেছেন। এম্ সোশ্যালিস্ট লেবার পার্টির সেই সভ্যটি, যাঁকে আমি গত ক'দিন ধরে খুঁজছি। গতকাল তাঁর বাড়িতে গিয়ে শুনেছিলাম, তিনি শহর ছেড়ে চলে গেছেন। আজ এল তাঁর আত্মহত্যার খবর! দৃঢ়চেতা এম্, নাৎসী

শাসন-যন্ত্রের হাত থেকে 'মুক্তি' পেয়েছেন। আরও কত বলি পড়বে, কে জানে।

খবরটা টেবিলে টেবিলে ছড়িয়ে পড়ল। যাঁরা এখানে বসে খাচ্ছেন, সবাই ওঁকে চিনতেন। তাঁরা খবর শুনে কেমন হতভম্ব হয়ে গেলেন। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য; আবার উঠল ছুরি-কাঁটার ঝনঝনানি। পরিচারক এসে খবর দিল, কে আমাকে ফোনে ডাকছে। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিলাম।

'নাম বলতে বাধা আছে,' অচেনা স্বর শোনা গেল। 'কিন্তু আপনার ভালোর জন্যই বলছি। আপনার পেছনে গুপ্তচর লেগেছে। আপনি পালান! দেশের বাইরে চলে যান।'

আমি রিসিভার রেখে দিয়ে চলে এলাম। খাওয়া শেষ ক'রে বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি নিলাম। এস্‌প্লানেডে পার্টির অফিসে যাব। চারদিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলাম। না, কেউ আমাকে অনুসরণ করছে না। স্টেফান্‌স্‌-প্লাৎসে অফিসের সামনে এসে ট্যাক্সি বিদায় ক'রে দিলাম। ট্যাক্সি চলে যেতেই একটা লোক আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বিড়বিড় ক'রে বললে: 'অফিসে পুলিশ হানা দিয়েছে—' লোকটা এক মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ভেবে নিলাম, এখন কর্তব্য কি। তারপর পোষ্ট-অফিসে গিয়ে পুলিশের প্রচার-বিভাগে ফোন ক'রে বললাম যে, আমি শুনতে পেয়েছি, এসপ্লানেডে নাকি পুলিশ গুপ্ত-ষড়যন্ত্রকারীদের আড্ডায় খানাতল্লাস করছে; বিদেশী সংবাদপত্রের সংবাদদাতা হিসেবে আমার সেখানে যাওয়া চলতে পারে কিনা। আমার নিজের অবশ্য সংবাদ সংগ্রহের আলাদা ব্যবস্থা আছে। হানা দেওয়া হয়েছে কিনা—এই কথাই আমি জানতে চাই।

পুলিশের কর্তা এতক্ষণ গম্ভীর হয়েছিলেন, বিদেশী সংবাদপত্রের সংবাদদাতা শুনে নরম হলেন। অনুমতিও মিলে গেল। আবার এস্‌প্লানেডে ফিরে এলাম। এবারও কয়েকটি লোক আমাকে বারণ করল। কিন্তু তাদের কথায় কান না দিয়ে বাড়ীর ভিতরে ঢুকে পড়লাম। ঢুকেই দু'জন পুলিশের সঙ্গে দেখা। তাদের হাতে রিভলভার। হেসে বললাম: 'আমি অমুক্‌ কাগজের সংবাদাদাতা, কর্তার হুকুম নিয়ে এসেছি।' পুলিশ দুটি পথ ছেড়ে দিল। খানাতল্লাসী দলের কর্তা, ছোকরা সামরিক কর্মচারীটিকে বললাম: 'গেটে দুটি পুলিশ মোতায়েন রাখার আপনাদের কোন দরকারই ছিল না। কমিউনিস্টরা এখানে নিশ্চয়ই আর ফিরে আসবে না।'

কর্মচারীটি রেগে বললে : 'এইটে ওদের প্রধান আড্ডা, আসবেই। না এসে যাবে কোথায় ?'

'কতক্ষণ ধরে আপনারা খানাতল্লাস করছেন ?' জিজ্ঞেস করলাম : 'এরই মধ্যে দু'একজন ধরা পড়েছে নিশ্চয়ই ?'

'ধরা পড়েছে দু'চার জন। তারা এখানেই ছিল। এগারোটা থেকে বসে আছি। বাইরে থেকে একজন লোকও আসে নি।

আমি অনেক কষ্টে হাসি চাপলাম।

এবার সামরিক কর্মচারীটি আমাকে নিয়ে একটা ঘরে ঢুকল। ঘরের মেঝেয় জিনিস-পত্র ছড়ানো, এখানে ওখানে ছেঁড়া কাগজের টুকরো। তিনজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। হাত তাদের মাথার উপর তোলা।

কর্মচারীটির দিকে তাকিয়ে বললাম : 'এরা এমনিভাবে দাঁড়িয়ে কেন ?'

সে আমাকে টেনে নিয়ে গেল পাশের ঘরে। এইটিই পার্টির অফিস-ঘর। টাইপ-রাইটার রয়েছে টেবিলের উপর। একটা রোনিও মেসিন, কাগজের তাড়া ঘরের মেঝেয় ছড়িয়ে আছে। বেকারদের আধপেনি চাঁদায় একদিন এই জিনিসগুলো কেনা হয়েছিল।

ফোনটা ক্রিং ক্রিং ক'রে বেজে উঠল। কর্মচারীটি রিসিভার তুলে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বলল : 'পুলিশের প্রচার-বিভাগ থেকে আপনাকে ডাকছে।'

শুনলাম, স্বর ফোনের ভিতর দিয়ে ঝরে পড়ছে : 'পুলিশ প্রচার-বিভাগ, কমিউনিস্ট পার্টির পুলিশ প্রচার-বিভাগ থেকে বলছি।' মনে হলো কোথায় যেন শুনেছি এ স্বর। হঠাৎ মনে পড়তেই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। অটো, অটো কথা কইছে! সে বললে : 'উত্তেজিত হয়ো না বন্ধু। আমি তোমার কাছে কতকগুলো খবর জানতে চাই। ১। ক'জন পুলিশ আছে ওখানে ? ২। সব জিনিস-পত্র কি সরিয়ে ফেলা হয়েছে ? ৩। ক'জন গ্রেপ্তার হয়েছে ? ৪। ভেবে দেখ, আমরা কিছু করতে পারি কিনা ?'

উত্তর দেয়া সহজ নয়, কর্মচারীটি আমার পাশে দাঁড়িয়ে। ও কি কল্পনা করতে পারছে, ফোনে কি বলে গেল অটো ? ওর কি শ্রবণ-শক্তি ভীষণ তীক্ষ্ণ ? আমি বললাম : 'প্রথম নম্বরের উত্তর পাঁচ, দ্বিতীয়, না ; তৃতীয়, তিনজন পুরুষ, একজন স্ত্রীলোক। চার নম্বর প্রশ্নের উত্তর—' একটু ইতস্তত ক'রে বললাম : 'এখানে বসে আমি কিছু ভাবতে পারছি না।' রিসিভার রেখে দিয়ে কর্মচারীটিকে

জিজ্ঞেস করলাম, বন্দীদের সঙ্গে কথা কইবার অনুমতি সে আমাকে দিতে পারে কি না। সে সম্মত হলো। আমরা আবার বন্দীদের ঘরে ফিরে গেলাম। কর্মচারীটি হুকুম দিতেই তারা ফিরে দাঁড়াল। সবাই আমার চেনা ; ওদের ভেতর নিকলকেও দেখলাম। লেফটেনাণ্ট বললে : 'এই ভদ্রলোক সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধি। এই শুয়োরের দল, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এঁর প্রশ্নের জবাব দে।'

চারজনই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। নিকল শুধু বুঝতে পারল আমার উদ্দেশ্য। অন্য সবাই আমাকে বিশ্বাসঘাতক ভাবল। আমি কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বললাম : 'বড় জবর ফাঁদে পড়েছ বন্ধু! পাশের ঘরে যে কাগজপত্র পাওয়া গেছে সেগুলো তোমাদের বিরুদ্ধেই বলবে। আর লোকসানের ভয় নেই। এখনো সময় আছে, বন্ধুরা কোন উপায় খুঁজে বার করবেই।'

নিকল আমার কথার তাৎপর্য বুঝতে পারল। লেফটেনাণ্ট আমাকে টেনে নিয়ে পাশের ঘরে এসে বললে : 'আপনি যে কথাগুলো বললেন, তার মানে কি? আমার কাছে তো প্রলাপ বলেই মনে হলো।'

হেসে বললাম : 'ওটা হচ্ছে আসামীদের পেটের কথা বার করার একটা সহজ উপায়। আপনি যদি কাউকে বলেন, তার বেশি কিছু ক্ষতি হবে না, তাহলে সে নিশ্চয়ই খুশি হয়ে দু'একটা গোপন কথা অজান্তে বলে ফেলবে। আপনার কি আমার এই পদ্ধতি ভাল লাগছে?'

লেফটেনাণ্ট আমার কথায় বিশ্বাস করল। দু'জনে আবার বন্দীদের ঘরে ফিরে গেলাম। তাদের জিজ্ঞেস করলাম : 'আমার কাগজের জন্য কোন নতুন খবর তোমরা কেউ দিতে পারবে?'

তারা মাথা নেড়ে অস্বীকার করল। এবার লেফটেনাণ্টের তৈরি করা এখানে পাওয়া জিনিসপত্রের তালিকাটা দেখলাম।

লেফটেনাণ্টের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে। ঠিক তেমনি আছে শহর, একটুও বদলায় নি। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। পথে পথে আলো, গাড়ী ছুটছে ; মোড়ে মোড়ে হকার হাঁকছে সান্ধ্য খবরের কাগজ। একখানা কাগজ কিনলাম। এস্‌প্লানেডের কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে হানার খবর বেরিয়েছে। জার্মান-রুশ ট্রানস্‌পোর্ট কোম্পানীর ডিরেক্টরের আত্মহত্যা, তা ছাড়া আছে এখানে ওখানে পুলিশের ছোটখাটো হামলার খবর।

ঘরে ফিরে চললাম। পথে যার সঙ্গে দেখা হলো সে-ই নতুন নতুন খবর

শুনিয়ে গেল। কেমনিৎসে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা বিপ্লব শুরু করেছে। তারা লাইপৎসিগের উপর চড়াও হয়েছে; ব্যাভেরিয়া রাইখ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে; রাইনের উপর সেতুগুলো উড়িয়ে দেয়া হয়েছে; মধ্য জার্মানীতে খনি অঞ্চলে শুরু হয়েছে ধর্মঘট—এমনি নানা ধরনের খবর আমি সংগ্রহ করলাম। এ সব খবরের ভিতর কতখানি সত্য ছিল আমি জানতাম না, কিন্তু সবাই এই বলে শেষ করল, বিপ্লব শুরু করেছে সবাই, আর এখানে সব চুপচাপ। তিক্ততা দেখা দিল তাদের স্বরে। বুঝি হতাশা।

সেদিন, সেই ৬'ই মার্চে হামবুর্গ কিন্তু একেবারে চুপ ক'রে ছিল না। গুলির শব্দ শোনা যায় নি বটে; পথে দেখা দেয় নি মিছিল, তবুও সেদিন সন্ধ্যেয় পথে যে ভিড় জমেছিল, তেমন ভিড় কোন দিন দেখিনি। বাড়ী, কারখানা আর রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে সমস্ত হামবুর্গ যেন সন্ধ্যের অন্ধকারে পথে পথে নীরবে ঘুরছে। সেই জনতার মধ্যে নারী আর শিশু কম। ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্টদেরও দেখা যাচ্ছে, তারা গাইছে গান। জনতা তাদের মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে দেখছে। রথাউসমার্কেটের কাছে প্রচণ্ড ভিড়—বড় বড় দোকানের লোহার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। গাড়ী চলাচলের পথ বন্ধ।

বিপ্লবের ক্ষণ এসেছে। জনতা একটি মাত্র ইঙ্গিতের অপেক্ষায় উদগ্রীব। সাড়ে পাঁচটায় সোশ্যালিস্ট পুলিশের কর্তা বুড়ো ডানারকে বরখাস্ত করা হলো। সাতটার আগে অন্য কোন লোককে সে-পদে নিযুক্ত করা হলো না। সাড়ে পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত হামবুর্গের শান্তিরক্ষী বাহিনী নেতৃত্বহীন হয়ে রইল।

কিন্তু ইঙ্গিত এল না।

সাতটায় বিপ্লবের ভূত মিলিয়ে গেল। আবার রাস্তার মোড়ে মোড়ে বেটন হাতে মোতায়েন হলো পুলিশ; অন্ধকারের বুকে পড়ল সন্ধানী আলো; ঝঞ্ঝাবাহিনী পথ কাঁপিয়ে চলল গর্বে। পুলিশের নেতৃপদ পেয়েছে এবার একজন ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্ট।

জনতার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। বিপ্লবের ক্ষণ উত্তীর্ণ। পথে লোহার নাল্ লাগানো বুটের শব্দ; পুলিশের হুংকার। সাতটা বেজেছে। নৈশ ভোজনের সময় হয়ে এল।

বৃষ্টি শুরু হলো। পথ এবার জনশূন্য।

পথে এখানে ওখানে পরাজিত দলের সভ্যদের দেখতে পেলাম। কোটের কলার তোলা, চোখের উপর তাদের টুপি নামানো। আজ আর বাড়ী ফেরার

তাদের উপায় নেই। হয়তো এতক্ষণে পুলিশ সেখানে হানা দিয়েছে। কোথায় যাবে তারা? বৃষ্টি জোর পড়ছে।

একটু রাত করে 'ঋতুরঙ্গ' হোটেলে ঢুকে পড়লাম। ম্যাক্সের সঙ্গে দেখা। সে রাইখস্টাগের অগ্নিকাণ্ডের রাতে গ্রেপ্তার হয়েছিল। প্রমাণ অভাবে তাকে সেই দিনই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সে আমাকে দেখে বললে: 'এবার রাজনীতি ছেড়ে দেব। কি হবে এসব ক'রে?' হতাশাময় তার স্বর।

ম্যাক্সের অতীত ইতিহাস আমি জানতাম, জানতাম তার হতাশাময় শৈশবের কথা। সে এক বিবাহিতা স্ত্রীলোকের জারজ সন্তান। ম্যাক্স জীবনে কোনদিন স্নেহ পায় নি। একা কেটেছে তার জীবন। নিজের চেষ্টায় সে লেখাপড়া শিখে এক অফিসে আজ চোদ্দ বছর ধরে কেরানীগিরি করছে। সাত বছর ধরে সে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের সভ্য। একশ বারো মার্ক মাইনে পায়, তার থেকে সাড়ে সতেরো ট্যাক্স, অসুখ আর ইনসিওরেন্সে ব্যয় হয়।

আমি তার কথার কোন উত্তর দিতে পারলাম না। টেবিলের উপর হাত রেখে সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলল: 'আমার চাকরী গেছে। আর একটা চাকরী যোগাড় করারও পথ আমি রাখি নি।'

আমি জানতাম, সে কমিউনিস্ট পার্টির একজন একনিষ্ঠ কর্মী, তবু বলে ফেললাম: 'ঝঞ্ঝাবাহিনীতে যোগ দাও।'

'না, না, না-খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরলেও আমাকে দিয়ে তা হবে না।' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল ম্যাক্স।

কেন জানি না তার উপর সন্দেহ হলো। সেও বুঝতে পারল। কিছুক্ষণ পরে সে চলে গেল।

রেস্তরাঁয় ভিড় জমে উঠছে। জোড়ায় জোড়ায় নাচ শুরু হয়েছে, পিয়ানো-বাদক বাজাচ্ছে; এদিক ওদিক ঘুরছে পরিচারকেরা। ঝঞ্ঝাবাহিনীর কালো য়ুনিফর্ম-পরা দুটো ছোকরা বারে হোটেলের পরিচারিকার সঙ্গে ইতর রসিকতা জুড়ে দিয়েছে। মেয়েরা হানছে বিলোল কটাক্ষ।

আমি বারে এলাম। ঝঞ্ঝাবাহিনীর ছোকরা দুটি কি বলাবলি করছে, কান পেতে শুনলাম।

'তার ফটো ছাপানো হয়েছিল পনেরো হাজার। প্রতিটি গুপ্তচর আর ঝঞ্ঝাবাহিনীর সভ্যের কাছে এক একখানা ক'রে সেই ফটো ছিল। আমরা

পুলিশকে বলে ছিলাম, ওকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করতে, কিন্তু পুলিশ রাজী হয় নি। অবশেষে পার্টি থেকে চাঁদা তুলে পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। যে তাকে ধরতে পারবে, পাবে পাঁচশ' মার্ক পুরস্কার!'

'কোথায় ধরল তাকে ?'

'হোল্‌স্টাইন্ রেল স্টেশনে। আমাদের পার্টির একজন তাকে চিনতে পেরেছিল। তার পেটের সঙ্গে বাঁধা একশ'র উপরে প্রচার-পুস্তিকা পাওয়া গেছে। পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কি আর সে করে নি! চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়েছিল, কিন্তু আমাদের পার্টির লোকেরা এবার আর তাকে পালাবার ফুরসত দিল না।'

তাহ'লে এডগার আণ্ড্রি ধরা পড়েছেন। সাহসী সুচতুর আণ্ড্রি কমিউনিস্ট পার্টির প্রাণ। তিনিই ছিলেন পার্টির সেরা সংগ্রামী। দু'বছর আগে ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্টরা এক সভায় তাকে গুলি করে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। সে গুলিতে হেনিঙ্ বলে একটি লোক মারা যায়। আদালতে বিচারের সময় আসামীরা বলে, তারা হেনিঙ্‌কে ভুলে হত্যা করেছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আণ্ড্রির প্রাণ নেয়া।

আজ সেই হত্যাকারীরা ছাড়া পেয়েছে। হত্যায় হত্যায় লাল হয়ে উঠেছে আজ জার্মানীর মাটি।

ঝঞ্ঝাবাহিনীর মানুষদের আলাপ-আলোচনা শুনছিলাম: 'এডগার আণ্ড্রিকে গ্রেফতার করায় কমিউনিস্টরা একেবারে ঢিট্ হয়ে গেছে।'

ভাবছিলাম এখন কি কর্তব্য।

এমন সময় হলে এসে ঢুকল হার্বার্ট আর ফ্রাউ বি। আমাকে দেখে হার্বার্টের হাত চেপে ধরে বি কানে কানে কি যেন বলল। দেখলাম, ওরা দু'জন আবার বেরিয়ে যাচ্ছে। হার্বার্ট আমার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল। সে অপ্রতিভ।

দাম চুকিয়ে দিয়ে আমি পথে এসে ওদের ধরলাম। চমৎকার রাত। উজ্জ্বল রাতের আকাশ। আলস্টারের রেলিঙে ভর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রেমিক-প্রেমিকার দল।

আমি যেন খুব খুশি—এমনি ভাবখানা দেখালাম। আর গিয়েই হার্বার্ট-এর পিঠ চাপড়ে দিলাম—তার সঙ্গে যে সঙ্গিনী আছে সে-কথা যেন ভুলেই গেছি। হার্বার্ট অস্বস্তি বোধ করছিল। ওদের কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে হার্বার্টের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলাম 'হালালি' পানশালায়।

ফ্রাউ বিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এল। একটা টেবিল দখল ক'রে আমরা বসলাম। এতক্ষণ মাতালের ভান করছিলাম, এবার স্পষ্ট স্বরে ফ্রাউ বিকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার উপর তার রাগ কেন।

ফ্রাউ বি সুশ্রী তরুণী, কিন্তু গম্ভীর। কোন কথা বলা বা শোনার সময়ে সে সতর্ক, সজাগ। তার চোখ দুটি দীর্ঘপদ্মে ঢাকা। হাসেও খুব কম, কিন্তু যখন হাসি ফুটে ওঠে তার মুখে, সে যেন আরো সুন্দরী হয়ে ওঠে।

ফ্রাউ বি আমার দিকে তাকিয়ে বলল: 'আপনি হার্বার্টের বন্ধু। তার উপর আপনার প্রভাব খুব বেশি বলেই আপনার সঙ্গে তার মেলামেশা আমি পছন্দ করি না। তার এখন উঠতি সময়, রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামালে তার ক্ষতি হবে।'

'ও! আপনি তার বিপদের ভয় করছেন?'

'যদি ভয় করেই থাকি,' ফ্রাউ বি হাসল: 'তাও তো অন্যায় নয়। আমরা শীগ্‌গিরই দু'জনে একটা নাটকে প্রধান দু'টি ভূমিকা গ্রহণ করব। যদি তার আগেই কোন বিপদ ঘটে, কি হবে বলুন তো? ওর জন্য আমারও ক্ষতি হবে, এ আমি সইতে পারব না। প্রথম রাত হয়ে যাক্, তারপর রাজনীতি নিয়ে যত খুশি মাতামাতি করুক না, আমি কিছু বলব না।'

সে হাসতে হাসতে হার্বার্টের কাঁধের উপর হাত রাখল। হার্বার্ট কি যেন বলতে গিয়ে চেপে গেল।

বয় মদ নিয়ে এল; ঘুরল কথার মোড়; চঞ্চল মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীর আলোচনা। এমন সময় আর-একজন অভিনেতা এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। তার গাড়ী আছে, সে বললে আমাদের সে বাড়ী পৌছে দেবে। কিছুক্ষণ পরে আমরা দাম চুকিয়ে দিয়ে উঠে পড়লাম। এমন সময় চশমা-পরা একটি লোক ঢুকল ঘরে। হার্বার্ট তাকে দেখে আবার চেয়ারে বসে পড়ল। ফ্রাউ বি পেছন ফিরে ছিল বলে প্রথমে বুঝতে পারে নি। এবার দেয়ালের আয়নায় সে আগন্তুকের মুখ দেখতে পেল।

'চলো!' সে মৃদুস্বরে বলল: 'এখানে তোমার দরকার কি হার্বার্ট? তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো, কাল আবার মহড়া আছে।'

হার্বার্ট কিন্তু তার কথা রাখল না; বরং বেশ আড়ম্বর করেই তার হাতে চুমু খেয়ে তাকে বিদায় দিলে। ফ্রাউ বি আমার দিকে তাকিয়ে নমস্কার ক'রে বেরিয়ে গেল। তাকিয়ে দেখলাম, সে ভুলে তার দস্তানা জোড়া ফেলে গেছে।

চশমা-পরা লোকটি এবার এগিয়ে এল আমাদের টেবিলের দিকে। সে আর কেউ নয়, ভাণ্ডারলিক।

আমি উপরের ছাদের দিকে তাকালাম। ভাণ্ডারলিক আমার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে আমাদের টেবিলে না এসে বারে চলে গেল। হার্বার্ট আশ্চর্য হয়ে বলল: 'কি ব্যাপার বলো তো?'

এমন সময় ফ্রাউ বি ব্যস্ত হয়ে এসে বলল: 'সে তার দস্তানা ফেলে গেছে। আমার মনে হলো ভাণ্ডারলিককে আমাদের টেবিলে না দেখতে পেয়ে সে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। সে একবার চারদিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখল। আমি ভাণ্ডারলিকের দিকে দেখিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে তাকে চেনে কি না। সে মাথা নেড়ে অস্বীকার ক'রে চলে গেল। আমার কিন্তু মনে হলো, ভাণ্ডারলিককে সে চেনে। আর তাই ভয়ও পেলাম। সে চলে যেতেই ভাণ্ডারলিকের কাছে গিয়ে বললাম: 'এখান থেকে এক্ষুণি সরে পড়। একঘণ্টা পরে ইন্দ্রায় দেখা করো।'

ভাণ্ডারলিক চলে গেল।

বিশ মিমিট পরে এসে হাজির হলো কাইসার, তার সঙ্গে দু'জন লোক। ফ্রাউ বিকে আগেই সন্দেহ করেছিলাম, এবার পেলাম তার প্রকৃত পরিচয়। কাইসার লোক দু'টোকে চলে যেতে বলে আমাদের টেবিলে এসে জাঁকিয়ে বসল। হার্বার্টের মুখ শুকিয়ে গেল। আমি কাইসারকে কথায় কথায় বললাম:

'হের কাইসার, তুমি জানো বোধহয় যে রাজনীতি নিয়ে আমি কোনদিনই মাথা ঘামাই না। কিন্তু তোমাকে এখানে আরামে বসে থাকতে দেখে আমার হাত নিসপিশ করছে। কাউকে মারধর করলে আট দিনের বেশি জেল হয় না —এই না আইন। এক মিনিট সময় দিলাম, তাপরপরও যদি তুমি এখানে থাকো তাহ'লে এমন মার খাবে যে জীবনে আর লোক-সমাজে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।

'আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।' কাইসার বলল।

'এক মিনিট পরেই বুঝতে পারবে।'

কাইসার আমাদের দিকে তাকিয়ে উঠে পড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

হার্বার্ট আর আমি এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করলাম না। বয় আবার মদ নিয়ে এল। নিঃশব্দে মদের গেলাসে চুমুক দিলাম। একসময়ে আস্তে

আস্তে হার্বার্টকে বললাম : 'ফ্রাউ কি কি পেশাদার মেয়ে-গোয়েন্দা, না সখ ক'রে একাজে নেমেছে ?'

হার্বার্ট উত্তেজিত হয়ে উঠল : 'আমি তোমাকে বারণ করছি।'

'চটছো কেন, তুমিই তো আলস্টার প্যাভেলিয়নে সেদিন এই ইঙ্গিতই করেছিলে।'

'ভুল করেছিলাম,' হার্বার্ট বিড়বিড় ক'রে বলল : 'সেদিন আমার মাথার ঠিক ছিল না। একজন মেয়ে কখনো পারে—?'

'পারে বইকি !'

হার্বার্ট আমার দিকে তাকাল চোখ তুলে। বলল : 'শোন, এ ছাড়া যে আর উপায় নেই। ও মনে করে গোয়েন্দাগিরি করা ওর কর্তব্য। এদিকে কিন্তু খুব ভাল মেয়ে।' হার্বার্ট বলতে লাগল : 'ও বলে রাজনীতি আমার প্রতিভা নষ্ট ক'রে দেবে, তাই তোমাদের সঙ্গে মিশতে দিতে এত আপত্তি। তুমি মনে ক'রো না, এ ওর ফাঁকা কথা। ওর কাছে এর চেয়ে সত্য আর নেই।'

অনেকক্ষণ দু'জনে চুপ ক'রে বসে রইলাম। একসময়ে খুব সাবধানে বললাম : 'কিন্তু গোয়েন্দাগিরি এভাবে চলতে থাকে তো কি হবে ? শেষ কোথায় ?'

'বেশি দিন চলবে না, তা বলতে পারি।' হার্বার্ট হাসল। 'গোপনে তোমাকে বলছি, ও আমাকে ভালোবাসে। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি, রাজনীতির কথা ঘুণাক্ষরেও কেউ উচ্চারণ করব না। কিন্তু কি বলব তোমাকে, আমি চাই ওকে সোশ্যালিস্ট দলে। ওকে আমি ভালোবাসি কি না এখনও খতিয়ে দেখি নি। কিন্তু ওর এই যুদ্ধ আমার কাছে ভারি ভাল লাগে।'

আমি উত্তর দিলাম না। দাম চুকিয়ে দিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। এবার ইন্দ্রায় যেতে হবে। ভাণ্ডারলিক অপেক্ষা করছে সেখানে। পথে নেমে দেখে নিলাম কেউ অনুসরণ করছে কিনা। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে চললাম সেণ্ট পলির দিকে। বাইরে চমৎকার রাত। কিন্তু আমাদের মনে উঠেছে ঝড়।

ইন্দ্রা। তেমনি লোকের ভিড়, তেমনি আলো-আঁধারি ভাব। সিনেমা হলের অন্ধকারে জোড়া জোড়া চীনা মজুর আর শ্বেতাঙ্গী মজুরনী ; বাজনা বাজছে। ভাণ্ডারলিককে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। ফিল্ম দেখতে বসে গেলাম। ভাণ্ডারলিককে দেখা গেল কিছুক্ষণ পরে। সে দু'টি স্থূলাঙ্গী স্ত্রীলোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। ইশারা করতেই এঁসে আমাদের পাশে

বসে পড়ল। তাকে বললাম: 'যে মেয়েটিকে আজ 'হালালি' রেস্তর াঁয় আমাদের টেবিলে দেখেছ, তার নাম ফ্রাউ বি। সে নাৎসী।'

ভাণ্ডারলিক হার্বার্টের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল: 'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।' তারপরে চুপ ক'রে গেল। ট্যাঙ্গোর চপল সুর ভেসে এল নীচের নৃত্যশালা থেকে।

'হার্বার্টকে সন্দেহ করো না ভাণ্ডারলিক!' আমি বললাম।

হার্বার্ট নীরব।

পরিস্থিতি মোটেই সুখকর হয়ে উঠল না। আবার ওদিকে রাত বাড়ছে। রেলিঙের উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে নীচের দিকে তাকালাম। বাজনা থেমে গেছে। হল্ খালি হয়ে আসছে। পরিচারিকারা থামে ঠেস দিয়ে হাই তুলছে। আবার বসে পড়লাম। হার্বার্ট আর ভাণ্ডারলিক দু'জনেই নীরব।

আমরা উঠে পড়লাম। নীচে এসে হার্বার্ট আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল। তাকিয়ে দেখলাম, দূরে সে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার জনহীন পথে শুধু শোনা যেতে লাগলো তার পদধ্বনি।

খানিকক্ষণ পরে আমরাও ইন্দ্রা থেকে বেরিয়ে এলাম। স্মুকস্ট্রাসে এসে পড়েছি। জনবিরল পথ। চীনে রেস্তর াঁগুলোর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। এখানে ওখানে টহল দিচ্ছে পুলিশ। চারদিক নিস্তব্ধ।

ভাণ্ডারলিক হঠাৎ বলে উঠল: 'তোমাকে বলি শোন, বুর্জোয়া পরিবারের সন্তান আমি। আমার বাবা কয়েকটা কোম্পানীর ডিরেক্টার। বাড়িতে ভোজ বসলে প্রতি চেয়ারের পিছনে একজন ক'রে পরিচারক দাঁড়িয়ে থাকে—এমনি আমাদের আভিজাত্য। আজ বারো বছর বাবাকে আমি দেখিনি। চৌদ্দ দিন আগে বাবা হঠাৎ হামবুর্গে এসেছিলেন। যখন তিনি ঘরে এসে ঢুকলেন, আমি দাড়ি কামাচ্ছিলাম। বাবা যে কখন এসে দাঁড়িয়েছেন, টেরও পাই নি। আমরা কোন সম্ভাষণ জানালাম না, এমনকি করমর্দন পর্যন্ত করলাম না। পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি দরজা বন্ধ ক'রে আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন: "তোমার মা বলছিলেন, তুমি যদি দিন পনেরোর জন্য বাড়ী থেকে ঘুরে আস তো ভাল হয়।" এবার তিনি থেমে একটা সিগারেট ধরালেন।'

ভাণ্ডারলিক চুপ করল, চশমা খুলে ফেলল। শিশুর মত অসহায় তার মুখ। তাকে নিয়ে পথে বেরিয়ে এলাম। অনেকক্ষণ চললাম টালস্ট্রাস ধরে। ধীর কণ্ঠে ভাণ্ডারলিক বললে:

'কিছুই তোমাকে বলা হয়নি। ছোটবেলা থেকে কত মতবাদের ঘূর্ণিতে ঘুরলাম। ফ্রাঙ্কফুর্টে যখন ইতিহাস পড়ছিলাম, তখন ন্যাশনালিস্ট লীগে ভিড়ে পড়েছিলাম। তারপরে অর্থনীতি। শীগ্‌গিরই বুঝতে পারলাম, পৃথিবীতে একটি মাত্র আদর্শ দাঁড়াবে, আর সে-আদর্শ হচ্ছে কমিউনিজম। আমি হলাম কমিউনিস্ট। ফ্রাইবুর্গে হুসালের কাছে পড়ে আমার ভুল ভেঙে গেল। মার্কসবাদীরা পৃথিবীকে আংশিকভাবে দেখেছে, পূর্ণতা নেই তাদের দর্শনে। এবার হলাম সোশ্যাল-ডেমোক্রাট। কিন্তু নেতাদের সঙ্গে আমার কখনও মতে মেলেনি। যে-এবার্ট সোশ্যালিস্টদের বিরুদ্ধে আইন পাশ হবার পর ব্রেমেনে পালিয়ে গিয়েছিলেন, প্রেসিডেণ্ট এবার্টের সঙ্গে তাঁর ঢের পার্থক্য। নেতারা নিজেরাই হচ্ছেন এক-একজন মূর্তিমান বিশৃঙ্খলা। তাঁরা বৃদ্ধ হয়ে নিজেদের জন্য বাঁচতে চাইলেন, আর আমরা যুবকরা বাঁচতে চাইছি আমাদের আদর্শের জন্য। একে কি বলবে, এই কি প্রকৃতির আইন—না, আদর্শের ট্রাজেডি!'

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হেঁটে আবার বললে :

'হাঁ, বাবাকে কি বললাম শোন—আমি তাঁর সঙ্গে যেতে নারাজ। তিনি ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় শুধু বলে গেলেন, তাঁকে আমার প্রয়োজন হবে, আর তা শীগ্‌গিরই। আমার বাবা অভিজাত জাতীয় প্রতিষ্ঠান কিফ্‌-হাউস লীগের কার্যকরী কমিটির সভ্য।'

ভাণ্ডারলিক নীরব হলো। এবার আমরা টালস্ট্রাস পার হয়ে চলেছি বন্দরের দিকে। ভোর হয়ে এসেছে; ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে; পথের আলোগুলো কাঁপছে।

এলোমেলো ছেঁড়া-খোঁড়া কথার টুকরো মগজের ভিতর পাক খাচ্ছিল। বুড়ো ভাণ্ডারলিক হচ্ছেন কিফ্‌হাউস লীগের সভ্য আর তাঁর ছেলে একজন বিপ্লবী! পুলিশ তার অনুসন্ধানে ঘুরছে, হুলিয়া বেরিয়েছে। হার্বার্ট একজন সোশ্যালিস্ট, কিন্তু যে মেয়েটিকে সে ভালোবাসে সে হিটলারের গোয়েন্দা! অটো একজন খাঁটি কমিউনিস্ট, অথচ তার স্ত্রীর ভাই ঝঞ্ঝাবাহিনীর সভ্য! চমৎকার!

যারা পরস্পরকে ভালোবাসে তারাই আবার পরস্পরকে ঘৃণা করে! অজানা, অচেনা লোক আবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে দাঁড়ায়! সভ্যেরা অন্ধভাবে নিজেদের দলের লোকদের ভালোবাসে—অন্য সবাইকে তারা অন্ধভাবে ঘৃণা করে! হাঁ অন্ধভাবেই! এই তো জার্মানী আর তার জনগণের আসল রূপ! ক্ষুধা আর ভালোবাসা! মৃত্যু আর সুখ—একই অন্ধ আবেগ দ্বারা পরিচালিত!

হাঁ, এ এক অন্ধ আবেগ।

শুধু এই তিনটি উদাহরণ দিলাম—কিন্তু এই তো জার্মানীর মানুষের পরিচয়।

'আমি এখন একা,' ভাণ্ডারলিক শুরু করল: 'বাবার কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। তিনি রাজনৈতিক মতবাদের জন্য আমাকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। তিনি সত্যি তা হয়তো করেন নি। বাড়ি খানাতল্লাস করতে এসে ওরা যাতে উইলখানা দেখতে পায় এই জন্যই করেছেন। মা হয়ত এ ব্যাপার জানেন না। কিন্তু সত্যি হোক্, মিথ্যে হোক্, বাবার এ চিঠির কথা আমি জীবনে ভুলব না—'

'হতাশ হচ্ছো কেন? এখনও তোমাদের দলের প্রায় সব সভ্যই বাইরে আছে!'

'হাঁ, তা আছে। এখনও পুলিশ আমাদের দু'একজনকে ছাড়া গ্রেপ্তার করতে পারে নি। আমরা এখনও আছি আর আছে আমাদের সমাজতন্ত্রবাদের স্বপ্ন। আর আমরা সামান্য দল নই, বিশ্বাস আমাদের দলকে করেছে একগোষ্ঠীতে পরিণত। একজন নাৎসীদের হাতে নির্যাতিত হয়ে প্রাণ দিলে আর একজন তার কাজ তুলে নেবে হাতে। আমরা ভুলে গেছি আমাদের বংশ-গরিমা: আমাদের বাপ, মা আর প্রেমিকার কোন স্থান নেই আমাদের বুকে। আমরা ঝাঁপিয়ে পড়েছি, বিপ্লবের আগুন জ্বালব আমরাই।'

'নিজেদের এমনি ক'রে প্রতারণা করছ ভাণ্ডারলিক—' আমি তার উচ্ছ্বাসে বাধা দিলাম। 'কিন্তু এই কি প্রতারণার সময়? তোমাদের দলের কোন অস্তিত্বই আর নেই। আর যদিও বা থেকে থাকে, কি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলো? কি আছে তোমাদের? গুটিকয়েক শিক্ষিত যুবক আর মহান্ আদর্শ! কিন্তু নেই লোকবল, নেই অস্ত্রবল। অন্যদিকে আছে পঞ্চাশ লক্ষ ভাড়াটে সৈন্য।'

ভাণ্ডারলিক হাসল। 'পঞ্চাশ লক্ষ সৈন্য তাদের আছে বলেই ভয় করব? নাৎসীরা সেদিনও একশ জনের বেশি ছিল না! ফরাসী বিপ্লব যারা করেছিল তারা সংখ্যায় ছিল মুষ্টিমেয়, আর যীশুখৃষ্ট তো একাই যুদ্ধ করেছিলেন!'

'কিন্তু তাঁরা বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ ক'রে জানতে চান নি, তাঁরা কি চান। তাঁরা যা চান তার দাবি অনুভব করেছেন তাঁদের প্রাণে। তাই এসেছে তাঁদের বিপ্লবে সফলতা। আর তোমরা বুদ্ধিজীবীর দল, তোমরা ভাল করেই জানো কি চাও, কিন্তু সে-অনুভূতি তোমাদের কোথায়!'

'তোমার কথার,' গম্ভীর ভাণ্ডারলিক ধীরকণ্ঠে জবাব দিল: 'আমি

উত্তর দিতে রাজি নই। আমাদের দল আজ ভেঙে গেছে একথা খুবই ঠিক। আমাদের সভ্যতালিকা নেই; নেই দলের পতাকা, দলের সিন্দুকে একটা কানা-কড়ি আজ পাওয়া যাবে না। কিন্তু তবু আমরা আছি। সারা জার্মানী জুড়ে রয়েছি আমরা। আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য সবাই একসঙ্গে জড়ো হবো। বর্তমানে ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্টদের খবরের কাগজ প্রচার করছে, দেশে কোনো প্রতিষ্ঠানের আর অস্তিত্ব নেই, তাদের সভ্যরা হয় দল ছেড়ে দিয়েছে, নয় তারা মৃত। তাদের এই অপপ্রচার জনগণকে করেছে প্রভাবিত। তারা হতাশ হয়ে নাৎসীদলে নাম লেখাচ্ছে। আমাদের প্রমাণ করতে হবে, এখনও হিটলারী-দল দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব পায় নি, এখনও আমরা বেঁচে আছি। হিটলারীদলকে আঘাত করার হাতিয়ার এখনও আছে আমাদের।'

ভাণ্ডারলিক থামল। আমরা ব্রীজের কাছে এসে পড়েছি। ফরসা হয়ে আসছে। কালো নদীর জলে ভোরের আবছা আলো। দূরে বন্দরে জাহাজের বাতিগুলো জ্বলছে। কৃষ্ণা নদী বয়ে চলেছে নিঃশব্দে—তার প্রশস্ত বুক এখনো আলোয় আলো হয়ে ওঠেনি। তার এখনো ঢের দেরী।

ভাণ্ডারলিকের সঙ্গে ঠিক হলো তাদের কার্যকরী কমিটির আগামী অধিবেশনে আমি উপস্থিত থাকব।

'সাংবাদিক হিসেবে কিন্তু,' ওকে জানিয়ে দিলাম।

ভাণ্ডারলিক মাথা নেড়ে সমর্থন করল। তারপর হেসে বলল: 'কোথায় অধিবেশন হচ্ছে শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। হামবুর্গে এমন নিরাপদ জায়গা আর দু'টি নেই। তুমি জানো কিনা বলতে পারি না, আমরা কমিউনিস্ট আর অন্য সব বে-আইনী দলের সঙ্গে দলাদলি ভুলে গিয়ে কাজ করব বলেই এই সভা ডাকা হয়েছে। তারপর দলাদলির দিন তো পড়েই আছে। তখন আবার যে যার মতবাদ নিয়ে লড়াই করব। ও, হ্যাঁ, জায়গাটার কথা তোমাকে বলছি। সেটা হচ্ছে হামবুর্গের 'একো'র অফিস। কেমন জায়গাটি বলো তো!'

হামবুর্গের 'একো' জার্মানীর সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মুখপত্র। আজ কয়েক সপ্তাহ ধরে তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। ছাপাখানা বন্ধ হয়ে গেছে, দরজায় পড়েছে সীলমোহর। সভার পক্ষে এর চাইতে নিরাপদ জায়গা আর হামবুর্গে সত্যিই নেই। নাৎসীরা কল্পনাই করতে পারবে না যে, সেখানে সভা হতে পারে।

এবার আমরা পরস্পরের কাছে বিদায় নিলাম। সেতু পার হয়ে চললাম।

আমার পাশ দিয়ে চারজন পুলিশ চলে গেল। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম পথের পাশের দেয়াল লেখায় লেখায় ভরে উঠেছে: বাঁকা-চোরা অক্ষরগুলি উদ্ধত ভঙ্গিতে ঘোষণা করছে: 'হিটলার আমাদের রুটি দাও, নইলে আমরা আবার কমিউনিস্ট বনে যাব।'

পুলিশ হাসতে হাসতে দেয়ালের লেখা মুছে ফেলছে।

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার দিকে তাকিয়ে একজন পুলিশ খেঁকিয়ে উঠল: 'হঠো!' আমি এগিয়ে চললাম। এবার ঝঞ্ঝাবাহিনীর এক সৈনিকের সঙ্গে প্রায় ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। তাদের মধ্যে একজনকে চেনা-চেনাও মনে হলো। সে আমাকে দেখে চোখও টিপলে। কিন্তু আমি ওদের দিকে না তাকিয়ে সোজা এগিয়ে চললাম। আজকাল ঝঞ্ঝাবাহিনীর সৈনিকদের সঙ্গে দেখা হওয়াটাই বিপজ্জনক। হিটলারী কুর্নিশ না নিলে বা অমনি তুচ্ছ অপরাধে ওরা মানুষকে পিটিয়ে খুন ক'রে ফেলতেও ছাড়ে না। তাই এগিয়ে চললাম। কিছু দূরে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে দেখলাম। এবার চেনা-চেনা মানুষটিকে ঠিক চিনলাম। সে ডিউক।

।। পাঁচ ।।

আমার বন্ধুরা আমাকে এবার সাবধান ক'রে দিতে লাগলেন। সরকারী মহল নাকি জানে, অন্তরালের রাজনীতির সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। নাৎসী দপ্তরে আমার কার্যকলাপের বিবরণী-ভরা ফাইলও নাকি মজুদ। নিজেও টের পেলাম, আমার চারদিকে গোয়েন্দা।

বাইরে তো তারা আমার পেছনে ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায়, ঘরেও তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। বাইরে থেকে এসে প্রায়ই দেখি, আমার টেবিলে জিনিসপত্র যেখানে ছিল, সেখানে নেই। একদিন দেখলাম, আমার বাড়িউলিটি রান্নাঘরে বসে কাঁদছে!

তারপর থেকে আমার ঘরের বিশৃঙ্খলা আরো বেড়ে গেল। আমার পাশের ঘরের বাসিন্দা হের বশ্‌। তিনি ছিলেন এক সময়ে ডেমোক্রাট দলের ডেপুটি। ইদানীং তিনি ভোল পাল্‌টে হিটলারী দলে ভিড়ে গিছলেন। এবং বাড়িউলির

প্রণয়ী হিসেবে বেশ বহাল তবিয়তেই এখানে ছিলেন। হঠাৎ তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। এখন তাঁর পদোন্নতি হয়েছে, আর থাকবেন কেন? বাড়িউলির তাই এই কান্না। সময়টা এখন অস্থির, অধীর সাধারণ মানুষের জন্য। এ যে এক বিপর্যয়ের সময়। জাতীয়তার অপস্মার রোগে ভুগছে জার্মানী। ওলট-পালট হয়ে গেছে সব; যারা একদিন রাজনীতির ধারও ধারত না, তারাও আজকে রাজনীতির ঘূর্ণীতে পাক খাচ্ছে। রাজনীতির ধার ধারে না, একথা কেউ আজ আর শপথ ক'রে বলতে পারে না। আজ তারা নিজের বাবা-মা, স্ত্রী-পুত্রের উপর গোয়েন্দাগিরি ক'রে নিজেদের দেশপ্রেম জাহির করতে লেগে গেছে।

বিদেশী কাগজের সংবাদদাতা হিসেবে আমার কাজ বেড়েছে অসম্ভব। অন্যান্য দেশ জার্মানীর খবর জানার জন্য উদ্‌গ্রীব। এদিকে জার্মানীর সংবাদপত্র-জগতে আলোড়ন শুরু হয়েছে। উদারপন্থী সংবাদপত্রগুলো প্রধান সম্পাদকদের বরখাস্ত ক'রে সেখানে তাদেরই ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্ট মতাবলম্বী ছেলেদের বসিয়ে দিচ্ছে। বিদেশী কাগজের প্রতি পুরোনো দিনের সে-সদ্ভাব আর নেই, তাই আমাদের মত বিদেশী কাগজের সংবাদদাতাদের আজকাল খবর সংগ্রহের জন্য ছুটোছুটি করতে হয়। উপায় কি? অন্যান্য দেশ চিৎকার ক'রে জানতে চাইছে খবর। টাট্‌কা গরম খবর!

কিন্তু কি খবর দেবো আমরা? খবর যোগাড় করছি আমরা, কখনও বা টুকরো-টাকরা, কখনো বা সম্পূর্ণ একটা ঘটনার খবর। কিন্তু তারই আড়ালে যে অভিনয় চলছে, সেখানে আমাদের ঢোকবার অধিকার নেই। এ যেন এক সংবাদের গোলকধাঁধা। সবগুলোর হদিশ জানা নেই, তাই সমস্ত ছবিখানি আমরা কেউ বুঝতে পারছি নে। যখন বুঝতে পারলাম, তখন বড় দেরী হয়ে গেছে।

আজ আমরা বুঝি, সেদিন কিসের লড়াই চলেছিল জার্মানী জুড়ে, কিন্তু তখনো তা জানতাম না। কিন্তু তবুও আছে ওখানকার দৈনন্দিন স্মৃতি। আমার আদর্শ ছিল বলেই, যারা পরাজিত হলো তাদের সঙ্গেই যুক্ত ছিলাম। হয়তো বেশি করেই ছিলাম। তাই আমি দেখেছি, বুঝেছি—আবার সন্দেহও জেগেছিল মনে।

আমার আত্মবিশ্বাসে চিড় খেয়ে গিয়েছিল সেদিন। পরাজিত পক্ষের বন্ধু আমি, তাদের সঙ্গে ছিল আমার আদর্শের সহানুভূতি। সাংবাদিক হিসেবে উপকারও করেছি, কিন্তু তবু আমার বিবেক ভীতি আর সংশয়ের ধোঁয়ার

উঠেছিল মলিন হয়ে। তখন কলিং বেল বেজে উঠলে বা গাঙেফিরতেল্-এর গুপ্ত পরামর্শ সভায় ভবিষ্যৎ কর্মসূচী আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে পায়ের শব্দ, কি দরজায় করাঘাত শুনলে আঁতকে উঠতাম। এই তো আমার বিবেক! এই আমার আত্ম-বিশ্বাসের চেহারা!

আত্ম-বিশ্বাস কি ক'রে থাকবে? জার্মানীতে যে ঝড় উঠেছিল, তাতে সব ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল। বিপদ—প্রতি মুহূর্তে, প্রতিপদে বিপদ।

সেই সন্ধ্যের কথা আজও স্পষ্ট হয়ে মনে আছে। ভুলতে চাইলেও তা ভুলতে পারি না। সারাদিন ধরে বৃষ্টি ঝরছিল। সেদিন সন্ধ্যেয় অটোর বাড়ি গেলাম। পলা একা বসে রান্না ঘরে; পাশের ঘরে অটো চাপা গলায় কাদের সঙ্গে আলাপ করছে। দরজায় ধাক্কা দিতেই কথা থেমে গেল। অটো বলল: 'কে—?'

'আমি।' নিজের পরিচয় দিলাম।

অটো বেরিয়ে এসে আমাকে রান্নাঘরে অপেক্ষা করতে বলল। তারপর দরজা বন্ধ ক'রে দিলে।

ঘুমন্ত শিশুদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে। পলা বসে আছে আগুনের ধারে, হাত দুটো বুকের উপর। আমি একটা টুল টেনে নিয়ে ওর পাশে বসলাম। দু'জনই চুপচাপ। বাইরে একটানা বৃষ্টির শব্দ। ও ঘরে অটোরা কথা বলছে; অস্ফুট তাদের কণ্ঠস্বর। হঠাৎ বাইরে ভারী বুটের শব্দ বেজে উঠল। পাথুরে পথের উপর কারা যেন আসছে। কারা? ওদের আমরা চিনি, ওদের আজ চেনে সারা জার্মানী। বৃষ্টির একঘেয়ে শব্দ ডুবে যাচ্ছে ওদের বুটের আওয়াজে।

পলা আর আমি চুপ ক'রে বসে রইলাম; একটুও নড়লাম না। শব্দ বাড়ির দরজায় এসে থেমে গেল। ক'জন হবে কে জানে। তিন জন, না চার জন? পাশের ঘরে ওরাও বোধ হয় শুনতে পেয়েছে। অস্ফুট কথাবার্তা আর কানে আসছে না। সব নীরব। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, পালাবার উপায় আছে কি না। একটি মাত্র দরজা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই। একটা জানালাও নেই ঘরে। পলা আমার হাতখানা চেপে ধরল; আমরা চুপ ক'রে বসে রইলাম।

শব্দ এবার সিঁড়িতে এগিয়ে আসছে। পলার হাতখানা কি ঠাণ্ডা! আরো কাছে শব্দ। আমি ওর হাতের উপর আমার হাতখানা বুলোতে লাগলাম।

শব্দ থেমে গেল। পলার হাত ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়লাম। নীরব, সব

নীরব! বাইরে বৃষ্টির একটানা একঘেয়েমি, ঘরে শিশুদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। কে যেন দেশলাই জ্বালবার চেষ্টা করছে। একবার, দু'বার, তিনবার; খস্ খস্ শব্দ উঠছে। হঠাৎ অন্ধকার ঘরে ভেসে এল এক চিলতে আলো দোরের ফাঁক দিয়ে। কে একজন গম্ভীর গলায় পড়ছে দরজার পিতলের ফলকে লেখা অটোর নাম।

এক ভগ্নাংশ-মুহূর্তের বিরতি। সময়ের হৃদ্‌স্পন্দন যেন থেমে গেছে। আবার শব্দ, ভারী বুটের শব্দ। উপরের সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, চলে যাচ্ছে, ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে শব্দ।

পলা এবার উঠে আলো জ্বালল। তার সন্তানেরা ঘুমোচ্ছে, তাদের সুন্দর ঘুমন্ত মুখের উপর পড়েছে আলো। অটোরা সব শুনতে পাচ্ছে পাশের ঘরে। আবার আলাপের গুঞ্জন ভেসে আসছে।

কিছুক্ষণ পরে অটো তার বন্ধুদের বিদায় দিয়ে এ ঘরে এসে বলল, সে এক্ষুণি বেরুবে। আমি ইচ্ছে করলে তার সঙ্গে আসতে পারি। হয়তো তাকে একটু সাহায্যও করা হবে।

আমরা পথে বেরিয়ে কোটের কলার তুলে দিলাম। বাইরে ঝরছে একটানা বৃষ্টি। আয়নার মত ঝকঝক করছে পথ, জনবিরল পথ; পার্ক খাঁ খাঁ করছে। দু'একটা গাড়ী, ট্রাম ছুটে চলছে। দু'একটি লোক চলেছে, ওভারকোট মুড়ি দিয়ে।

সাতটা, এখন সাতটা। রথাউসমার্কেটের কোণে সেই বুড়ি চোখ বুজে রবারের বর্ষাতি মুড়ি দিয়ে বসে আছে খবরের কাগজ নিয়ে। অটো তার কাছে গিয়ে একখানা "হামবুর্গের নাখরিখ্‌টেন" চাইলে। আশেপাশে কোথও কেউ নেই। বুড়ী চোখ খুলে তাকিয়ে বিড়বিড় ক'রে বলল: 'বেশ।' অটো তার আরো কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করল। কিন্তু হাওয়ায় বার বার নিবে গেল দেশলাইয়ের কাঠি। বুড়ি বিড়বিড় ক'রে বকে চলেছে। আমি দূরে দাঁড়িয়ে দু'একটা কথা শুনতে পেলাম। 'ছাপাখানা···দশটা বেজে বিশ মিনিট···'

অটো বহুক্ষণ চেষ্টার পর এবার সিগারেট ধরাল। আমাকে ইশারা ক'রে পেছনে আসতে বলে সে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে টিউব স্টেশনের দিকে চলল। আমিও পেছু নিলাম। টিউব স্টেশনটি বেশ খটখটে শুকনো। অটো হঠাৎ খুঁড়িয়ে চলতে শুরু করল। থেমে পড়ে জুতোটা খুলে দেখল, ভিতরে পাথরের কুচি ঢুকেছে কি না। বুঝতে পারলাম, এই সুযোগে সে টিউব রেলওয়ের ম্যাপখানা

ভাল ক'রে দেখে নিচ্ছে। টিকিট ঘরের কেরাণীটির সঙ্গে টিউবের নতুন ভাড়া নিয়ে সে আলোচনা করতে লাগল। কিন্তু তার চোখ রইল ঘড়ির দিকে। একটা ট্রেন এসে হাজির হলো। অটো আর দেরী না ক'রে গাড়ীতে উঠে পড়ল আমাকে নিয়ে। গাড়ীটা প্রায় ফাঁকা। এখানে ওখানে দু'একজন লোক। এক কোণে দু'জন মজুর বসে বই পড়ছে। স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে ছুটছে গাড়ী। দেখতে দেখতে মজুর দু'টি ছাড়া আর কেউ-ই গাড়ীতে রইল না। অটো এতক্ষণ চুপ ক'রে বসেছিল, এবার সেই মজুর দু'টিকে জিজ্ঞেস করল : 'বার্টেলস্‌মানের ব্যাপারটা কি? কি হয়েছে?'

'আমাদের ঠকাবার তালে আছে পাজিটা। ওকে আর বিশ্বাস করা যায় না।'

'সন্দেহের কারণ কি তোমাদের? প্রেসের মালিক হয়ে ও যে আমাদের কাজ ক'রে দিচ্ছে, এই তো যথেষ্ট। আমরাই তো ওকে হাতের মুঠোর মধ্যে রেখেছি ; ও তো রাখেনি।'

'কিন্তু এখন একেবারে অবস্থাটা বদলে গেছে। সে স্পষ্টই বলে দিয়েছে, এ সব হুজ্জুৎ-হাঙ্গামার ব্যাপারে সে আর নেই। তবে যদি দাম বাড়িয়ে দেখা হয় তাহ'লে একবার ভেবে দেখবে। দামও আবার আগের চেয়ে দুনো।'

অটো একটু ভেবে বলল : 'এস, আমরা এখানে নেমে পড়ি।'

সুক্রম্প স্টেশনে তিনজনে নেমে পড়লাম। একজন মজুর গাড়ীতেই রয়ে গেল। আমরা খানিকটা হেঁটে পৌঁছলাম বার্টেলস্‌মানের ছাপাখানায়।

বেশ বড় ছাপাখানা, কম্পোজিটারের দল কাজ করছে, মেসিন ঘরে চলছে ছাপার কাজ। আমরা এবার এসে অফিসে ঢুকলাম। বুড়ো মজুরটি রইল বাইরে আমাদের অপেক্ষায়।

অফিস ঘরে একটা চেয়ারে বসে একজন আধাবয়েসী লোক প্রুফ দেখছিল, অটো তার কাছে গিয়ে বলল : 'আপনি নাকি আরো টাকা চেয়েছেন?'

লোকটি মৃদু উত্তর দিল : 'হাঁ।'

'কিন্তু আপনি কি জানেন না যে, এর চাইতে বেশি দেয়ার শক্তি আমাদের নেই। আপনি যাদের কাছ থেকে টাকা পান, তারা কেউ বড় লোক নয় : বেশির ভাগই তারা বেকার। নিজেরা আধপেটা খেয়ে তবে ছাপার খরচ যোগায়। এক-একটা পয়সায় তাদের রক্ত আর চোখের জল লেগে আছে।'

বার্টেলস্‌মান বিরক্ত হয়ে বলল : 'ওসব উপন্যাস আমাকে শুনিয়ে কোন লাভ নেই। আমি ওসব জানিনে, জানতেও চাইনে। ছাপাখানা দিয়ে আমি

সংসার চালাই, আমার স্ত্রী-পুত্র আছে। শুধু ব্যবসার খাতিরেই সন্ধ্যেবেলা তোমাদের কাছে প্রেস ভাড়া দিয়েছি। নিজেদের কম্পোজিটার, মেসিন-ম্যান নিয়ে এসে রোজ তোমরা কি ছাপছ, না ছাপছ, একবার জানতেও চাই নি। কিন্তু অত কমে আমি আর পারব না বলে দিচ্ছি। তোমাদের ক্লাবের কাগজপত্র অন্য কোথাও ছাপবার ব্যবস্থা করো।'

অটো ধীরে ধীরে বলল : 'আমরা ক্লাবের কাগজপত্র ছাপতে আপনার ছাপাখানা ভাড়া নিই নি। আমরা বর্তমান গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে রোজ এখানে ইস্তাহার ছাপছি।'

'গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ইস্তাহার!' বার্টেলস্‌মান ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। 'অমন সাংঘাতিক ঠাট্টা কখনো করতে হয়? না হয়, কিছু বেশী টাকাই চেয়েছি।'

'কিন্তু এত বেশি চেয়েছেন যে, সে-টাকা যোগাতে হলে আমাদের একশ' জন লোককে মাসভোর উপোস ক'রে থাকতে হয়।'

'তাই বলুন না। বেশতো, কিছু কমই নেবো।' বার্টেলস্‌মান আস্তে আস্তে বলল : 'দুনো চেয়েছি, না হয়, সেখানে শতকরা তেত্রিশ মার্ক বেশী নেব। আর ব্যাপারটাও জানাজানি হবে না।'

'কিন্তু আমরা যা দিচ্ছি, তার উপর এক কাণাকড়িও আর বাড়াতে রাজী নই।'

'তাহ'লে আর কি করব? অন্য ছাপাখানা দেখ।' বার্টেলসমান চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

অটো সিগারেট ধরাল। কিছুক্ষণের বিরাম। মেশিন চলছে, শব্দ আসছে, ছোট্ট অফিস-ঘরখানা কাঁপছে।

'আপনি ভেবেছেন, চাপ দিয়ে আমাদের কাছ থেকে বেশি টাকা আদায় করবেন। আর তা যদি না পারেন, আমাদের ধরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও আপনার হাতেই রয়েছে। কিন্তু আপনি এখনও লোক চেনেন নি। আপনার মতন এমনি ধারা লোককে শিক্ষা দিতে আমরা জানি। না, না, আপনাকে চটাবার আমার ইচ্ছে নেই। তবে আপনি যদি আমাদের ধরিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র ক'রে থাকেন, তাহ'লে সে-জাল থেকে আপনিও রেহাই পাবেন বলে মনে হয় না। আপনার বাড়ি খানাতল্লাস করলেই আমাদের ইস্তাহারের দু'একখানা সংখ্যা বেরিয়ে পড়বে।'

'ও! তাহ'লে তোমরাই আমার বাড়িতে ইস্তাহার পাঠিয়েছ!

'আজ্ঞে হাঁ, আমরাই। তাছাড়া এমন প্রমাণও আমরা দিতে পারি যাতে

ক'রে আদালতে প্রমাণও হবে, আপনি সব জেনে শুনে আমাদের ছাপাখানা ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। বলুন, এখন কি করবেন ?'

বার্টেলস্‌মান কি যেন বলতে গেল। তার মুখ শুকিয়ে গেছে, কপালে দেখা দিয়েছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

অটো তাকে বাধা দিয়ে বলল : 'আপনার কোন ভয় নেই। আপনাকে ফাঁসাবার কোন ফন্দিই আমাদের নেই। আমরা আপনাকে আগের দামই দেব, অনুগ্রহ ক'রে আমাদের কাগজ ছেপে দেবেন। যদি সস্তায় কোন কাগজ আপনার বিক্রির থাকে, আপনার কাছ থেকেই আমরা কাগজ কিনতে পারি। সেদিক থেকে আপনার লোকসানটুকু আশা করি পূরণ হবে।'

অটো এবার বিদায় নিয়ে উঠে পড়ল। বার্টেলস্‌মান উঠে তার কাছে এসে ফিস ফিস ক'রে জিজ্ঞেস করল : 'চারদিকে পুলিশ পাহারা। কি ক'রে ইস্তাহার তোমরা বিলি কর, আমাকে বলতে পার ?'

'ছাপাখানার পাশের নালাটা বুঝি দেখেন নি ?'

'নালাটা! দেখেছি বই কি।'

'ওখানে এসে আমাদের সাবমেরিন দাঁড়ায় তা জানেন না বুঝি ?' অটো গম্ভীর স্বরে বলল।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বার্টেলস্‌মান।

আমরা বেরিয়ে এলাম। বুড়ো মজুরটি দাঁড়িয়ে আছে। তাকে সব কথা বলতেই সে অটোর পিঠে চাপড়ে বললে : 'সাবাস কমরেড!'

অটোর মুখখানা খুশীতে ঝলমল ক'রে উঠল, আবার পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম : 'কি হলো আবার ?'

'সবই তো হলো,' অটো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল : 'কিন্তু—?'

'কিন্তু কি—' অটো নীরব।

আমরা পথের পাশে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম। তিনজনেই চুপচাপ। জোড়ায় জোড়ায় প্রেমিক-প্রেমিকা চলেছে, ফিস ফিস ক'রে কথা কইছে।

অটো এবার বলে উঠল : 'কিন্তু পলা—!' তারপরে একটা বেঞ্চি দেখিয়ে বললে : 'ঐ দেখ, পলা আর তার ভাই!'

এক সময়ে বললাম : 'কাল আমি পলাকে সব বুঝিয়ে বলব অটো।'

অটো চুপ ক'রে রইল।

॥ ছয় ॥

বাড়ি ফেরার পথে এলাম য়ুঙ্‌ফের্নস্টাইগ-এর সেই সাধারণের ব্যবহৃত ফোনের কুঠরীতে। ফোন-ডাইরেক্টরীর পাতা উল্‌টে দেখলাম, লেখা আছে ডাকঘর···বুঝলাম, আমার নামে স্টেকাস্‌মাৎস্‌এর ডাকঘরে একখানা চিঠি পড়ে আছে। পরদিন চিঠিখানা উদ্ধার করা গেল। তারপর সন্ধ্যেয় অটোর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বাড়িতে কেউ নেই। অনেকক্ষণ পায়চারি করলাম বাড়ির সামনে। ঝঞ্ঝাবাহিনীর য়ুনিফর্ম-পরা একদল যুবক চলে গেল পথ কাঁপিয়ে: পথ আবার জনহীন; সন্ধ্যার বিবর্ণ আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম, ঘা মারলাম দরজায়। না, এখনও কেউ ফেরে নি। আবার নামতে শুরু করলাম। অন্ধকারে ভাঙা সিঁড়ি দুটো দেখতে না পেয়ে পা হড়কে একেবারে হুড়মুড় ক'রে নিচে পড়ে গেলাম। নিচে একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল, সে আমাকে ধরে ফেলল।

'ধন্যবাদ!' তাকিয়ে দেখলাম, তার পরনে ঝঞ্ঝাবাহিনীর য়ুনিফর্ম।

'ধন্যবাদ!'

লোকটা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল: 'বাড়িতে কাউকে পেলেন না বুঝি? আমিও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, কাউকে দেখি নি। আমি পলার ভাই। অটোকে আপনি বলবেন, এখনও সময় আছে।'

'কি আপনি আবোল-তাবোল বকছেন? পলার ভাই আপনি? পলা কে? অটো, কোন্ অটোর কথা বলছেন? দশ-বিশজন অটো আর পলাকে আমি চিনি।'

'দশ-বিশজনের মধ্যে একজনের কথাই আমি বলছি, যার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখা না পেয়ে আপনি ফিরে এলেন।' দেখুন, আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করবেন না। আমি ঝঞ্ঝাবাহিনীর লোক। অটোকে বুঝিয়ে বলবেন, সে যেন সাবধান হয়। পলা আমার বোন, তাকে ভালোবাসি বলেই বলছি। অটো ধরা পড়লে বোন আমার পাগল হয়ে যাবে। তখন কি হবে বলুন তো? না, না, আপনি বলবেন, বুঝিয়ে বলবেন।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম : 'তুমি অটোর উপর নজর রাখছ, পলা একথা জানে ?'

সে বিব্রত হলো। 'পলা ? না, সে কিছু জানে না। ঈশ্বর করুন, সে যেন কিছুই জানতে না পারে। আমার যখনই ছুটি থাকে আমি এখানে এসে পাহারা দিই। আপনি বলবেন অটোকে, যারা এখানে আসে তাদের সবাইকে আমি চিনি। সে যদি এখনও সাবধান না হয়, আমি তাকে দলবল-সুদ্ধ ধরিয়ে দেব। আপনার নামটা তো জানা হলো না। যাক গে, দরকার হ'লেই জেনে নিতে পারব। আশা করি, দরকার হবে না।'

এবার সে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এসে দরজায় আস্তে আস্তে ঘা দিলাম।

অটো জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ইশারায় ওল্ডলর্নস্-হোটেলে দেখা করতে বলল। আমি কোনদিকে না তাকিয়ে নেমে এলাম পথে। তারপর এ-গলি সে-গলি ঘুরে ঘুরে ওল্ডলর্নস-এ এসে হাজির হলাম। তখনও অটো আসে নি। একটা নিরিবিলি কোণ দেখে বসে পড়ে পরিচারিকাকে কুমেল আনতে হুকুম দিলাম। কিছুক্ষণ পরেই দরজা নড়ে উঠল। অটো ঢুকল ঘরে।

'চাকরিটা খতম হয়ে গেল।' অটো আমার পাশে বসে পড়ল। 'ওরা আমাকে কারখানার মজুরসঙ্ঘের সম্পাদক নির্বাচন করেছিল। আজ উপরওয়ালা নোটিশ দিলে, ওখানে আর কাজ করা চলবে না, আমি কাজ ভাল পারিনে বলেই আমার চাকরিটা খতম হলো ! মজুরের দল খাপ্পা। বলছে, ইউনিয়নের সভা বসিয়ে ধর্মঘট চালাবার আয়োজন করবে। অনেক বুঝিয়ে ওদের ঠাণ্ডা ক'রে এসেছি। ধর্মঘটের দিন তো আসছে, চাকরি যাওয়ার মত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ধর্মঘট করার কি আর সময় আছে ? কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নের দিক থেকে বিশেষ আশা-ভরসাও পাচ্ছি না। নাৎসীরা বড় চালাক। ওরা ট্রেড ইউনিয়নের হোমরা-চোমরা সভ্যদের সঙ্গে আপোস করতে চাইছে। আপোস ক'রে তারপর লাথি মারবে। মাথাওলা সব ট্রেড ইউনিয়নের চাঁইরা কিন্তু বুঝতে পারছে না। তারা নাৎসীদের পা চাটছে। তবে একটা আশা আছে। নাৎসীরা ইউনিয়ন ফাণ্ডের টাকাকড়ি নিয়ে প্রথমে একটা গোলমাল বাঁধাবে, কর্তাদের তখন টনক নড়বে নিশ্চয়ই।'

'তুমি আমাকে এসব কথা শোনাচ্ছ কেন ?'

অটো কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল : 'তুমি যদি—'

আমি তাকে বাধা দিলাম : 'না, না, আমি চাই না, কোন দলের সঙ্গে আমি সংশ্রব রাখতে চাই না। ওসব নির্বুদ্ধিতা—'

'নির্বুদ্ধিতা! হাঁ, তা নির্বুদ্ধিতা বই কি!' অটোর স্বর তিক্ত হয়ে উঠল : 'আমরা যে কাজ করছি, সাবধানী লোকেরা তার নাম দেবে নির্বুদ্ধিতা, একথা আমরা ভাল করেই জানি। কিন্তু তুমি সাংবাদিক, তোমার বিবেকবোধ আছে, তোমার আছে সামাজিক কর্তব্য। তুমিও একে নির্বুদ্ধিতা বলে উড়িয়ে দেবে? পৃথিবী যদি গুঁড়িয়ে যায়, তুমি পারবে উদাসীনভাবে সেই গুঁড়িয়ে-যাওয়া পৃথিবীর কথা বর্ণনা করতে? আগুন লাগলে সে-আগুন নেবাতে ছুটে আসবে না? না, তখন বসে বসে তোমার সংবাদপত্রের জন্য লিখবে সেই অগ্নিকাণ্ডের উপর প্রবন্ধ? তোমাকে কাজ করতে হবে : তোমার বিবেক চিৎকার ক'রে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত সে-কথা তোমাকে বলছে। তুমি কমিউনিস্ট না হও ক্ষতি নেই, তোমার সাংবাদিক হওয়ারও প্রয়োজন নেই। তুমি একজন সভ্য মানুষ তো বটে? আমাদের পাশে এসে দাঁড়ানোর পক্ষে সেই তো যথেষ্ট। তোমাকে লড়াই করতে হবে বর্বতার বিরুদ্ধে, হত্যার উৎস বর্ণনা তোমাকে বন্ধ করতে হবে, রুখতে হবে এই চরমতম অন্যায়। হয় এখানে, নয় তো ওখানে, তোমাকে যোগ দিতে হবে—মাঝামাঝি পথ তো নেই কমরেড!' ক্ষণকাল নীরব থেকে আবার বলল :

'তবু আমাদের দাবি প্রতি সভ্য মানুষের কাছে। ছুটে এসে তাদের দাঁড়াতে হবে আমাদেরই পাশে, নইলে যে সভ্যতা যাবে চূরমার হয়ে, যাবে ওদের ভারী বুটের চাপে গুঁড়িয়ে। এ ছাড়া আজ পৃথিবীর অন্য পথ নেই।'

তখনও বুঝতে পারিনি তার কথার মর্ম। তারপর বন্দীশিবিরের জীবনে আমি প্রথম বুঝলাম, সে-কথার কতখানি মূল্য, উপলব্ধি করলাম তার মর্ম-রহস্য। আমি দেখেছি, নাৎসীরা পুড়িয়ে ফেলেছে সাহিত্য, বুটের লাথি মেরে নারীদের করছে অপমান, শিশুদের করছে নিপীড়ন···

(আর জার্মান শাসনতন্ত্র সব জেনেও তা অস্বীকার করেছে।)

আমি দেখেছি নব জার্মান নীতিবোধের অভ্যুদয়। চরম দুর্নীতির উপর সৃষ্টি হয়েছে তার ভিত্তি···

(অন্য জাতিরা সব জেনেও তারই সঙ্গে পাতিয়েছে মৈত্রী।)

সব দেখে-শুনে সেদিন তাই মনে হয়েছিল, জার্মানিকে রক্ত আর অশ্রুর সাগরে ডুবে শুদ্ধ হতে হবে, তারপর আসবে হয়তো তার নব জাগরণ।

অটোকে আমি সেদিন চিনলাম। অটো, আমার বন্ধু অটো! শত নির্যাতনেও যে পরাজয় স্বীকার করল না। অটো, আমার মানস-সৃষ্টি নয়, রক্তে মাংসে গড়া এক আত্মা। সে কাজ করল, সইল নির্যাতন, প্রাণ দিল দেশের জন্য। অটো ঠিকই করেছিল।

কিন্তু আমি তখন বুঝতে পারি নি তার কথা। তখনও যে দুঃখের আঁচ লাগে নি আমার গায়ে!

তখনও বুঝতে পারি নি, মানুষের এমন কর্তব্য আছে, রাজনীতির ঘূর্ণি যেখানে পৌঁছতে পারে না। আর সে-কথা আমি আর জার্মানীর লাখ লাখ লোক বুঝতে পারে নি বলেই বর্বরতা সেদিন জয়ী হলো। এখন আমি বুঝতে পেরেছি। আর বুঝতে পেরেই আজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি, যেসব জাতি সেদিন নাৎসী শাসনতন্ত্রের সঙ্গে মিত্রতা করেছিল, আর সেই মিত্রতায় জার্মানীর ঘটেছিল সর্বনাশ, তাদের যেন রক্ত আর অশ্রুর ভিতর দিয়ে সভ্যতার এই শত্রুকে চিনতে না হয়! যেন নিরপেক্ষতা আর মিত্রতার এমনি ক'রেই দাম চুকিয়ে দিতে না হয়।···

অটো এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: 'এস, অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক। পলার ভাইয়ের সঙ্গে তুমি কথা বলছিলে শুনছিলাম। তোমার জেরায় ও হকচকিয়ে গেল। সত্যিই পলা অনেক কিছু জানে বলেই তো ওকে ভয় বেশি। ওর সরলতার সুযোগ ওরা নিতে পারে।'

'কিন্তু পলা তো ওর ভাইরে সঙ্গে কথা বলে না।'

'আবার কথা বলতে শুরু করেছে। না, না, বাধা দিও না, আমাকে বলতে দাও। সে আমার ক্ষতি করবে বলে ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করে নি। পলাকে আমি চিনি। সে চাইছে আমাকে বাঁচাতে, কিন্তু একদিন এই ইচ্ছাই আমাকে ধরিয়ে দিতে পারে, একথা একবারও সে ভেবে দেখে নি।'

অটো থামল, একটু পরে আবার বলতে লাগল: 'আমি ওকে বাধা দিই নি কেন জানো? পলা আমার স্ত্রী, আমি ওকে ভালোবাসি, ও আমার সন্তানের মা। ওর মনে আঘাত দিতে আমি চাই না, আমি পারি না, কিন্তু—'

'অটো শোন,' আমি বললাম: 'একটা উপায় আছে। তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাও। না, না তোমাকে হামবুর্গ ছেড়ে যেতে বলছি না। তুমি শহর-তলিতে কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকো। ক'দিন পলার সঙ্গে দেখা ক'রো না। নিজের নামধাম বদলে ফেল, একটি নতুন স্ত্রী জোগাড় ক'রে নিতে পারলে

আরো ভাল হয়। আমি পলাকে বুঝিয়ে বলার ভার নিচ্ছি। তারপর ওকে আইমসবুত্তেল, কি কোন পাড়ায় উঠে যেতে বলব, তখন তুমি রোজ গোপনে এসে ওদের সঙ্গে দেখা ক'রে যেতে পারবে।'

'পলাকে তুমি বুঝিয়ে বলবে ?'

'নিশ্চয়ই !'

একমুহূর্তের নিস্তব্ধতা। 'চলে যাব,—চলে যাব !' আমি কুমেলের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে শুনলাম অটো বিড়বিড় ক'রে বলছে।

যেন শুনিনি, এমনি ভান করেই বললাম : 'আচ্ছা, ওসব পারিবারিক কথা এখন থাক। বল তো ইউনিয়নগুলোর এখন কি হাল ?'

'কিন্তু ওসব কথা তো তুমি শুনতে চাও না।'

'বাজে কথা ছাড় ! সত্যিই আমি তোমার কাছে সব কিছু জানতে চাই।'

'শুনবে ?' অটো একবার আমার মুখের দিকে তাকাল, তারপর বলতে লাগল : 'সমস্ত ইউনিয়নগুলোকে ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্ট দলের আওতায় না আনতে পারলে হিটলারের শাসনতন্ত্র টিকবে না। কারখানার মজুরদল বেহাত হ'লে কি ব্যাপার ঘটবে সে তো জানোই। ধর্মঘটের বন্যা বয়ে যাবে দেশে। সে-বন্যা থামায় কার সাধ্য ! তাই হিটলার চাইছে ইউনিয়নগুলোকে ধ্বংস ক'রে দিতে।'

'কিন্তু ধ্বংস ক'রে দিতে চাইলেই তো আর হলো না।' আমি বাধা দিলাম : 'কি ক'রে ধ্বংস করবে ?'

'একথা তুমি জিজ্ঞেস করতে পার। আমিও অবশ্য তোমাকে এ বিষয়ে সঠিক কিছু এখুনি বলতে পারব না। তবে ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনার কথা বলতে পারি। এখানে দুটো পথ আছে ভিমরুলের চাকে ঢিল মারতে হিটলার প্রথমে যাবে না। সে ইউনিয়ন না ভেঙে দিয়ে যেমন ছিল ঠিক তেমনটি রাখতেও পারে। কিন্তু নাৎসী-শাসনতন্ত্রের সঙ্গে খাপ খেয়ে চললে তবেই তাদের অস্তিত্ব থাকবে, যেমনটি আছে তেমনি রেখে দিলে হিটলারের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয় পথ হচ্ছে, ইউনিয়নের পুরোনো নেতাদের বদলে নতুন নাৎসী নেতা নিয়োগ, বা পুরোনো নেতাদের বশীভূত ক'রে ইউনিয়ন চালানো। এ ছাড়া আর পথ নেই, এভাবেই আমি ভেবেছি।'

আমি মাথা নাড়লাম।

'তাহ'লে এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হিটলার কোন্ পথ বেছে নেবে ? সোজাসুজিভাবে

দেখলে হিটলার হাঙ্গামার ভিতর যেতে চাইবে না। সংঘর্ষ থেকে এখন বন্ধুত্ব তার বেশি প্রয়োজন। বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে তোলার চাইতে পোষ মানানোর দিকেই তার নজর, তাই সে ইউনিয়নগুলোকে ধ্বংস করবে না ; পুরোনো নেতারাও নিজেদের পদেই অধিষ্ঠিত থাকবেন। কিন্তু নেতাদের সে নুইয়ে দেবে তার পায়ের তলায়, তাঁদের স্বতন্ত্রতা থাকবে না, তাঁরা হবেন হিটলারের তোতাপাখী। হিটলারের হাতে তাঁদের যেতে হবে ; তার তোষামোদ করতে হবে।'

'তা তো ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।'

'হিটলার ইউনিয়নের নেতাদের ডেকে পাঠিয়েছে। তাঁরাও সাদরে সে-নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।'

'তাহলে, ঠিক খসড়া-মতোই সব কিছু চলছে ?'

'না, না, তা মোটেও নয়।'

জার্মানীতে কোনো শ্রমিক-সংগঠন বেঁচে থাকবে, হিটলার একথা কল্পনায়ও আনতে পারে না। সে জানে নাৎসীদলকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে শ্রমিক-সংগঠনের উপর হানতে হবে চরম আঘাত। সবে তো শুরু। তারপর এইসব পুরোনো নেতাদের কি অবস্থা হয় দেখো ! হিটলার তাঁদের হুকুমের চাকর বানিয়েই ক্ষান্ত হবে না, সে তাঁদের মধ্যে মতভেদের বীজ বুনে দেবে। তখন সেই সব নেতারা হিটলারের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠবার জন্য শুরু করবে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ। নিজেদের দল থেকেই তাঁরা বিপ্লবী আর সমাজতন্ত্রীদের ধরে ধরে চালান দেবেন বন্দীশিবিরে। হিটলার তো সমাজতন্ত্রবাদ বা বিপ্লবের নাম শুনলেই ক্ষেপে ওঠে। এসব যখন করা সাঙ্গ হবে, তখন আসবে চরম পরিণতি—এই হিটলারী নীতির শুভ সমাপ্তি। অতঃপর শুভ সংবাদ বেরুবে কাগজে—পঙ্গু ট্রেড ইউনিয়নের যবনিকা পতন ! বিশ্বাসঘাতক নেতার দল তাই বলে রেহাই পাবেন না। জাতীয় ক্রোধবহ্নিতে তাঁরাই হবেন প্রথম আহুতি। আজ যদিও ভবিষ্যদ্বাণীর মত শোনাচ্ছে, কিন্তু দেখবে কয়েক মাসের মধ্যেই এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলবে।'

আমি বললাম : 'এ তো আদিম নীতি। আজকের এই সভ্য পৃথিবীতে কি হিটলারের এই চাল খাটবে ? এখনও কূট রাজনীতিজ্ঞরা বেঁচে আছেন।'

'কূট রাজনীতিজ্ঞ !' অটো হাসল। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই কূট রাজ-নীতিজ্ঞদের আবির্ভাব না হলেই যে আমাদের ভাল ছিল। যারা রাজনীতি

ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করে, তারা সহজভাবে কোন কিছু দেখতে পায় না। তারা সহজ সরল পন্থার মধ্যে জটিলতা খুঁজে বেড়ায়। আজ জার্মানীতে এই কূট রাজনীতিজ্ঞের দল ছিল বলেই নাৎসীরা জিতেছে। হ্বাইমার সাধারণতন্ত্রের ধ্বংসের জন্যও তারাই দায়ী। তাই সময় সময় কি মনে হয় জানো, প্রেমের মত রাজনীতি ক্ষেত্রেও আনাড়ির দলই ভাল আসর জমাতে পারে। যেমন নাৎসীরা জমাল। এখন দেখা যাক, আমাদের ট্রেড ইউনিয়নের কর্তারা কি করেন? তাঁরা তো এখন জাতি জাতি ক'রে লাফাচ্ছেন। কিন্তু হিটলার যখন বলবে, তোমরা এবার বিদায় হও, তখন তাঁদের মুখে কি বুলি ফোটে দেখব।'

'আমি তাঁদের কারো সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'এই তো ট্রেড ইউনিয়নের সর্বময় কর্তা লেইপার্ট গোপনে হামবুর্গে আসছেন। এখানে এসে তিনি উঠবেন এর্‌হেনটেইটের বাড়িতে। সে এখন এখানকার কর্তা। তুমি তার সঙ্গে দেখা করো। কিন্তু লোকটা পাকা শয়তান। সে প্রথমে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে না, দেখা করলেও বাজে কথা ছাড়া অন্য কিছুই শুনতে পাবে না। সে শুধু রাজনীতিক কৌশলের দোহাই ছাড়বে।'

অটো চুপ করল। আমিও চুপচাপ। বাইরে থেকে ভেসে আসছে স্ত্রীলোকের চিৎকার। চিৎকার থেমে গেল। কিন্তু এখনো তার প্রতিধ্বনির রেশ বাজছে। কর্কশ, ভীষণ ত্রাসের চিৎকার। কার শান্তির নীড় ভাঙল নাৎসীরা।

'আমি দেখা ক'রে তাঁর কি মতলব জেনে নেব। হয়তো ব্যাপারটা সোজা হবে না। তবু দেখা যাক।'

অটো উঠে বলল: 'চলো, এবার লোকজন আসতে শুরু করবে।'

বিল চুকিয়ে দিয়ে অটোর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। পথে চলতে চলতে বললাম: 'কবে বাড়ি ছাড়ছ?'

অটো নিরুত্তর।

আমরা এবার গ্রাসে-ব্লেইক আর হোয়ে-ব্লেইক যেখানে মিশেছে সেখানে এসে পড়লাম। অটো আমাকে আঙুল দিয়ে মোড়ের একটা বাড়ি দেখিয়ে বলল: 'ওখানে সেদিন নাৎসীরা আমাদের একজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। সে-বেচারা ওদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য তেতলা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এমনি কতো যে হচ্ছে।' বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আবার নিঃশব্দে চলতে শুরু করলাম।

এবার আমরা এসে পৌঁছলাম টিয়েট্স্ স্টোরের রেস্তর‍াঁয়। ডিউকের একখানা চিঠি বিকেলে পেয়েছিলাম, পড়া হয়নি। চিঠিখানা খুলে পড়তে শুরু করলাম। অটো আমাকে বাধা দিয়ে বললে : 'চিঠি পরে পড়বে'খন, একটা কথা শোনো—'

'লেইপার্টের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপার তো ?'

'না হে, অন্য ব্যাপার। তোমার সাংবাদিকতার লাইনেই পড়ে। ঐ যে মারিচেন হলে ঢুকছে। আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

এমনি সময় একজন পরিচারিকা এসে আমাদের টেবিলের কাছে দাঁড়াল। সে অটোর চেয়ারের উপর ঝুঁকে পড়ে মৃদুস্বরে বলল : 'কফি যে জুড়িয়ে হিম হয়ে গেল !'

মনে হলো মেয়েটি অটোর চেনা।

অটো ফিসফিস ক'রে উত্তর দিল : 'কাল আমি ঠিক দুপুরে আসব। আজ এক বান্ধবীর জন্য অপেক্ষা করছি কি না। রাগ করো না লক্ষ্মীটি, সে আমার কেউ নয়, আমার এই বন্ধুটির—তা হ'লে কথা রইল, কি বল ?'

'আড়াইটার আগে নয় কিন্তু।' মেয়েটি মৃদুস্বরে বলে চলে গেল।

অটো হাসতে লাগল। মেয়েরা ওকে দেখে মুগ্ধ হলে খুব খুশি হয় অটো। সে বলল : 'হেবেলশায়ের কারখানায় সেবার ভারি মজা হয়েছিল।'

'কি ব্যাপার ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'মারিচেন এখুনি এসে পড়বে, তিনজনে মিলে তখন ঠিক করা যাবে।'

'কি ঠিক করবে ?'

'সে হবে'খন। এখন হেবেলশায়ের কারখানার গল্পটা বলি শোন। পার্টি যখন বে-আইনী ছিল তখনকার কথা। সেল কাকে বলে নিশ্চয়ই জানো। যেসব প্রতিষ্ঠান কমিউনিস্ট নয়, সেখানে কাজ করার জন্য আমরা যে পার্টি সংগঠন গড়ে তুলি তাকে বলে সেল। কারখানায়, ট্রেড ইউনিয়নে, এমন কি নাৎসী-দলের মধ্যেও আমাদের আদর্শে কাজ করার জন্যই এগুলোর সৃষ্টি। এখন আমাদের এলাকায় সেলগুলোর কাজ ভালই চলছিল, কিন্তু হেবেলশায়ের ধোবিখানায় আমরা তখনও ঢুকতে পারিনি। ওখানে চারশ' মেয়ে কাজ করে। কিন্তু বড্ড কড়াকড়ি। ফটকে দারোয়ান, তাছাড়া পুলিশও মোতায়েন। আমরা জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলাম। শেষে একদিন পাশের বাড়ি থেকে ধোবিখানার ছাদে উঠে সারা বাড়িতে ইস্তাহার ছড়িয়ে এলাম। কিন্তু পুলিশ

টের পেয়ে পরদিন কারখানা খোলবার আগেই সব ঝেঁটিয়ে সাফ ক'রে ফেলল। আমরা কিন্তু এতে হতাশ হলাম না। আমাদের উৎসাহ বরং বেড়েই গেল। তারপর একদিন সব ঠিক হয়ে গেল। একেবারে সেই পুরোনো আদমের পথ ধরলাম। আমরা জন তিনেক ফিট বাবুটি সেজে কারখানার সামনে ঘোরা-ফেরা করতে লাগলাম। দু'একটি ক'রে আট দশটি মেয়ের সঙ্গে চেনাও হলো। কাজ আর স্ফূর্তি দু'টোই মিলে গেল। প্রথমে রাজনীতির কথা তুললামই না। তারপর একদিন বললাম সব খুলে। জন দু'য়েক মেয়ে রেগে-মেগে চলে গেল। আর সবাই শুনল চুপ ক'রে : বইও নিয়ে গেল। চারজন তো রীতিমত মার্কসবাদ পড়তে শুরু ক'রে দিলে। মজুর আন্দোলনের ইতিহাস আর দ্বান্দ্বিক জড়বাদ—দুই-ই রপ্ত হয়ে গেল। এবার সেলও গড়ে উঠল ধোবি-খানায়। আর আমাদের পায় কে!' অটো হাসল।

এবার মারিচেন কাছে এল। সে আমাদের পাশে বসে পড়ে এক নিশ্বাসে বলে গেল : 'সব কিছু আমরা ঠিক ক'রে ফেলেছি, এবার পার্টির পুরোনো সভ্যদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে পারব আশা করি। এতদিন পুরোনো সভ্যদের আমরা এই জন্যই সরিয়ে রেখেছিলাম যে, ওঁদের পিছনে নাৎসী গুপ্তচর লেগে সব ভণ্ডুল ক'রে দেবে। তাতে অবশ্য কিছুটা খারাপ ফলও-ফলেছে। কেউ কেউ পার্টির এই গোপন আন্দোলনের কথা জানতে না পেরে হতাশ হয়ে নাৎসীদের দলে ভিড়ে গেছে। কিন্তু তারা সংখ্যায় খুব কম। এখনও বহু সভ্য আছে, যারা পার্টির মুখ চেয়ে আছে। তারা জানে, এত বড় ওলট-পালটের ভিতরেও আমরা ঠিক টিঁকে থাকবই। তারা অপেক্ষা করছে আমাদের ইঙ্গিতের জন্য। এক দল যাদের, কেউ বা পার্টির সাধারণ সভ্য ছিল, কেউ বা ছিল দরদী, তারা নিজেদের পথ বেছে নিয়েছে। তার প্রমাণও আমরা পেয়েছি। এই তো রাইখ ব্যাঙ্কে কাজ করত একটি ছোকরা, সে রাতে নাৎসী-বিরোধী ইস্তাহার লিখছিল। গুছিয়ে লিখতে শেখে নি, কিন্তু ভিতরে জিনিস ছিল। সে ব্যাঙ্কের কেরানীদের ভিতর বেশ একটা সাড়া এনে দিয়েছিল। ধরাও অবশ্য পড়েছে। কিন্তু ওকে দিয়ে আমাদের কিছুটা কাজ তো হলো।'

আমি মারিচেনকে বাধা দিলাম : 'আপনি এই কথাই বলতে চাইছেন তো, যে পার্টির অস্তিত্ব আছে এবং এই কথা সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হোক? আপনি জার্মানীকে জানিয়ে দিতে চান, আমরা আছি। ধৈর্য ধর, অপেক্ষা কর—এই তো?'

'হাঁ, ঠিক, তাই-ই আমি চাই। কিন্তু আপনারা কি করতে চান বলুন?'

'একটু মাথা ঘামালেই উপায় একটা বেরিয়ে আসবে।'

'হাঁ, হাঁ,' অটো আমার দিকে তাকিয়ে বলল: 'তুমিই আমাদের সাহায্য করতে পারবে।'

'না, না, আমাকে ভুল বুঝো না,' আমি বললাম: 'কোন পার্টিকেই আমি সাহায্য করতে রাজী নই। আমি শুধু জানতে চাই, যে-খেলায় তোমরা নেমেছ তার নিয়ম-কানুনগুলো কি?'

অটো বলল: 'নিশ্চয়ই, নিয়ম-কানুনগুলো তোমাকে জানতে হবে বই কি।'

বললাম: 'অবশ্য, ওগুলো সামান্য একটু কষ্ট করলেই জেনে নিতে পারা যায়। প্রেমের ব্যাপারে যেমন কাঁচা সখের প্রেমিকদেরই জয়জয়কার, রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাই। এখানে ঝুনোর চেয়ে আনাড়ীদেরই হাত খোলে বেশি।'

অটো আমার কথা শুনে হাসল।

আমি বলতে শুরু করলাম: 'তোমরা চাইছ প্রচার। বেতারে প্রচারের পথ বন্ধ, ফন্দি-ফিকির ক'রে যদি বা একবার প্রচার করো তো, তারপরে তিন সপ্তাহের মধ্যে আর ওদিকে ঘেঁষতে পাবে না। তারপর সংবাদপত্র, তাও বন্ধ হয়ে গেছে। ইস্তাহার বিলি করেও সুবিধে হবে না, কারণ তোমাদের লোকজন বড় কম। হাঁ, একটা উপায় আছে বটে। দেয়ালে দেয়ালে খড়ি দিয়ে তোমাদের বক্তব্য লিখে দেয়া আর গীর্জার চূড়ায় লাল নিশান ওড়ানো—'

'তারও সম্ভাবনা কম। আজকের দিনে এক টিউব রঙ বা এক টুকরো লাল কাপড় কেনা যে কত কষ্ট, সে-কথা একবার ভেবে দেখেছ কি? নাৎসীদের কড়া নজর রয়েছে সব কিছুর উপর। প্রতি দোকানের মেয়ের দল গত তিন দিন হলো হিটলারী দলে যোগ দিয়েছে, যাতে মালিকরা বরখাস্ত করতে না পারে। তারা এখন 'দেশপ্রেম' দেখাবার সামান্য সুযোগটুকুও ছাড়ছে না। হয়তো তাদের সত্যিকারের ইচ্ছে নেই, তবু শুধু চাকরী বজায় রাখার জন্য তারা তোমাকে ধরিয়ে দেবে। তারা নাৎসীদের ভয়ে কাঁপছে, কাঁপছে সমস্ত জার্মানী। তুমি যদি ভেবে থাক, শুধু নিপীড়ন করার নিষ্ঠুর আনন্দেই নাৎসীরা এইসব বন্দীশিবির বসিয়েছে, শুধু খুন করছে—তা'হলে আমি বলব, তুমি ভুল করছ। তারা জানে, জাতিকে ভয় পাইয়ে না দিতে পারলে শাসন-ব্যবস্থা টিঁকবে না। আর হয়েছেও তাই, জার্মানী আজ ভয়ে অস্থির।'

'পারলেন না তো উপায় বাতলাতে?' মারিচেন উঠে দাঁড়াল।

আমি ইতস্তত ক'রে বললাম : 'একটা উপায় আছে কিন্তু আপনারা হয়তো আমলই দেবেন না।'

'বল!' অটো বলে উঠল।

'হাঁ, হাঁ, বলে ফেলুন,' মারিচেন আবার বসে পড়ল।

'তোমাদের নিজেদের যখন কোন সংবাদপত্র নেই, নাৎসীদের সংবাদপত্রগুলো তোমাদের প্রচারের বাহন হিসেবে ব্যবহার করছ না কেন?'

'বাঃ, চমৎকার যুক্তি দিয়েছেন!' মারিচেন ঠাট্টা ক'রে বলল : 'আপনি তো এই চান যে, আমরা গিয়ে সোজা হামবুর্গের টাগব্লটের কমরেড ইয়াকভকে বলি, কমরেড, আপনার কাগজে সাম্যবাদের একটা ছোটখাটো ফতোয়া ছেপে দিন!'

অটো টেবিল চাপড়ে মারিচেনকে থামিয়ে দিল : 'চুপ করো মারিচেন! শোন, ও কি বলতে চায়, বাজে বকো না। বলো তুমি!'

আমি আমার ফন্দিটা ওদের কাছে খুলে বললাম। আমি বুঝিয়ে দিলাম যে, পার্টির এখন কর্তব্য হচ্ছে বাইরের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং প্রতিদিন কিছু-না-কিছু খবর নাৎসীদের কাগজে পাঠানো। বললাম, আমিই প্রথম এ খেলায় নামব। প্রথম চিঠি নাৎসী কাগজে এই মর্মে পাঠাব যে, গত শুক্রবার আমার একজন সাংবাদিক বন্ধু আলটোনার মিউনিসিপাল থিয়েটারে ঢুকতে পায় নি। থিয়েটারের কর্তাদের কারণ জিজ্ঞেস করলে তাঁরা উত্তর দিয়েছেন, থিয়েটারে ইহুদিদের প্রবেশ নিষেধ। থিয়েটার আমার কাছে ফ্রি পাস পাঠায়। আমি সেই পাশ ফেরত দিয়ে এই মর্মে লিখে জানাব যে, সাংবাদিকের এই অপমানের প্রতিকার আমি দাবি করি বলেই থিয়েটারে যেতে আমি পারি না।'

'কিন্তু ব্যাপারটা যে আপনার পক্ষেই সাংঘাতিক হয়ে উঠবে।' মারিচেন বলল।

'চমৎকার!' অটো চিৎকার ক'রে উঠল : 'তোমার চিঠি ছেপে বেরুলেই ওরা তোমাকে চেপে ধরবে। কিন্তু তুমি সাফ অস্বীকার করবে : ও চিঠির এক লাইনও তুমি লেখ নি। কেননা, তোমার হয়ে আমিই চিঠি লিখে দেব'খন। তুমি দাবি করবে, কোন্ প্রমাণের বলে তারা তোমার নাম দিয়ে চিঠি ছাপল। সঙ্গে সঙ্গে নাৎসী কাগজের পাতায় আমাদের আরও কিছু খবর বেরুবে।'

'হাঁ হাঁ, এমনি ক'রে রোজই কিছু না কিছু খবর বার করব। তা হলেই সমস্ত জার্মানী জানতে পারবে, পার্টি এখনও বেঁচে আছে; তারা কিছু করছে।'

মারিচেন আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল: 'এইভাবে সত্যি আমাদের প্রচারের কাজ ভাল চলবে। আমরা এই পরিকল্পনার জন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।'

আমি তাকে বাধা দিলাম: 'আপনাদের কৃতজ্ঞতা দেখানো এখন মুলতবী রাখুন।'

'ঠিক, ঠিক।' মারিচেন আমার হাত ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এবার আমি পকেট থেকে বার করলাম ডিউকের চিঠি। অটো চেয়ার টেনে নিয়ে এমনভাবে বসল যাতে সহজেই আমরা দু'জনে চিঠিটা পড়তে পারি। চিঠিটা হচ্ছে এই :—

"প্রিয় আমার,

আগামী শনিবার আমাদের সৈন্যদলের—তোমাকে তো দলের নাম বলেছি, রিথটার বাহিনী—বসন্ত উৎসব হবে ভাক্টমান্-এ। আমি তোমাকে ওখানে দেখতে চাই। যেও, আমি যদি বুকিং অফিসে না থাকি, আমার নাম ক'রে একটা কার্ড যোগাড় ক'রে নিও। পার যদি তো নাচতে পারে এমনি আরো কয়েকটি মেয়ে নিয়ে এসো। যদি নিজে আসতে না পার, তোমার মত আর কাউকে পাঠিয়ো। কোন ছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে এসো না। এখানে সৈন্যদলের জরুরী বৈঠক হবে কিনা, গোলমাল করতে পারে। এসো, বেশ সেজেগুজে এসো কিন্তু। অপেক্ষায় রইলাম।

তোমারই
উইলি।"

অটো চিঠিখানা পকেটে রেখে বললে: 'লোকটির নাম কি হে?'

'কেন?'

'চিঠির অর্থ বুঝতে পার নি? যে লোকটি লিখেছে সে কিন্তু কাজের লোক। কয়েকজন লোককে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যেতে বলেছে। কে আসবে না-আসবে তার হদিশ জানবার জন্য বুকিং অফিসের নাম করেছে। চালাক চিঠি পড়ে কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পাবে না।'

আমি আটোকে ডিউকের পরিচয় দিলাম। অটো ভেবে বলল: 'তুমিই ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখ, আমার সঙ্গে এখন পরিচয় করিয়ে দেবার দরকার নেই। পার্টি জেল-ফের্তাদের সঙ্গে এখন কোন সম্পর্ক রাখতে রাজী নয়। কিন্তু তুমি

ওর কাছ থেকে কোন খবর পেলেই আমাকে জানাবে। তুমি যদি বলো তো, আমিও ডাক্‌টমান্‌-এ সেদিন যাব। কয়েকটি মেয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে'খন।'

'বেশ তো,' আমি বললাম: 'শনিবার নটার সময় টালস্ট্রাস আর স্মাক-স্ট্রাস যেখানে এসে মিশেছে, ওখানে দেখা করবে। আজকে বিকেলে আমি যাচ্ছি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। তোমাকে এর মধ্যে অন্যত্র সরে পড়বার বন্দোবস্ত করতে হবে।'

'এরই মধ্যে ?' অটো হাসল।

'হাঁ।'

॥ সাত ॥

শুক্রবার সাতটার সময় ভাণ্ডারলিকের সঙ্গে ডাম্মাটর স্টেশনে দেখা করলাম। সে আমাকে দেখেই ছুটে এসে বলল: 'তুমি এসেছো! আজই প্রথম আমরা আমাদের সমিতির বৈঠকে পার্টির সভ্য তালিকাভুক্ত নয় এমন লোককে ঢুকতে দিচ্ছি। আশা করি তুমি—'

'তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না,' ওর হাতে একটু মৃদু চাপ দিয়ে বললাম।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। শান্ত, সুন্দর সন্ধ্যা। তরুণ তরুণীরা পথে চলেছে জোড়ায় জোড়ায়। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে হাসি। সত্যিই সুন্দর সন্ধ্যা। আমরা এসে পৌঁছলাম সোশ্যালিস্ট পার্টির ছাপাখানার সামনে। ছাপাখানার এই দিক্‌টায় ঢুকবার পথ গ্রোসথিয়েটারস্ট্রাস দিয়ে। সম্পাদকীয় দপ্তরে ঢুকতে হ'লে ওপথ দিয়ে গেলে চলবে না; ফেকলাগুস্ট্রাস দিয়ে ঢুকতে হবে। আমি আর ভাণ্ডারলিক ঘণ্টা দু'য়েক বাড়িটার কাছাকাছি ঘুরে বেড়ালাম। নটা বাজল এবার। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে নামল বৃষ্টি।

আমরা গ্রোসথিয়েটারস্ট্রাসের ফটকে এসে দাঁড়ালাম। ভাণ্ডারলিক চাবি দিয়ে দরজা খুলে ফেলল। আমরা ঢুকতেই আবার সে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। ভিতরে অন্ধকার, একটি আলোও কোথাও জ্বলছে না। সে আমার হাত ধরে নিয়ে চলল। অন্ধকারের ভিতরে হঠাৎ একটা স্বর শুনতে পেলাম। সঙ্কেত?

ভাণ্ডারলিক সঙ্কেত বলে আমাকে নিয়ে আবার চলতে শুরু করল। মনে হলো, আমরা ঘুরতে ঘুরতে চলেছি। খানিকক্ষণ পরে একটা ঘরে এসে পৌছলাম। জোরালো শক্তির আলো জলছে সেখানে : পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে বিভিন্ন স্বর আর সিগারেটের ধোঁয়া। আমরা দরজা খুলে সেই ঘরেই গিয়ে হাজির হলাম। আট দশজন যুবক সেইখানে বসে আছে, ওদের প্রায় সবাইকে আমি চিনি। সোফায় দু'টি মেয়েকেও দেখা যাচ্ছে। ভাণ্ডারলিক সাংবাদিক বলে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল।

তরুণ সোশ্যালিস্টরা এবার নিজেদের কথাবার্তা শুরু করল। তারা তাদের গুপ্ত সম্মেলনীর খসড়া সম্বন্ধে কথা কইতে লাগল। আমি একটু আশ্চর্য হলাম বই কি! ওদের কি একটা কথায় আমি মন্তব্য করলাম: 'আমার মনে হয়, সোশ্যালিস্টদের সভ্য সংখ্যা এখন এই জনা কয়েকেই এসে ঠেকেছে।'

'হাঁ, ঠিকই আপনি অনুমান করেছেন,' একজন বললে: 'আমাদের দলের অধিকাংশই সরে পড়েছে। তা ছাড়া কয়েকজন সেদিন ধরাও পড়েছে। আপনি আগে সাবধান ক'রে না দিলে আমরা ক'জনও কাইসারের ষড়যন্ত্রে ধরা পড়তাম, হয়তো আজ আর আমাদের অস্তিত্বই থাকত না।'

'কেন, ব্যাপার কি?'

'জানেন না বুঝি? যারা ধরা পড়েছে, তাদের মধ্যে চার জন আর কোন দিন চলার শক্তি ফিরে পাবে না। আর স্কুল মাষ্টার এহ্‌রেনকে তো ওরা মেরেই ফেলেছে। তাকে অলস্টারে ডুবিয়ে মেরেছে। তারপর উইলি ডিয়েকর্সন। তার মার কাছে খবর গেছে, হৃদরোগে তার মৃত্যু হয়েছে! আমরা ওদের এই মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চাই। ডিয়েকর্সনের কবর খুঁড়ে তার রক্তাক্ত দেহের ফটো প্রথম পাতায় দিয়ে আমরা ইস্তাহার ছাপব! তারা উইলির কাছ থেকে আমাদের অস্ত্রশস্ত্রের খোঁজ জানতে চেয়েছিল। কিন্তু উইলির মুখ থেকে একটি কথাও বার করতে পারে নি।'

ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। ওরা উত্তেজিত হয় নি, ওদের মুখ প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হয়ে উঠেছে। সবাই চায় প্রতিশোধ।

'আমরা সব কিছু হারিয়েছি', একজন সভ্য ব'লে ওঠে: 'এবার ঠাণ্ডা মাথায় ভাববার সময় এসেছে। আজ আমাদের একথা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, বুদ্ধিবৃত্তির যে দান, তার প্রতিটিকে শুধু সমাজতান্ত্রিক পরিস্থিতির উপরিতল বলে ধরে নেওয়টাই সত্য নয়। একথাও সত্য নয় যে,

সমাজতন্ত্রবাদ শুধু ইতিহাসের ধারার অবশ্যম্ভাবী ফল, ক্রমিক উন্নতির নিয়ম অনুসারে সে আপনা থেকেই আমাদের কাছে হাজির হবে, একথাও আজ আমাদের ভুলতে হবে। একথায় একফোঁটা সত্য নেই। আমরা এই স্বপ্নেই এতকাল বিভোর হয়েছিলাম, তাই কোন কাজ করি নি। কি হবে কিছু কাজ ক'রে, যখন আপনা থেকেই পৃথিবী একদিন সমাজতন্ত্রবাদী হবে? না, সে-ধারণা, সে-স্বপ্ন আমাদের ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। আমাদের সক্রিয় হতে হবে। সমাজতন্ত্রবাদ আনবার জন্য সংগ্রাম করতে হবে, নিষ্ক্রিয় বিলাস আর চলবে না। বিপ্লবের ভিতরে যে পার্টি কাজ করতে পারে, তারই সভ্য সংখ্যা বাড়ে। ঠিক এই জন্যই আজ নাৎসীরা জিতেছে। তাই আমার মনে হয়—ভিত্তিহীন ভাবধারা, ভাবধারাহীন ভিত্তি চাইতে অনেক ভাল। আমরা যুবক-সোশ্যালিস্টরা যদি জনগণের সমর্থন পেতে চাই—আমাদের ভাবধারাকে সুষ্ঠু রূপ দিতে হবে। আমাদের ভিত্তি হবে সমাজতান্ত্রিক, ভাবধারা হবে সমাজতান্ত্রিক। তাহ'লেই আমরা জিতব '

এবার নানা তর্ক উঠল। উত্তেজনার ঝড় বয়ে গেল। অবশেষে সবাই স্বীকার করল, বক্তার কথাই ঠিক। একটি কমিটি তৈরি হলো—যার কাজ হবে প্রতি যুব সোশ্যালিস্ট কর্মীর কাজের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। ওরা এই কর্মসূচী ঠিক করল :—(ক) পার্টির বর্তমান সভ্যদের উৎসাহিত করতে হবে যাতে তারা পার্টি না ছেড়ে দেয়, (খ) নাৎসীদের জাতির কাছে আবেদনের পাল্টা জবাব হিসেবে ওরা ইস্তাহার বিলি ও মাঝে মাঝে মিছিল প্রভৃতি বার করবে; ঝঞ্চাবাহিনীতেও প্রচার চালাবার ভার নেবে তারা, (গ) জার্মানীর সবগুলো বে-আইনী পার্টির সঙ্গে তারা যোগাযোগ রাখবে। তারপর সময় হলে ধর্মঘট, সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রভৃতি ব্যাপারে হাত দেবে।

আমার মনে হলো, এদের কর্মসূচীতে সত্যিকারের কাজের চেয়ে সুদূরপ্রসারী কল্পনাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে বেশি। এদের উচিত নিজেদের এই গুপ্ত-সমিতিকে প্রথমে গুপ্তচরের দৃষ্টি থেকে বাঁচানো। ভাণ্ডারলিককেও সে-কথা বললাম।

'কিন্তু কি উপায়ে?' ভাণ্ডারলিক প্রশ্ন করল।

আমি বললাম : 'তোমাদের বিশ্বাসী লোকদের নাৎসীদের ঝঞ্চাবাহিনীর গুপ্তচর বিভাগে ঢুকিয়ে দাও। তারা কিছুদিন মেলামেশার পর ওদের ভিতরে প্রচার চালাবে। তবে দেখতে হবে, মিথ্যে খবর তারা যেন না দেয়।'

আগের বক্তাটি বলল : 'আমরা অন্যান্য বে-আইনী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে একত্র হয়েও একাজ চালাতে পারি। এতে আমরা পুরোনো অভিজাত দলেরও সাহায্য পাব। তাদের টাকা আছে। তারাও নাৎসী শাসন মেনে নিতে রাজি নয়।'

'আমাদের বার্লিনের সঙ্ঘের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে,' ভাণ্ডারলিক বললে : 'সেখানে প্রায় হাজার হাজার সভ্য আছে, প্রায় অধিকাংশই কারখানার মজুর। এখন পর্যন্ত ওদের খবরাখবর আমরা জানতে পারি নি। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে।'

'তোমাদের বার্লিনের সঙ্ঘ কি সোশ্যালিস্ট লেবার পার্টির সঙ্গে কাজ করবে ?'

'বোধহয়।'

'তাহ'লে, আশা করি, আমি ওদের সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারব।'

ভাণ্ডারলিক বলল : 'তাহ'লে তো ভালই হয়। তাছাড়া তুমি যদি আমাদের দু'জন বিশ্বাসী কমরেডকে জেনারেল শ্লিচারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও তো খুব ভাল হয়।'

'ফন্ শ্লিচার—!' সবাই আশ্চর্য হয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাল।

'ফন্ শ্লিচার, এই নামটা শুনে আপনারা অবাক হচ্ছেন কেন ?' ভাণ্ডারলিক গম্ভীর স্বরে বললে : 'আমরা এখন পার্টির নীতি নিয়ে আশা করি বাকবিতণ্ডা করব না, আমাদের এখন উচিত ন্যাশনাল-সোশ্যালিজমের বিরুদ্ধে যে-কোন উপায়ে লড়াই করা। জাহাজডুবির সময় জাহাজের ক্যাপ্টেনের সাহায্য নিতে বাধা কি : তারপর বন্দরে গিয়ে যত ইচ্ছে ঝগড়া করতে হয় করুন না! আমাদের লোক-বল নেই, নেই অর্থ-বল, এছাড়া আমাদের উপায়ও নেই। বলুন, আপনারা কি করবেন ? আত্মোৎসর্গ করবেন, না জয়ী হবেন ?'

যখন আমরা বেরিয়ে এলাম, তখন ভোর হয়ে এসেছে।

আমি ওখান থেকে গেলাম হ্বিণ্টারউডে। ব্রুনোর সঙ্গে দেখা হলো। তাকে সোশ্যালিস্ট যুব-সঙ্ঘের সঙ্গে যোগাযোগ করার হদিশ দিলাম ; এবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার উদ্যোগ দেখা দিয়েছে, সে-কথাও বুঝিয়ে দিলাম, তারপর বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়লাম।

ভোর সাড়ে ন'টায় আমার সেক্রেটারী এসে হাজির। কাজ শুরু হলো।

সাড়ে এগারটার সময় এল নিকলের ছবিওয়ালা পোষ্টকার্ড। কোন নাম স্বাক্ষর নেই। সে লিখেছে, আজই সে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে ; তার সঙ্গে যাবে দু'টি তরুণী। একটি তার প্রিয়তমা, আর একটি তাঁরই সঙ্গিনী। আমি তার সঙ্গে যেতে না পারায় সে দুঃখিত। তবে সামনের রবিবার তার সঙ্গে যেন দেখা করি।

আমি সেক্রেটারীকে এই ভাবে উত্তর দিতে বললাম :

'প্রিয় হাইনরিক,

যদি তোমার তরুণী বন্ধুটি দেখতে চমৎকার হয় তো খুব জমবে। সামনে র'ববারে দশটার সময়, যেখানে তুমি আমার সেদিন দেখা পাও নি, সেই বাড়িটার সামনে থেকো।'

সেক্রেটারী আমার হাতে চিঠিখানা দিয়ে বললে : 'আমি হের ট্রালোউকে চিনি কি না। কাল দুপুরে আমার অনুপস্থিতিতে তিনি আমার ঘরে আমারই অপেক্ষায় খানিকক্ষণ বসতে চেয়েছিলেন। তিনি নাকি আমার পুরোনো বন্ধু। আমার সেক্রেটারী অবশ্য তাঁকে বসতে দেয়নি।

'কি তার নাম ? ট্রালোউ ? আমি তো ট্রালোউ নামে কাউকে চিনি না !'

সেক্রেটারী চেহারার বর্ণনা দিল। বুঝলাম, কোন নাৎসী গুপ্তচরের উদয় হয়েছিল। কিন্তু সেক্রেটারীর কাছে সে-কথা গোপন ক'রে বললাম : 'হাঁ, হাঁ, পুরোনো বন্ধু ; এইবার বুঝতে পেরেছি ! কিন্তু ওসব লিখিয়েদের কখনও ঘরে এনে বসাতে আছে ? ওরা সোনার ঘড়ি চুরি করে না বটে, কিন্তু লেখার মাল-মসলা চুরি করতে ওস্তাদ। আর তাতে ক্ষতিও হয় যথেষ্ট। তুমি বসতে না দিয়ে ঠিকই করেছ।'

সেক্রেটারী চলে গেলে আমি ঘরখানা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলাম ; প্রতিটি বই খুলে দেখলাম, প্রতিটি কাগজের টুকরো পরীক্ষা ক'রে দেখলাম। ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক দু'টি নিবন্ধ লেখার মাল-মসলা পুড়িয়ে ফেললাম। বইএর তাকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, না, রাজনীতির একখানা বইও সেখানে নেই।

কিন্তু তবু'ও কি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার জো আছে ! বাইরে বেরিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি আমারই বাড়ির সামনে পুলিশের গাড়ী এসে হাজির হয়েছে। তাড়াতাড়ি একটা ফোন ক'রে দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে এলাম ফ্ল্যাটের দরজায়। দু'জন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। তারা আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করল : 'আমি এখানে কি চাই !' তাদের বললাম : 'আমি এইখানেই থাকি।' ওরা হেসে উঠল ; তারপর বলল : 'ভিতরে গিয়ে দেখুন কি অবস্থা !'

শুনতে পেলাম, একজন আর-একজনকে বলছে : 'খবর বাজে নয় তা হলে। লোকটা নিজেই ফিরে এসেছে, দেখা যাক কি মালপত্তর বেরোয় ?'

বারান্দায় ফ্রাউ হেকমেসারের সঙ্গে দেখা। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে : 'শেষে আমার বাড়িতে এই কাণ্ড হলো! আজ তিরিশ বছর এখানে আছি, একদিনের জন্যও পুলিশ আসে নি—'

তার পাশ কাটিয়ে আমি ঘরে ঢুকে পড়লাম। ইস্ কি লণ্ডভণ্ডই না করেছে জিনিসপত্র! দেরাজের টানাগুলো সব খোলা, ডেস্কের কাগজপত্র মেঝেয় ছড়ানো। তাক থেকে বইগুলো নামিয়ে মলাট কেটে ফেলা হয়েছে। দেয়ালের ছবি ক'খানারও টুকরো ঘরের এখানে-ওখানে উড়ছে। তিনজন লোক তখনও ঘরে। একজন মেঝের কার্পেটের উপর উবু হয়ে শুয়ে চুরুট টানতে টানতে আমার চিঠিপত্রের ফাইলটা দেখছে, অন্য দু'জন চুপ ক'রে বসে আছে। আমাকে দেখেই মেঝেয়-শোয়া লোকটা মাথা তুলে তাকাল। কোট আর টুপিটা আমি জানালায় ঝুলিয়ে রেখে চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরালাম। মেঝেয়-শোয়া লোকটা খেঁকিয়ে উঠলো : 'ধূমপান এখানে নিষেধ।'

'আপনার চুরুটের ধোঁয়া তো আমার কাছে খারাপ লাগছে না। আপনি যত খুশি চুরুট টানুন না, কিন্তু দেখবেন কার্পেটের ওপর ছাই ঝাড়বেন না। ওটা আবার আমার সম্পত্তি নয়, আমার বাড়িউলীর সম্পত্তি। সে হয়তো ওই নিয়ে খেসারৎ-দাবির মামলা জুড়ে দেবে।' আমি লোকটার হাতের কাছে একটা ছাইদানি এগিয়ে দিলাম। ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে লোকটা বিড়বিড় করে কি বলল, শুনতে পেলাম না।

খানিকক্ষণ পরে লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে পোষাকের ধুলো ঝাড়তে লাগল।

'কি, কিছু পেলেন না কি ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'না, এখনও কিছু পাওয়া যায় নি,' লোকটা বললে : 'তবে রাজনীতির বইগুলো সব বাজেয়াপ্ত করা হলো। ওগুলো আমরা নিয়ে যাব। এই যে খানাতল্লাসের পরোয়ানা।'

ঘাড় নেড়ে বললাম : 'দেখলাম। কিন্তু শুধু কি জিনিসপত্র তছনছ করার জন্যই খানাতল্লাস করলেন ?'

'না, না, আপনার ঘরে সৌখীন বিলাস করতে আমরা আসি নি।' কঠিন স্বরে সে বলল : 'আপনার একখানা বই আমি পড়ছিলাম। না, না, এ সৌখীন বিলাস নয়! আপনি পরোয়ানাখানা দেখলেই বুঝতে পারবেন।'

'না, কোন দরকার নেই, আপনার কথা শুনেই বুঝতে পারছি।'

হঠাৎ সে চিৎকার ক'রে উঠল : 'দেখতেই হবে, আমি যখন বলছি, দেখতে আপনি বাধ্য।' সে আমার হাতে এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিল। দেখলাম, পরোয়ানার নীচে কাইসারের স্বাক্ষর।

এবার ওরা বিদায় নিল, যাওয়ার সময় লোকটা আমার সামনে এসে টুপি খুলে গম্ভীর স্বরে বলল : 'আজ আট বছর আমি নাৎসীদলে আছি।'

কথাটা সম্পূর্ণ প্রলাপের মতই মনে হলো। জিনিসপত্র যেমন ছিল তেমনি রেখে বেরুলাম অটোর খোঁজে। বাড়িতে তাকে পেলাম না, শেষে খুঁজতে খুঁজতে অফিসে এসে হাজির হলাম। ছোট্ট কুঠরী, চিমনির আঁচে গরম। অটো দেখি চুপটি ক'রে বসে আছে। তার মুখ চোখ কেমন বিষণ্ণ।

'কি হে, ব্যাপার কি ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'ভয়ানক কাণ্ড ঘটেছে !' অটো হাসল, বড় তিক্ত সে-হাসি : 'সত্যিই এক ভয়ানক কাণ্ড ঘটেছে। দি রেড এইড এসোসিয়েশনের ভীষণ বিপদ উপস্থিত। বে-আইনী হবার পর এই সমিতিটিকে ছোট ছোট কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। এক-একটি বিভাগে পাঁচজন ক'রে সভ্য ছিল। বিভাগের একজন সভ্য তারই বিভাগের চারজন ছাড়া অন্য বিভাগের আর একজনকে মাত্র চিনবে, এই ছিল নিয়ম। কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করলে সমিতির সবাই যাতে ধরা না পড়ে এই জন্যই এমনিধারা ব্যবস্থা ছিল। নেতারাও প্রতি বিভাগের একজনকে ছাড়া আর কাউকে চিনতেন না। নেতাদের নামও ছিল অজানা এবং নেতাদের নামের তালিকাও ছিল মাত্র একখানা। ব্রুনো ধরা পড়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে তার কাছেই সেই তালিকাখানা আছে। পুলিশ এখনও টের পায় নি। ব্রুনো এখন ডেভিডষ্ট্রাসের থানার হাজতে আছে। তারা ওকে প্রধান ঘাঁটিতে জেরা করার জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় তল্লাস করবেই। তাই আর রক্ষে নেই। সে অবশ্য ইতিমধ্যে কাগজখানা নষ্ট ক'রে ফেলতে পারে। কিন্তু তাতে গোটা সমিতিটাই ধ্বংস হয়ে যাবে।' অটো এক নিশ্বাসে সমস্ত ব্যাপারটা বলে চুপ ক'রে গেল। তার মুখে ফুটে উঠেছে হতাশার ছাপ। 'আমরা এখন ব্রুনোকে চাই,' সে পাগলের মত বলল : 'ব্রুনোকে চাই! নইলে সমিতি যাবে—' ঝরঝর ক'রে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল অটোর। এই প্রথম দেখলাম তাকে কাঁদতে, অটো কাঁদছে !

তাকে সান্ত্বনা দিলাম : 'অটো, এক উপায় আছে। হয়তো তাতে কাজ হবে।'

'দেখ, কিছু করতে পার কিনা!'

অটোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম ফ্লাটে। এসেই লণ্ডনের যে সংবাদপত্রের আমি সংবাদদাতা, সেখানে ফোন ক'রে জানালাম, আমার ফ্লাটে খানাতল্লাস হয়েছে। একথাও জানালাম যে, নাৎসী-শাসনের দাপটে নিরপেক্ষ সাংবাদিক হিসেবে আর কাজ করার উপায় নেই। সাংবাদিকের ঘরে ঢুকে যখন খানাতল্লাস শুরু হয়েছে, তখন মনে হয় নাৎসীরা চায়, অন্যান্য দেশের কাগজগুলোও তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করুক।

সম্পাদক মশাই তো অবাক হয়ে গেলেন। আমি শুনতে পেলাম তিনি বলছেন: 'কিন্তু কি করা যায় বলুন তো?'

'না, না, তৃতীয় রাইখের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে বলছি না—' আমি জানতাম, তিনি কখনও ওকথা ভাবেন নি, কিন্তু তাঁকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই বললাম: 'আমার মনে হয় নাৎসী সরকারও তা চাইবে না। আপনারা আগেই কোন মন্তব্য কববেন না। দেখি, ক্ষমা প্রার্থনা ওরা করেন কিনা!'

রিসিভারটা রেখে দিলাম। ঠিক আধ ঘণ্টা পরেই সেই পুলিশের কর্মচারীটি এসে একখানা চিঠি দিল। খুলে দেখলাম, অহেতুক খানাতল্লাসের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম: 'হঠাৎ এ সুবুদ্ধি আপনাদের কে দিলে?'

সে গম্ভীর স্বরে বলল: 'আমি হের কাইসারের হুকুমে আপনার কাছে এসেছি; আর কিছু জানি না। কিছুক্ষণ আগে পুলিশের বড় কর্তা তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তিনি ফিরে এসেই আপনার কাছে এই চিঠি পাঠিয়ে দিলেন।'

'আচ্ছা, হের কাইসার বহুদিন থেকেই আপনাদের পার্টিতে আছেন বুঝি?'

'উনি তো হপ্তা দু'য়েক হলো যোগ দিয়েছেন।'

'আর উড়ে এসেই একবারে ছোটখাটো কর্তা হয়ে জুড়ে বসেছেন? আপনারা এতদিন পার্টিতে আছেন, আপনাদের উপর হুকুম জারি করছেন?'

কর্মচারীটি রেগে উঠল: 'আপনি কি আমার কাছ থেকে কথা বার ক'রে নিতে চাইছেন? ৫ই মার্চ থেকে হের কাইসার পুলিশে কাজ করছেন।'

আবার আশ্চর্য হয়ে বললাম: 'কি ক'রে এত বড় কাজ তিনি পেলেন?'

'তা আমি জানি না। আমরা নাৎসী, আমাদের কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থের আগে সমষ্টিগত স্বার্থের স্থান। সুতরাং মনে মনে প্রশ্ন করলেও, মুখে ও-

প্রশ্ন আমরা করিনে। আর আপনারই বা ও-ব্যাপার নিয়ে অত মাথা ঘামাবার দরকার কি? সাংবাদিকরা কি সব ব্যাপারেই নাক গলাতে চায় নাকি? আমি চিঠি দাখিল করেছি—আমার কাজ শেষ; এবার চলি।'

কর্মচারীটি বিদায় নিল, আমি এবার বসলাম, হামবুর্গে হিটলারের বিশেষ প্রতিনিধি কাউফমানের কাছে চিঠি টাইপ করতে। দু'লাইন টাইপ করেই চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললাম। আবার নতুন ক'রে শুরু করতে হবে। কিন্তু করব কি? ভদ্র ভাষায় পালিশ দিয়ে একটা বর্বর পশুকে চিঠি লিখে লাভ কি? কাউফমানের মত জার্মানীর প্রতি প্রদেশে হিটলারের এমনি আট থেকে বারোটি প্রতিনিধি আছে। খৃষ্টের প্রতিনিধিদের মতই এরা শক্তিশালী। ওরা পোপেরই সামিল। ওরা কাউকে তখ্‌তে বসাতে পারে, আবার দরকার হ'লে ছুঁড়েও ফেলে দিতে পারে। ওরা আইন তৈরি করে, মানুষকে ফাঁসিতে লটকায়, খাদ্যের দামের বাড়তি-কমতিও ওদের হাতে। ওদের উপরে হিটলার ছাড়া আর কেউ নেই। হিটলারের কাছেই ওরা দায়ী, তারই কাছে জবাবদিহি করবে।

কাউফমানের বয়স তিরিশের শেষ ধাপে। দলিল জালের ব্যাপারে সে জেল খেটেছে। একবার নাৎসী পার্টি থেকে বার ক'রে দেয়া হয়। এমনি কুলীন কাউফমান! চিঠিটা শুরু করব এমন সময় ফ্রাউ হেক্‌মেসার এসে ঘরে ঢুকল। এসে বলল: 'আপনাকে নিশ্চয়ই বিরক্তি করছি না।'

'হাঁ করছ বইকি,' উত্তর দিলাম।

কিন্তু সে আমার কথায় কান না দিয়ে সোফার এক কোণে বসে পড়ল। আমি টাইপ রাইটার বন্ধ ক'রে বললাম: 'হঠাৎ এমন অসময়ে যে?'

সে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। আমি বললাম: 'হের বসের সঙ্গে এইমাত্র দেখা হলো।'

'হের বস!' সে যেন ফেটে পড়ল। 'হের বস, ওর নাম আর আমার সামনে কখনো করবেন না। কত বছর আমার এখানে ছিল। একটা কানা-কড়ি ছিল না ওর, আমিই তো খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। সারাদিন ঘরে বসে থেকে লোকটা সন্ধ্যের দিকে মেয়েমানুষের খোঁজে পথে বেরুত। কি আছে ওর? তবে হাঁ, বক্তৃতা দের বটে!'

'বক্তৃতা শুনেই বুঝি মজেছিলে?'

'হয়তো তাই হবে। কতদিন গেছে, ও এক পয়সা ঘর ভাড়া দিতে পারে নি। আমার তো ঐ দিয়েই চলে, তবু আমি ওর কাছে কখনো চাইনি। কিন্তু

ও কি একদিন জিজ্ঞেস করেছে, কি ক'রে আমার দিন চলছে ? তারপরে আপনি এলেন। বেশ চলছিল। তারপর হিটলার এল। এতদিন ইহুদীদের সম্বন্ধে কত ভাল ভাল বক্তৃতা দিয়েছে : এবার কিন্তু গালাগাল দিতে শুরু করেছে। আমি একটা সভায় ছিলাম, ও বলছিল, ইহুদীরা হচ্ছে জাতির অভিশাপ। এই করেই তো নাৎসীদলে ভাল কাজ জুটিয়েছে। এখন আর সন্ধ্যের দিকে বেরোয় না, নতুন পোষাক পরে দিনের বেলাই চরতে বেরোয়। ওই তো আমায় শিখিয়ে দিয়েছিল, আপনার উপর নজর রাখতে। বলেছিল, আমি যদি ওর ভালোবাসা পেতে চাই তাহ'লে যেন আপনার ঘরে কে এল, কে গেল, আপনার চিঠিপত্র, ফোনে কে কথা বলল—সব কিছুর উপর কড়া নজর রাখি। আমি বোকা কি না, তাই ওর কথায় রাজী হলাম। কিন্তু হতভাগা আমাকে একটা খবর না দিয়েই চলে গেল। এখনো ওর কাছে দু'বছরের ভাড়া পাই। যাওয়ার সময় একবার দেখাও করল না!' ফ্রাউ হেক্‌মেসার চোখের জল জামার হাতায় মুছতে মুছতে চলে গেল। আমি আবার চিঠি লিখতে শুরু করলাম।

কাউফমানকে এই মর্মে চিঠি লিখলাম : 'কয়েকটি বিদেশী কাগজের সংবাদ-দাতা হিসেবে তাঁকে একথা জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমার ঘর খানাতল্লাসের ফলে আমার কাজের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। তার উপরে আমার পিছনে গোয়েন্দা লেগেছে। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে এই সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই।'

চিঠির কয়েকখানা নকল ক'রে দু'খানা পাঠালাম যে কাগজগুলোর আমি সংবাদদাতা, সেই কাগজগুলোতে। দু'খানা আমার দু'জন বিশিষ্ট বন্ধুর হেফাজতে রইল। আমি জানতাম, কখনো কাউফমান এ চিঠির উত্তর দেবে না, এবং বাইরের কাগজেও এ চিঠি পৌঁছবার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তবু একটা লাভ হবে—আমাকে শীগ্‌গির ওরা আর ঘাঁটাবার চেষ্টা করবে না। অন্ততঃ কয়েক সপ্তাহের জন্য গোয়েন্দা আর খানাতল্লাসীর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

ফ্রাউ হেক্‌মেসারকে ঘর-দোর সব গুছোতে বললাম : তারও যথেষ্ট ক্ষতি করেছে পুলিশ। সে গুছোতে গুছোতে তার মৃতস্বামীর নাম ক'রে কাঁদল, আর নাৎসীদের দিল গালিগালাজ।

॥ আট ॥

এবার অটোকে সাহায্য করতে হবে। উপায় আমি অনেক আগেই ভেবে রেখেছিলাম; এবার কাজের পালা। আমি হামবুর্গের এক সংবাদপত্রের অফিসের চিত্র-সম্পাদকের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। আমি এর আগেও বহুবার নানা পরিকল্পনা দিয়েছি, এবারও বললাম, আমার একটা পরিকল্পনা আছে। পুলিশ বিভাগ নিয়ে ছবি তোলার কথা বললাম। এই সময়ে উদারপন্থী কাগজগুলো নতুন গভর্ণমেণ্টের প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করার যথেষ্ট চেষ্টা করছিল। আমি বললাম, এতে সেদিকে থেকে খুবই উপকার হবে। আর এখন গভর্ণমেণ্ট বলতে তো পুলিশকেই বোঝায়, পুলিশের হাতে এখন এমন ক্ষমতা যে, হিটলার পর্যন্ত তাদের ভয় করে। আমার পরিকল্পনা অনুসারে সম্পাদক কাজ করতে রাজী হলেন। সম্পাদক ফোনে সমস্ত ব্যবস্থা করলেন। আমিও পুলিশের বড় কর্তাকে জানালাম, আমি ডেভিডস্টাস-থানার ভিতরে গিয়ে ছবি তুলতে চাই।

'কি বললেন, ডেভিডস্টাস-থানা!'

'হাঁ।'

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। আমাকে ফোনটা ধরে থাকতে বললেন। উত্তেজিত স্বর শুনতে পেলাম। কিছুক্ষণ পরে কর্মচারীটি জিজ্ঞেস করলেন: 'অন্য কোন থানা হ'লে আপত্তি আছে কি?'

'না, ডেভিডস্ট্রাস-থানারই ছবি আমরা তুলতে চাই,' বললাম: 'ডেভিডস্ট্রাস-থানার নাম সমস্ত পৃথিবীর লোক জানে। সুতরাং প্রচারের দিক থেকে এর মূল্য বেশি।'

আবার খানিকক্ষণ চুপ, অবশেষে প্রার্থনা মঞ্জুর হলো। তবে বলা হলো প্রবন্ধ ছাপতে দেওয়ার আগে একবার দেখিয়ে নিতে হবে। আমি রাজী হলাম।

সম্পাদক জিজ্ঞেস করলেন: 'এত থানা থাকতে আপনি ডেভিডষ্ট্রাস-ই বা পছন্দ করলেন কেন? এই হাঙ্গামার সময়ে ওখানে ফটো তুলতে যাওয়ায় বিপদ আছে বই কি।'

'আমি তো পুলিশের অনুমতি নিয়েই যাচ্ছি, আবার বিপদ কি?'

'তবু সাবধানে কাজ করবেন,' সম্পাদক মৃদু স্বরে বললেন : 'আমাদের ওখানকার বন্ধুরা ফটো তুলতে খুব রাজী বলে মনে হয় না। দেখবেন, আবার দাগী আসামীদের সঙ্গে ওদের গুলিয়ে ফেলবেন না।' এইবার এক গল্প ফেঁদে বসলেন সম্পাদক মশাই। আমি ভাবছিলাম, আমার মতলব তাঁর কাছে খুলে বললে তিনি কি করবেন। হৃদযন্ত্রই তাঁর বিকল হয়ে যাবে হয় তো!

শনিবার ২৫শে মার্চের কথাই এখানে লিখছি। ডেভিডস্ট্রাস-থানার খ্যাতি বা কুখ্যাতি সারা পৃথিবীতে কবে ছড়িয়ে পড়েছিল কেউ সঠিক বলতে পারে না। ডেভিডস্ট্রাস যেখানে এসে রিপারভানের সঙ্গে মিশেছে, ঠিক সেই মোড়ের উপরই এই থানা। এই পথ দিয়ে খানিকটা গেলেই আমোদ-প্রমোদের জায়গাগুলোতে গিয়ে পৌছনো যায়। হামবুর্গের বন্দর ঠিক এর পেছনে। নাবিকরা মাতাল অবস্থায় শহরের প্রমোদ-আস্তানায় যাবার আগে এইখানে এসেই বাধা পায়। এখানে প্রতিদিন আসে মাতাল, ব্যাধিগ্রস্তা বেশ্যা, কোকেন ব্যবসায়ী চীনারা, আর অনাথ শিশুর দল। এখানে ঢুকে আপনি যে কোন দেশের ভাষাই শুনতে পারেন। যেন এক আন্তর্জাতিক মেলা বসে গেছে।

বিকেল চারটেয় এসে থানায় পৌছোলাম। চারদিকে লোহার রেলিং ঘেরা বিরাট বাড়ি। ফটকের সামনেই বড় বড় হরফে লেখা, 'প্রবেশ নিষেধ।' আমি ফটকের সামনে দাঁড়াতেই দু'জন পুলিশ কর্মচারী এসে আমাকে অভ্যর্থনা করল। একজন ক্যাপ্টেন এসে সামরিক কায়দায় অভিবাদন ক'রে বলল, সে আমার গাইডের কাজ করার আদেশ পেয়েছে। আমরা এবার ভিতরে ঢুকে ঝঞ্ঝাবাহিনীর জন বিশেক সৈনিককে একটা ঘরে দেখতে পেলাম। আমি ক্যাপ্টেনকে বললাম : 'ফটো তোলার আগে সমস্ত থানাটা আমি একবার ঘুরে দেখতে চাই।' একটু ইতস্ততঃ ক'রে ক্যাপ্টেন সম্মতি জানাল। সে আমাকে ঘুরে ঘুরে ঘরগুলো দেখাতে লাগল। একটা অন্ধকার কুঠরী; দেয়ালে লোহার মোটা জাল দেয়া—তার সামনে এসে দাঁড়াতে সে বলল : 'এখানে বেশ্যাদের রাখা হয়।' এবার এলাম বন্দীদের কুঠরীগুলোর সামনে। কনকনে ঠাণ্ডা, অন্ধকারও খুব, পরিবেশটাই যেন অসুস্থ ক'রে তোলে। একটা কমজোরি আলো জ্বলছে। তারই আবছা আলোয় দেখা যায় বন্দীশালার ঘরগুলো, দরজায় ছোট ছোট উঁকি মারবার ফুটো।

ক্যাপ্টেন বললে : 'এই হচ্ছে বন্দীদের জেল। উপরওয়ালার কাছ থেকে হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত এই এলাকার বন্দীদের এখানেই রাখা হয়।'

'কতদিন এখানে থাকে?'

'একদিন, কি, বড় জোর ত্'দিন।'

'কুঠরীগুলোর ভিতরে গিয়ে দেখতে পারি কি?'

'অসম্ভব। এখন রাজনৈতিক বন্দীরা আছে বলেই আমি আপনার কথা রাখতে পারলাম না। এজন্য আমি খুবই তুঃখিত।'

'কিন্তু,' আমি বললাম: 'আপনি ভুল করছেন ক্যাপ্টেন। রাজনৈতিক বন্দীদের ফটো তোলাই তো এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। জার্মানীর বাইরের কাগজগুলো নাৎসী-শাসনের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা রোজই লিখছে। ওদের এই সব প্রচার মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করতে হ'লে বন্দীদের ফটোই তো কাগজে ছাপানো দরকার।'

'ঠিকই বলেছেন। তাহ'লে একটা কাজ করি। বন্দীর বদলে একজন পুলিশকে কুঠরীতে বসিয়ে ফটো তোলাবার ব্যবস্থা করি। ক্যামেরা ঠিক ক'রে ওকে হাসতে বলবেন, ওর হাসি মুখখানা ফটোতে উঠবে। চমৎকার হবে!'

ক্যাপ্টেন একজন পুলিশকে রুটি, সসেজ আর একখানা ঝাঁটা আনতে পাঠাল। রইলাম শুধু আমি আর ক্যাপ্টেন। কিন্তু ক্যাপ্টেনকে কি ক'রে সরাই?

অবশেষে বললাম: 'কিন্তু একটা কথা ক্যাপ্টেন। এই রকম ফটো তোলার ব্যাপারে একটু ভুল-ত্রুটি থাকলে আর কেলেঙ্কারীর সীমা থাকবে না। আপনি বরং আপনাদের প্রচার-বিভাগে খবর নিয়ে আসুন, এরকম ছবি তোলা সম্ভব কি না! অনেক সময় এসব ব্যাপারে পুরোনো কর্মচারীদেরও নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন', 'ক্যাপ্টেন বলল: 'আমি নিজেও ঐ কথাই ভাবছিলাম। আমি আসছি।' ক্যাপ্টেন সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেল।

ছ'টা কুঠরী; আমার হাতে মাত্র তু'এক মুহূর্ত সময়। ফোকর দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আবছা আলোয় কিছুই দেখা যায় না। কি করি? হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল। একটা ফোকরের সামনে গিয়ে অস্ফুট স্বরে বললাম: 'বল, বল, তুমি কি রাজনৈতিক বন্দী?'

উপর থেকে কথাবার্তা, পায়ের শব্দ ভেসে আসছে। কিন্তু কোন উত্তর নেই। হয়তো ওখানকার যে বাসিন্দা তার উত্তর দেওয়ার শক্তি ফুরিয়ে গেছে। হয়তো আর...

এবার সুইচ বোর্ডের কাছে ফিরে এসে আলোটা নিবিয়ে দিলাম। অন্ধকারে

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলাম, একটি মূল্যবান মুহূর্ত। উপর থেকে কথাবার্তা কানে আসছে আর আসছে পায়ের শব্দ। আর এক মুহূর্ত নষ্ট করলে সব নিস্ফল হবে। আমি কুঠরীগুলোর কাছে হাতড়াতে হাতড়াতে ফিরে গেলাম। ফোকর দিয়ে তাকালাম। কুঠরীটার উপরে একটা জানালা। বিবর্ণ শার্সি দিয়ে একটু আলোর ক্ষীণ আশার মত এসে পড়েছে ঘরের ভিতরে। যেন আসামীর একটু হাতছানি। ঐটুকুই যথেষ্ট—ঐ ক্ষীণ আলোতেই দেখতে পেলাম কুঠরীর বাসিন্দাকে। তার দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস ক'রে বললাম: 'এই জলদি বল —কে তুমি? তুমি কি ব্রুনো? রাজনৈতিক বন্দী?' কিন্তু সে ব্রুনো নয়। ফোকর থেকে চোখ তুলে নিলাম। ফোকরের উপরে যে ঢাকনিটা ছিল পড়ে গেল। মৃদু ধাতব ঝংকার উঠল। কতক্ষণ চলে গেছে কে জানে। স্নায়ুগুলো উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। চারদিকে ঘন অন্ধকার, বারান্দার আলো আগেই নিভিয়ে দিয়েছি। মন জরো রোগীর মত অস্থির হয়ে উঠেছে। পর পর কয়েকটা পরীক্ষা করলাম, অবশেষে পেলাম ব্রুনোকে। ফোকরের দিকে তাকালাম, ওর নিশ্বাস মুখে এসে লাগছে। ওর চওড়া কাঁধ দেখতে পেলাম। শুয়েছিল। ফিস ফিস ক'রে ডাকলাম: 'ব্রুনো!'

লোকটা উঠে এল। ব্রুনোই বুঝি! কিন্তু হায় সে ব্রুনো নয়।

তবে কি একেবারে শেষের কুঠরীতে সে আছে, না তাকে নিয়ে গেছে সরিয়ে? হয়তো খুন করেছে তাকে!

শেষের ডিগরীতেই তার দেখা মিলল। দেখেই চিনলাম। তাকে ডাকতেই সে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। মুখ তার দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু তার অঙ্গভঙ্গী চিনিয়ে দিল সে-ই ব্রুনো। ব্রুনো! সে কোন কথা বলল না। শুধু ফোকর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। এক জোড়া চোখ, কৌতূহলী তার দৃষ্টি—আর কাছে সতর্কতা। আমি অস্ফুটস্বরে নিজের নাম বললাম। তবু সে ইতস্ততই করছে। ওদিকে মুহূর্তগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে। তবুও তার দ্বিধা, তবুও ভয়। হঠাৎ যেন প্রেরণা পেলাম। আমি এবার কি মনে ক'রে দৌড়ে গিয়ে আলো জালিয়ে দিলাম। তারপর এসে ফোকরের কাছে মুখ নিয়ে ডাকলাম এখনো আঁধারে মুখ দেখা যায় না। কিন্তু সে আমার মুখ দেখতে পেল। আমাকে চিনতে পারল। এখনো সে চুপচাপ। হঠাৎ সে নুয়ে পড়ল। কি করছে? জুতো খুলে ফেলছে, যেন ঘুমুতে যাবে এমনি ভাবভঙ্গী!

পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, ওরা সিঁড়ি দিয়ে নামছে। ষোলটার বেশি ধাপ

আছে। কিন্তু আর কতক্ষণ? ক্রনো জুতো খুলে ফেলছে। মোজা খুলছে! এখনো কয়েক মুহূর্ত আছে—এখনো কয়েক ধাপ বাকি।

ক্রনো ফোকর দিয়ে এক টুকরো কাগজ গলিয়ে দিল। আমিও পকেটে পুরলাম আর সেই মুহূর্তেই পুলিশটি এসে হাজির হলো। ক্যাপ্টেনও উদয় হলো সঙ্গে সঙ্গেই। আমার দিকে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। বুক দুরু দুরু ক'রে কেঁপে উঠল ভয়ে। ঢাকনিটা ফেলে দিয়ে বললাম: 'তোমার অতিথির চেহারাটা দেখে নিচ্ছিলাম, এ কি ঘুঘু না কি?'

পুলিশটি বলল: 'জানি না।'

ক্যাপ্টেন জানাল, প্রচার বিভাগ থেকে অনুমতি পাওয়া গেল না। আমি দুঃখিত হবার ভান করলাম। বললাম: 'কয়েদীদের ফটো না তুলে পুলিশের দপ্তরের কাজ কেমন হয় তার ফটো তো তুলতে পারি।' অনুমতি মিলে গেল।

অফিসাররা এবার নিজেদের অভিজ্ঞতার কাহিনী জুড়ে দিল। তাদের কর্মতৎপরতা আর কৌশলের কথায় তারা তখন পঞ্চমুখ। আমি প্রস্তাব করলাম, তাদের একটা গ্রুপ ফটো নেব, এতে তারা আরো গলে গেল। দেখতে দেখতে এই বিরাট পুলিশ গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠলাম।

তখনকার দিনে বিদেশী রাজদূত থেকে শুরু ক'রে কাগজের সংবাদদাতা পর্যন্ত সকলেরই ধারণা ছিল, ঝঞ্ঝাবাহিনী সখের সেনাদল ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরাও এই ধারণাই ছিল, কিন্তু সেদিন পুলিশ কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ ক'রে সে-ভুল আমার ভেঙে গেল। সৈন্যবাহিনীতে একজন পদাতিক সেনার যতখানি শিক্ষা প্রয়োজন, ততখানি সামরিক শিক্ষা ঝঞ্ঝাবাহিনীর সভ্যেরা পেয়ে থাকে। ঝঞ্ঝাবাহিনী সখের সেনাবাহিনী নয়, খেলাই তাদের লক্ষ্য নয়, তাদের লক্ষ্য আরো ব্যাপক, তারা খেলার নামে চায় ক্ষমতা অধিকার করতে। আর আজ তা পেয়েছেও।

এদের বিচক্ষণতায়ও সন্দেহের অবকাশ নেই। আমি যে ঝঞ্ঝাবাহিনীর প্রধান কেন্দ্র থেকে (এখন ঝঞ্ঝাবাহিনী বহু জায়গায়ই অতিরিক্ত পুলিশের স্থান অধিকার করেছে—) এমনি ক'রে কাজ উদ্ধার করতে পারলাম, সে আমার বরাত। অবশ্য এ বরাত গ্রহ-নক্ষত্রের অপূর্ব সংস্থানে দেখা দেয় নি, দেখা দিল কতকগুলো ঘটনার সমন্বয়ে। আজ ছিল ছুটির দিন—ঝঞ্ঝাবাহিনীর লোক তেমন বেশি ছিল না। তাছাড়া পুরোনো পুলিশগোষ্ঠী ওদের সুযোগ সুবিধে বেশি দেখে ওদের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছে। সুতরাং ওদের কাজ ওরাই করুক

—এই তাদের মনের ভাব। তাই সতর্ক পাহারায় পড়েছে থানায় থানায় ঘাটতি। যাহোক, ওদের এই বিরোধের সুযোগ নিয়ে আমার কাজ হাঁসিল হলো।

আটটার সময় থানা থেকে বেরুলাম। তখন ঝঞ্ঝাবাহিনী সম্বন্ধে সব কিছু কথা আমি যোগাড় ক'রে ফেলেছি। আমি তাদের উপরওলাদের নাম, সামরিক বিদ্যা শেখার স্কুলের ঠিকানাও জেনে নিলাম। হিটলার আর একটি মহাযুদ্ধের জন্য জার্মানীকে তৈরি করছে, তার পেলাম প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আজ সবাই সে-কথা জানে, কিন্তু তখন কেউ বিশ্বাস করতে চায় নি।

এবার নাগেলের পানশালায় গিয়ে উঠলাম। ভিড় নেই। পরিচালক ঝিমুচ্ছিল : সজাগ হলো। পেছনে একটা কুঠরীতে গিয়ে বসলাম। দু'এক-পাত্র পান ক'রে চাঙা হলাম। বহু ধকল গেছে বটে! সেদিন এই তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারটায় একটু বেশি মূল্যই হয়তো দিয়েছিলাম। কিন্তু সত্যিই কি তার মূল্য কম ছিল? সেদিন সামান্য একটা খবরেও বিপ্লব হতে পারত; হাঁ, এমনি ছিল তখন জার্মানীর অবস্থা। তখন গোপন আর কূট রাজনীতির খেলা চলছিল জার্মানী জুড়ে। একটা সামান্যতম খবরেরও তখন ঢের দাম। পানশালা থেকে বেরিয়ে তালিকাটি যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরলাম। ২৫শে মার্চ চলে গেল।

পরদিন সকাল দশটায় নিকলের সঙ্গে এসপ্লানেডের পোস্টঅফিসের সামনে দেখা। দামি ওভারকোট তার গায়ে। সে আমাকে ডেকে নিয়ে তার গাড়িতে বসাল। গাড়ি চলল সমুদ্রের দিকে।

'গ্রেফতারী পরোয়ানা বেরিয়েছে! ওরা আমাকে খুঁজছে।' শহরের বাইরে নির্জনে এসে সে বলল।

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

সে আবার বলতে লাগল : 'এতদিনে কাজের মত কাজ খুঁজে পেয়েছি। কতদিন ভেবেছি, আমি কি এসব কাজ পারব? আমি ছিলাম বার্লিন আর ফ্রাঙ্কফুর্টের সেরা কলেজের অধ্যাপক। মোটা মাইনে পেতাম, ছিল কত বন্ধু, কত ছাত্র, আর ছিল শ্রমিক সঙ্ঘে প্রতি সপ্তাহে বক্তৃতা। তুমি তো জানো, কোন রাজনৈতিক দলেই আমি যোগ দিই নি। নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে রাজী নই। বোধহয় সভ্য হই নি বলেই ভাল ক'রে কাজ করতে পারছি। আমার মার্কসবাদের ভাষ্য—'

বললাম : 'তোমার মার্কসের ভাষ্য পার্টি স্বীকার ক'রে নিয়েছে, তা জানি।'

নিকল বলে চলল: 'ত্‌'সপ্তাহ আগেকার কথা, বক্তৃতা দিতে চলেছি; আমারই এক বন্ধু ডেকে বললে, তুমি পালাও। আমি তো কিছুতেই যেতে চাইলাম না। এর আগে সভায় ও-রকম বহু হাঙ্গামা আমি দেখেছি। তারপর কি হয়েছিল, তুমি তো সবই জানো—'

হাঁ, আমি সবই জানতাম। নাৎসীরা, নিকল বক্তৃতা দিতে উঠতেই, দাঙ্গা বাধিয়ে দিল। নিকল, যাকে বইয়ের পোকা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না, সে তার তিরিশজন ছাত্রের সঙ্গে মিলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে জয়ী হলো। কিন্তু ঝঞ্ঝাবাহিনী এসে তার ছাত্রদের গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল। তারা এখন জেলে।

'সেই দিন থেকে আমার সব কিছু ওলোট্‌-পালট্‌ হয়ে গেছে। শারীরিক শক্তি দিয়ে এই আন্দোলনে কিছু সাহায্য করতে পারব না, কিন্তু সমস্ত জাতিকে যদি মার্কসবাদের মূল তত্ত্ব শিখিয়ে দিতে পারি, কেন এ লড়াই তা যদি বোঝাতে পারি, সে-কাজ কি কম? আমরা অত্যাচারিত হতে পারি, নিগৃহীত হতে পারি, কিন্তু মার্কসবাদ তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।'

নিকল থামল। চমৎকার দিন; পথে জোড়ায় জোড়ায় তরুণ-তরুণী চলেছে। তাদের হাসির টুকরো, দু'একটা কথা, কানে আসছে। এত বড় দুর্যোগ যে ঘনিয়ে এসেছে দেশের, তারা তা জানে না। কে জানে, হয়তো তারাই সুখী!

'আমি বার্লিন ছেড়ে এসেছি,' নিকল নীরবতা ভাঙল: 'ওখানে সবাই আমাকে চেনে। এখানেও চেনে, কিন্তু এখানে থেকেই কাজ করব ঠিক করেছি। ওরা আমাকে লুনেবুর্গ কি লুবেক্‌-এ পাঠাতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি এখানেই এলাম। টাকা আছে হাতে, রোজ একখানা ক'রে গাড়ি ভাড়া করছি, আর গাড়ির ভেতরে আছে—তুমি ভাবতে পার, তোমার পাশে ওগুলো কি?'

'না।'

'আমি বলব না,' নিকল হাসল: 'খবর্দার! ছুঁয়োনা, হাত পুড়ে যাবে, এমন গরম জিনিস!'

'কি আছে, হাতিয়ার?'

নিকল কোন উত্তর দিল না। সে সাবধানী, পথ বাঁকের পর বাঁক ঘুরছে। সে সাবধানে চালাচ্ছে। আমরা লুবেক্‌ শহর ছাড়িয়ে একটা বনের কাছে এসে পড়লাম। বন গিয়ে মিশেছে সমুদ্রে।

এ যেন এক উপন্যাসের প্লট! কিনেস্ট্‌ এমনি প্লট পেলে এক চমৎকার উপন্যাস ফেঁদে বসতেন। নিকেল বলল: 'গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানা বেরোনোর

পর থেকে আমি যেন মুক্তির আনন্দ পেয়েছি। যে-কোন বিপদ আমি এখন স্বচ্ছন্দে বরণ ক'রে নিতে পারি। বুর্জোয়া সমাজ আর তার সমালোচনার গণ্ডির বাইরে আমি।'

আমি কোন কথা বললাম না। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। হাইনৎস নিকল! অভিজাত জার্মান বংশের ছেলে। ওর বাবার নাম দার্শনিক হিসেবে ইওরোপে সুপরিচিত। ওর কাকা ভেটিকানের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। জার্মানীর সমগ্র অভিজাত মণ্ডলী ওর আত্মীয়। আর ও কিনা গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করছে, হাতাহাতি লড়ছে ভাড়াটে সৈন্যদের সঙ্গে! আর ফিয়াট গাড়ি নিয়ে ছুটছে এ-শহর থেকে ও-শহরে! মনে হলো, এই বুঝি জার্মান যুবকের স্বরূপ।

আমরা এবার সমুদ্রের ধারে এসে পড়লাম। এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে জেলেদের গ্রামগুলি। এবার আর গ্রাম দেখা গেল না। শুধু বালিয়াড়ি, সেখানে গাছপালা নেই—শুধু বালির উপরে দেখা যায় গোছা গোছা ঘাস। এ-জাতের ঘাস বালির উপরেই জন্মায়। নিকল গাড়ি থামাল। এসে বসলাম সমুদ্রের ধারে বালির উপরে। আকাশ মেঘহীন, মৃদু হাওয়া এসে মুখের উপর নিশ্বাস ফেলে যাচ্ছে। দু'জনই চুপচাপ। শোনা যাচ্ছে তীরের উপর ঢেউয়ে আছড়ানি। আমি নিকলকে বললাম আমার গতকালের অভিজ্ঞতার কথা।

বললাম: 'আমি একা কিছুই ঠিক করতে পারছি না। হয়তো আমার সন্দেহ অমূলক। কিন্তু তবু এই সব খবর আমি বাইরে পাঠাচ্ছি। বাইরের শক্তিগুলো যদি চেষ্টা করে তো আর-একটা সর্বনাশা যুদ্ধের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে পারবে। কারণ, যুদ্ধে তাদের আর প্রয়োজন নেই, হিটলারেরই শুধু প্রয়োজন। আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি, কিন্তু এ দায়িত্ব একা তো নিতে পারি না। হয়তো নাৎসীদের চোখে আমি এক ধ্বংসাত্মক শক্তি ছাড়া আর কিছুই নই, হয়তো ওদের রীতি-নীতি আমি বুঝতে পারি না। আমার কাছে "রক্ত আর মাটির নীতি" একটা ফাঁকা জিনিসেরই সামিল। হয়তো বা তা নয়ও। তুমি অভিজাত বংশের সন্তান। তোমার শরীরে এক ফোঁটা ইহুদি রক্ত নেই, তুমি খাঁটি আর্য—ইচ্ছে করলে তুমি আজ ঝঞ্ঝাবাহিনীর নেতা হতে পার। তোমাকে আমি সব বললাম। তুমি ভেবে দেখ, এখবর বাইরে পাঠানো উচিত কিনা। বাইরে পাঠিয়ে কোন সুবিধে হবে কিনা সে-কথাও ভাবতে হবে। এতে কি নাৎসী শাসনযন্ত্রের উপর আঘাত হানা হবে?'

নিকল কিছুক্ষণ ভেবে বলল : 'সুবিধে হবে কিনা জানি না, কিন্তু সংবাদটা যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একথা স্বীকার করতেই হবে। নাৎসী জার্মানীর নয়া বুলি "রক্ত আর মাটির নীতি" তোমার মত অনেককেই ভাবিয়ে তুলেছে। নইলে তোমার মত লোক একথা বলবে কেন? বার বার ঐ বুলি শোনা যাচ্ছে বলেই তো একথা বলছ। বন্ধু, ঐ তো পাতিবুর্জোয়াদের রীতি। ওদের কোন বিচার-বুদ্ধি নেই। ওরা একটা কথা বার বার ব'লে সেটাকেই নিজের ব'লে খাড়া করতে চায়। হিটলারের তো ওরাই পৃষ্ঠপোষক। তাই হিটলারী রীতিও ওদের থেকেই ধার নেওয়া।'

তারপর নিকল আমার এই খবর থেকে এক সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছল; তার মতে বিদেশী শক্তির স্বার্থের দিক থেকে হিটলারী-শাসন খুব অশান্তির ব্যাপার নয়। কেননা, হিটলার ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং অন্যান্য শক্তিকে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হবে যে, জার্মানীতে তার শাসন-ব্যবস্থা কায়েম সে করবেই। এবং এই সব শক্তিরাও রাজনীতিক এবং আর্থনীতিক ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। অবশ্য একটা ভয় তার আছে। সেটা হচ্ছে ফ্রান্সের সঙ্গে রাশিয়ার মিত্রতা। রাশিয়া আর তুরস্ক আর দক্ষিণে বলকান, এবং পূর্বে পোলাণ্ড ও অন্যান্য সীমান্ত রাজ্যের সহায়তায় ফ্রান্স ইওরোপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হয়ে দাঁড়াতে পারে বটে। ইংলণ্ড তখন আর সর্বপ্রধান শক্তি থাকবে না, ফ্রান্সকে সে-আসন ছেড়ে দিতে হবে।

'এদিকে ইংলণ্ডে মুদ্রা-সঙ্কট শুরু হয়েছে। তার এখন মান বাঁচানো দরকার। এক ঔপনিবেশিক শক্তির পক্ষে এ পরিস্থিতি বড়ই ভয়ংকর। একে অবহেলা করা চলে না। সে হিটলারী জার্মানীর সঙ্গে মিতালী পাতাতে খুব সহজেই রাজী হবে। হিটলার কী ক'রে ক্ষমতা পেল—সেসব সে বিচার ক'রে দেখবে না। হয়তো প্রথম প্রথম খানিকটা লোক-দেখানো উষ্মাও প্রকাশ করবে, কিন্তু সে বড় জোর একবছর, তারপর জার্মানীর সঙ্গে মিত্রতা সে করবেই। পররাষ্ট্রনীতির দিক্ থেকে অ্যাংলো-স্যাক্সন শক্তির বিরূপতা জার্মানী আশাও করে না। তার ভয় শুধু ফ্রান্সকে, অথচ ফ্রান্স এখনও চায় শান্তি। ইওরোপের আর সব জাতির সম্বন্ধে কিন্তু একথা একেবারেই খাটে না। এই জন্যই তার উপর চোট পড়বার সম্ভাবনা বেশি। জার্মানীর এই সমর-সজ্জায় যদি কেউ ভয় পায় তো সে ফ্রান্স। জার্মানী যদি প্রকাশ্যে সমর-সজ্জা করত, তাহ'লে ভার্সাই সন্ধির অন্যান্য স্বাক্ষরকারী শক্তিরা কিছু একটা বিহিত করার চেষ্টা

করত। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। স্থতরাং তোমার এই খবর ফ্রান্সেরই পাওয়া একান্ত দরকার। তার কাছে এর দাম সবচেয়ে বেশি। ইংলণ্ড, ইতালী পেলেও যে লুফে নেবে তা নয়, তবে সে শুধু হজম ক'রে ফেলার জন্যই। এবার ব্যাপারটা ভাল ক'রে বুঝে দেখ। এই হচ্ছে বর্তমান ইতিহাসের ধারা।'

'নিকল, তুমি যে সব কথা বললে এগুলো কি অনুমান, না তোমার স্থির সিদ্ধান্ত?'

নিকল কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল; তারপর বলল: 'অনুমান আর সিদ্ধান্তের পথ একই। একে আমি সিদ্ধান্তই বলব। ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে তোমার এ খবর কিন্তু ছাপাতে যেয়ো না। আমার উপর ভার দাও, আমি সব বন্দোবস্ত করব। এর জন্যেই লুনেবুর্গ থেকে হামবুর্গেই আসার প্রয়োজন বেশি—এখন একথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ তুমি।'

'বার্লিনেও তোমার প্রয়োজন কম নয়।' আমি বললাম।

নিকল মাথা নেড়ে বললে: 'না, বার্লিনে হয়তো নয়, এই হামবুর্গ আমার কার্যক্ষেত্র—অন্য কোথাও নয়।'

অচঞ্চল আর স্থির নিকলকে দেখে মনে হলো—সে ঠিক কথাই বলেছে।

আমি নিকলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

বামপন্থীদের উপর যখন নির্যাতন শুরু হয়, তখন থেকেই নেতারা তার প্রতিকারের উপায় খুঁজছিলেন। অনেক ভেবে তাঁরা আবিষ্কার করেন যে, নির্যাতন এড়াবার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে, নির্যাতনকারীদল কখন দেখা দেবে তার সঠিক সংবাদ রাখা। তাদের অভিসন্ধি জানাও দরকার। তাই তাঁরা ঠিক করলেন বিশ্বাসী সাথীরা যত পারেন পুলিশ আর ঝঞ্চাবাহিনীতে ঢুকবেন। সেই অনুসারে কাজও চলতে লাগল।

কিছুদিন পরেই তাঁদের এই কৌশল পুলিশের কাছে ধরা পড়ে গেল। তাই পুলিশ নিজেদের দলের মধ্যে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য গোয়েন্দা-দপ্তর খুলে বসল। তার নাম রাখা হলো সংবাদ-বিভাগ। এরই মধ্যে দেখা গেল বামপন্থীদের উপর আঘাত হানার আগেই তাঁরা সব ভণ্ডুল ক'রে দিয়েছেন। তাই পুলিশের এই সংবাদ-বিভাগটি তৎপর উঠল। ১৯৩৩এর মার্চ আর জুলাই মাসের মধ্যে হামবুর্গের বিশেষ পুলিশ বাহিনীকে দু'দুবার নতুন ক'রে ঢেলে সাজাতে হলো। এদিকে বামপন্থীরাও সংবাদ সংগ্রহ বিভাগ গড়ে তুললেন। অটোর

উপর দেওয়া হলো কমিউনিস্ট পার্টির সংবাদ সংগ্রহ বিভাগের দায়িত্ব। সে শুধু শত্রুর সংবাদ সংগ্রহ করেই খুশি রইল না, পার্টির সভ্যদের উপরও সতর্ক নজর রাখার ব্যবস্থা করলো।

একথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, দেখতে দেখতে এমন সব ব্যাপার ঘটে গেল যে, শুধু জার্মানী নয়, সারা দুনিয়া চঞ্চল হ'য়ে উঠল। একদিন পারীর খবরের কাগজ "পেতাইত পারিসিয়ঁ"তে বেরুল চাঞ্চল্যকর খবর। নাৎসী সরকারের প্রচার দপ্তরের বহু গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে গেছে। এসব তথ্য প্রায়ই নির্ভুল ছিল। বামপন্থীদের হাত দিয়েই এসব খবর পারীর এই সংবাদপত্রের কাছে পৌঁছেছিল। তাই নিকল আমাকে যখন বললে, 'ইংলণ্ডের খবরের কাগজে ওসব খবর পাঠিয়ে লাভ নেই, আমার হাতে ওগুলো দাও,' আমি তখন দ্বিধা করিনি।

এক পক্ষকাল চলে গেলো, কিন্তু বাইরের সংবাদপত্রে নাৎসী সামরিক শিক্ষা সম্বন্ধে কোন খবরই বেরুল না। একটু হতাশ হলাম। কিন্তু নিকল যে ভুলে যায় নি, তার প্রমাণ পেয়েছিলাম বহু পরে—১৯৩৪ সালের ২২শে জানুয়ারি। খবর পেলাম, ঝঞ্ঝাবাহিনীর এক সামরিক বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষকদের বন্দী-শিবিরে রাখা হয়েছে। তাঁদের নেতা হ্বিলাট পালাতে গিয়ে নিহত হয়েছেন। এই হ্বিলাট ছিলেন সোশ্যালিস্ট দলের সভ্য। ১৯৩৩এর মে মাস থেকে ১৯৩৪-এর জানুয়ারি পর্যন্ত ঝঞ্ঝাবাহিনীর স্কুলের তিনি ছিলেন শিক্ষক। হাজার হাজার যুবক তাঁর কাছে শিখেছে সামরিক বিদ্যা আর রাজনীতি।

ম্যাক্স হ্বিলাটের এই আত্মোৎসর্গের কথা কি ইতিহাস মনে রাখবে? তিরিশে জুন উনিশশো চৌত্রিশ সালে তিনি যে প্রাণ দিলেন, জলের অক্ষরেও কি তার নাম লেখা থাকবে?

পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই গুপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর শত্রুর প্রথম আঘাত পড়তে শুরু করল। প্রথম আঘাত হানার দিনটি আমার স্পষ্ট মনে আছে। অটোর এক সহযোগীর কাছ থেকে খবর পেলাম আমাদের ভূতপূর্ব বন্ধু ম্যাক্স নাকি ব্রাউন হাউসে খুব ঘোরাঘুরি করছে। মূর ওয়েইডেন্‌স্ট্রাসের এই শত্রুর ঘাঁটিটির উপর বামপন্থীদের কড়া নজর ছিল। নাৎসীরা তা টের পেয়ে যায়। তখন থেকে দুরূহ হ'য়ে উঠল ব্যাপারটা। যুবসোশ্যালিস্ট সঙ্ঘ প্রথমে ব্রাউন হাউসের সামনের বাড়িতে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে হিটলারী দলের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখছিল। ওরা খুব সজাগ ছিল বলেই নাৎসীরা প্রথমে বুঝতে পারে নি, কি ক'রে তাদের গুপ্ত সংবাদ বাইরে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে।

অবশেষে তারা বুঝতে পারল। এবার সোশ্যালিস্ট যুবসঙ্ঘের অবাক হওয়ার পালা। এত সতর্ক ছিল তারা, অথচ সব ভেস্তে গেল! কিন্তু ব্যাপার কি? শেষে তারা কারণ জানল। সব দিকে আট-ঘাঁট বেঁধে একটা সহজ ব্যাপারেই ভুল করেছিল তারা। নাৎসীরা বাড়ির আশেপাশের টেলিফোনগুলোর উপর নজর রেখে তাদের গুপ্ত আস্তানার সন্ধান জেনে ফেলেছিল।

এবার ব্যাপারটা দাঁড়াল আরো ঘোরালো হয়ে। গুপ্ত আস্তানা উঠে গেল এক মস্ত বাড়ির চিলেকোঠায়—সেখানে দূরবীন নিয়ে একটা লোক অষ্টপ্রহর বসে থেকে নাৎসীদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখত। কিন্তু এতে বিশেষ লাভ নেই বলেই চিলেকোঠার আস্তানা থেকে বিদায় নিতে হলো। তখন এক পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখা ছাড়া উপায় রইল না। এমনি ভাবে নজর রেখেই ম্যাক্স-এর ব্রাউন হাউসে গতিবিধির কথা জানা গেল।

এক বিকেলে এই সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্যই অটো, হাবার্ট আর আমি 'চতুরঙ্গে' একত্র হলাম। আমাকে ওরা বললে, আমি যেন ম্যাক্স-এর সঙ্গে দেখা ক'রে সব কথা বন্ধুভাবেই জিজ্ঞেস করি। হার্বার্ট আটটার সময় বিদায় নিল। সে বলে গেল তার আজ প্রথম অঙ্কেই একটি ছোট্ট ভূমিকায় নামতে হবে। অভিনয় সেরে সে এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবে। আমি আর অটো বসে রইলাম। অটোর মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া। তার হাতে টাকা-কড়ি নেই, নিজের সংসার অচল। পার্টির কাজও তাই। চিরদিন টেনে-হিঁচড়েই তার সংসার চলে, কিন্তু এমন বিষণ্ণ তাকে কোনদিন দেখিনি। প্রতি পদে বাধা পাচ্ছে। অন্য পাড়ায় গিয়ে নাম ভাঁড়িয়ে থাকার জন্য তার নতুন পাসপোর্ট চাই। এতো নিজের ব্যাপার, তাছাড়া একজন বন্ধু ঝঞ্ঝাবাহিনীর এক সৈনিককে হত্যা করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিল, জেল থেকে সে পালিয়ে এসেছে। তাকে অন্যত্র পাঠাতে হবে, টাকা চাই।

কিন্তু ফাণ্ডে একটি আধলা নেই; অথচ খরচ রয়েছে। কারো ধারণাই নেই, গোপন আন্দোলন চালাতে কত খরচা। অথচ খরচ তো ক্রমাগত বাড়ছে। এই তো সেণ্ট্রাল স্টেশনের প্লাটফর্মে জরুরী বৈঠক বসে, কিন্তু প্লাটফর্ম-টিকিট কেনার পয়সাও হাতে নেই। রাশিয়া থেকে রুবল এসে পড়বে, এরূপ কথা আজও রূপকথাই হয়ে আছে। আর সে-রূপকথার প্রচারে শত্রুপক্ষই বেশী তৎপর। শুধু পার্টির সভ্যদের চাঁদার উপর ভরসা; কিন্তু তাই বা কত? শুধু কতকগুলি পয়সা মাত্র।

‘কাল আমাকে গ্রিনডেলে গিয়ে উঠতেই হবে,’ অটো বলল : ‘তারপর আছে নতুন পাসপোর্টের হাঙ্গামা। কেরানী বলে তো নাম লিখিয়েছি ; কিন্তু কাজ যে কিছুই জানি না। চাকরি জুটবে কিনা সন্দেহ।’

হার্বার্ট এমন সময়ে থিয়েটার থেকে ফিরে এল। তার মুখ দেখেই বোঝা গেল খবর খারাপ। সে বসে পড়ে বলল : ‘ফ্রাউ বি আসছে। সে স্টেজের উপরই আমাকে বলেছিল, খবর আছে। যখন বললাম, আমার জন্য বন্ধুরা অপেক্ষা করছে, সে বললে : সে সঙ্গে থাকলে নাকি আমার কোন ভয় নেই। সে এখুনি আসছে। আমি তাড়াতাড়ি খবর দিতে এলাম। চল অন্য কোথাও গিয়ে বসি।’

অটো এবার অন্য টেবিলে গিয়ে বসল।

ফ্রাউ বি এসে ঢুকল ঘরে। আমাদের টেবিলে এসে সে সম্ভাষণ জানাল। তারপর নানা কথা শুরু হলো। আমি এক সময় জিজ্ঞেস করলাম : ‘হার্বার্ট বলছিল, কি নাকি জরুরী খবর আছে ?’

‘হাঁ, আছে বৈকি। ওরা স্টার্ন স্কাপৎসেন স্টেশনের কাছে একটা ছাপাখানায় হানা দিয়েছে।’

হাই তুলে বললাম : ‘ও, এই ব্যাপার ! আমি ভেবেছিলাম থিয়েটারের রংদার খবর শুনব।’

ফ্রাউ বি বললে : ‘অত্যন্ত দুঃখিত। আমি ভেবেছিলাম আপনাদের কাছে খবরটার খানিকটা দাম আছে যাহোক আমার ভুলই হয়ে গেছে। আচ্ছা, অন্য বিষয়েই কথা কওয়া যাক। শুনেছেন, স্কানস্-পিল-হান্স্-এর নাম বদলে শীগ্গিরই হামবুর্গ স্টেট থিয়েটার হবে।’

অটো তার টেবিল থেকে আমাকে ইশারা করল। সে হানার খবরটা জানতে চায়। হার্বার্ট যেন কেমন হতাশ হ’য়ে পড়েছে। দক্ষ অভিনেতার ভাবভঙ্গী তো খুঁজে পাচ্ছি না। কেমন যেন অসহায় শিশু সে।

‘তুমি নিরাশ হয়ো না হার্বার্ট,’ ফ্রাউ বি ঠাট্টা ক’রে বলে : ‘গল্প বলতে আমি ওস্তাদ। একটা জমতে না পারে, আর-একটা এক্ষুণি জমিয়ে দিচ্ছি। ভয় কি !’

আমি এবার না বলে পারলাম না। বললাম : ‘আপনি খুব চতুর এবং কৌশলী, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু পুরোনো হাসির অপেরার ষড়যন্ত্র-কারীদের মত বেশ ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথাটি বলেছেন। আজকের দিনে ওটা অচল। আমি বিদেশী সংবাদপত্রের সংবাদ-দাতা হিসেবে বলছি, আপনার যা বলার আছে, সহজ ভাষায় বলে ফেলুন। আমি রাজনীতিক খবরের দাম জানি।’

'বাঃ, আপনি তো বেশ দক্ষ অভিনেতা !'

'হাঁ, অভিনয় যদি করেই থাকি, বিবেক আমার কিন্তু খাঁটি আছে।'

'হবেও বা, কিন্তু ভাণ্ডারলিকের সঙ্গে কি কয়েক দিনের ভিতরে আপনার দেখা হয়নি ?'

'সাংবাদিক হিসেব বহু লোকের সঙ্গেই আমাকে দেখা করতে হয়। কেন, ভাণ্ডারলিকের কি হয়েছে ?'

'তার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছে !'

'এই জন্যই কি হের কাইসারকে আপনি তার কথা বলেছিলেন ?'

'হাঁ, তাই।'

'আমি সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসেবে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। আপনি কি ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্ট পার্টির গোয়েন্দা বিভাগের একজন সভ্যা ? যদি তাই হয়, আপনার কাছ থেকে আমি কয়েকটা খবর জেনে নেব।'

'আপনি নির্লজ্জ।'

'সে কি ! আমি কি আপনাকে অপমান করলাম, ফ্রাউ বি ? আমি তো ভেবেছিলাম আপনি একজন খাঁটি ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্ট।'

ফ্রাউ বি চুপ ক'রে রইল। হার্বার্ট ভয় পেয়েছে বোঝা গেল। সে তাড়াতাড়ি বলল : 'মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ তুমি !'

ফ্রাউ বি তাকে বাধা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল : 'আমি এমন কতকগুলো কথা বলব, যার মানে হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন না। হাঁ, আমি একজন নাৎসী। আমি জার্মান জাতির নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা এবং প্রয়োজনে বিশ্বাস করি। আমার যতটুকু শক্তি, আমি তা করব। হাঁ, যতখানি আমি পারব। আমাদের এই আন্দোলনের শত্রুকে দেখতে পেলে আমি তাকে ধরিয়ে দেব, যারা ভুল ক'রে অন্য পক্ষে যোগ দিচ্ছে, তাদের আমি বোঝাব—'

'আপনি কি আমাকে বলছেন ?'

'না,' সে উত্তেজিত হয়ে উঠল : 'আপনাকে আমি বলছি না। আমি জানি আপনি কিছুতেই বুঝবেন না। আর আপনাকে বোঝানো যদি বা যায়, পার্টিতে আসার পথ আপনার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ। যারা কিছুতেই বিশ্বাস করে না, আপনি তাদের দলে। আপনারা চান ঈশ্বরের দুনিয়াকে ভেঙ্গে চুরে ঢেলে সাজাতে। আপনারা দেশের শত্রু, জাতির শত্রু। আপনার কথা আমি—'

'কাকে আপনি বলেছেন আমার কথা, জানতে পারি কি ?'

ফ্রাউ বি উত্তর দিল : 'আমাকে ঘাঁটাবেন না। আপনি নিশ্চয়ই মনে মনে স্বীকার করছেন, আমি আপনার সব অভিসন্ধি জেনে ফেলেছি। আপনি এখনও সাবধান হন।'

'আপনার এই উপদেশের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলি, আপনার উপদেশের কোন প্রয়োজনই ছিল না। আপনি রঙীন চোখে দেখেছেন ফ্রাউ বি। আপনার মন ভাবাবেগে উদ্দীপ্ত। আমার তো গোপন কিছুই নেই, আমি যা করি প্রকাশ্যেই করি। তার কারণ আমি সাংবাদিক। এই সময়ে সাংবাদিকের কি কর্তব্য, সে-সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা নেই।'

ফ্রাউ বি উত্তেজিত হয়ে উঠল : 'হুঁ, এই রকম সময়ে সাংবাদিকের কর্তব্য হচ্ছে, একজন কমিউনিস্টের সঙ্গে বার্টেলস্‌মানের ছাপাখানায় গিয়ে তাকে বে-আইনী কাগজপত্র ছাপাতে কৌশলে বাধ্য করা!—কি, শুনছেন তো ?'

কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। পাশের কোন এক টেবিল থেকে কে যেন পরিচারককে ডাকল। স্বর শুনে চিনতে পারলাম। পরিচারক এল, অটো কফির দাম চুকিয়ে দিয়ে বিদায় নিল। অটো কফির যা দাম দিল তা তার এক সপ্তাহের খরচ।

'কি, চুপ ক'রে রইলেন যে ?' ফ্রাউ বি বিদ্রূপভরে বলে উঠল।

উত্তর দিলাম না। নাচ দেখতে লাগলাম। মনে মনে বললাম; 'মাথা ঠাণ্ডা হোক্, তারপর দেবো উত্তর।'

ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। নানা প্রশ্ন ভিড় ক'রে এল। প্রথমে ভাবলাম, বার্টেলস্‌মানের ওখানে আমি গিয়েছিলাম, একথা স্বীকার করতে আমার বাধা নেই। সাংবাদিক হিসেবে ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা কি অপরাধ ? না, এই অবস্থায় ও-কথা বলা উচিত হবে না। কমিউনিস্টদের সঙ্গে আমার যোগসূত্রের কথা স্বীকার করলে আমার বিপদ আরো বাড়বে। তার ফল হবে, ব্রাউন হাউসে আমাকে হাজির হতে হবে। সেখানে চলবে জেরা আর নির্যাতন। এখন একমাত্র উপায় মিছে কথা বলা। এ মিছে কথা তো রঙে ছোপানো নয়—এ এক চাল, শঠে শাঠ্যং নীতি, এতে বিবেকের ফোঁড় খেতে হয় না। কিন্তু ওরা যদি বার্টেলস্‌মানকে এনে হাজির করে তখন আমি কি করব ? সাফ অস্বীকার করতে হবে তো ? তাতে কি সুবিধে হবে ?

'আমি আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি,' ফ্রাউ বি বলল। তার স্বরে

ফুটে উঠেছে কোমলতা। আপনি সাফ অস্বীকার করবেন, বলবেন, বার্টেলস্মানকে আপনি কখনও চোখেও দেখেন নি। সে তখন কি করবে? তার তো কোন সাক্ষী নেই। হাঁ, তারা বার্টেলস্মানকে ডেকে এনে আপনার সামনে হাজির করতে পারে বটে। তখন মিছে কথা বলবেন। অনেক কটু কথা আপনাকে শুনিয়েছি, সে-সব ভুলে যান। অভিনেত্রী কিনা, হিষ্টিরিয়া চর্চা না করলে অভিনয় জমে না। আপনি আমার পরম বন্ধুর বন্ধু। আপনার অপকার কি আমি করতে পারি? আপনি কবে বার্টেলস্মানের ছাপাখানায় গিয়েছিলেন বলুন তো? যাক্, আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আমি বলব, আপনি সেদিন আমার সঙ্গে ছিলেন, কোথাও যাননি। আচ্ছা কখন গিয়েছিলেন—রাতে নাকি?'

চুপ ক'রে রইলাম।

'তা'হলে আমার কথা মতই কাজ করছেন তো?'

ভাবলাম এবার জার্মানী থেকে পালাব কিনা। আমি তো ডুবতে বসেছি। ফ্রাউ বি আমাকে ফাঁদে ফেলেছে। হয়তো বাইরে গোয়েন্দা পুলিশ আমারই জন্য অপেক্ষা করছে।

ফ্রাউ বি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল: 'ভাবছেন তো? হাঁ হাঁ, ভাবুন! দেখুন, কিছু উপায় খুঁজে পান কিনা।'

ফ্রাউ বি অভিনেত্রী, হাস্যোচ্ছলা যুবতী। তার উজ্জ্বল দু'টি চোখ—সত্যিই সে সুন্দরী।

কিন্তু সৌন্দর্যরসিক হলে তো এখন চলবে না। সময় চাই—ভেবে বার করতে হবে ওর প্রশ্নের উত্তর, সময় চাই।

শুনতে পেলাম আমি বলছি: 'আপনি বার্টলস্মান সম্বন্ধে অনেক কথাই তো বলে গেলেন। হাঁ, লোকটার নাম আমি জানি, চেনাও আছে। তার ছাপাখানায় আমার চিঠির কাগজ বহুবার ছাপিয়েছি। কিন্তু আপনি কি বলছিলেন তখন? আপনার সঙ্গে কোন সন্ধ্যায় একটা হোটেলে বসে পান-ভোজন করার কথা তো? সে তো আমার সৌভাগ্য, আমি আপনার জন্য সবকিছু করতে পারি।'

'বেশ! আপনি রাজী তো?' ফ্রাউ বি খুশি হয়ে বলে উঠল।

মেয়েটি এখনো আনাড়ি, সবে পাঠ নিয়েছে। প্রকাশ্যে বললাম: 'আপনার জন্য যা বলবেন, তাই-ই স্বীকার করব। একজন ভদ্রমহিলা, তার উপর তিনি যদি সুন্দরী হন, তাঁর আদেশ···আচ্ছা, আপনি আমাকে এবার যা যা শিখিয়ে দেবার দিন তো? আমি আপনার হয়ে যে-কোন ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলতে রাজী—'

'আমার হয়ে! কি বলছেন আপনি!' ফ্রাউ বি উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'আপনি কি তামাসা পেয়েছেন?'

'আপনি তো তাই বললেন—'

'নির্বোধ! নির্বোধ! আমার জন্য? হাসি-ঠাট্টা নয়, আপনার প্রাণ নিয়ে টানাটানি।'

ফ্রাউ বি আবার সমস্ত ব্যাপারটা বলে গেল। দেখলাম, হার্বার্টের চোখ দিয়ে জল ঝরছে। ট্যাঙোর সুর বাজছে, চারদিকে গোলাপী আলো। আর আমার উপায় নেই।

তার পরে যা ঘটল, সেকথা তো জীবনে ভুলব না। দ্রুততালে ঘটে গেল ঘটনা।

মারিচেন এবার এসে ঢুকল। অদ্ভুত তার পোষাক। চলচ্চিত্রের কাউণ্টেসদের মত তার কথা বলার ভঙ্গী। সে এসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। তারপর হার্বার্ট আর ফ্রাউ বি'র দিকে চেয়ে হেসে বললে: 'ওঃ, এঁরাই সেই বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী?'

ফ্রাউ বি করমর্দন ক'রে বলল: 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধন্য হলাম।'

মারিচেন আমাদের টেবিলেই বসে পড়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল: 'আমি জানতুম, এখানেই তোমার দেখা পাব। তোমার মত ভবঘুরে ঈগলের তো আর বাড়িতে দেখা মেলে না!' চুপ ক'রে রইলাম। সে আবার বলল: 'গতকাল সোমবার ছিল, সে-কথা বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিলে?'

এবার বোঝা গেল, অটো মারিচেনকে পাঠিয়েছে। কিন্তু অটো কি আর লোক পেল না? যে-কোন মুহূর্তে সে—

'প্রতি সোমবার আমি বন্ধু-বান্ধবদের পার্টি দিয়ে থাকি,' ফ্রাউ বি-কে বলল মারিচেন: 'হাঁ, প্রতি সোমবার, বছরের পর বছর ধরে তার ব্যতিক্রম হয় নি। আমার বুদ্ধিজীবী বন্ধুরা আসেন; খাওয়া-দাওয়া হয়, তারপর শুরু হয় প্রেততত্ত্ব নিয়ে আলোচনা। হাঁ হাঁ, প্রেততত্ত্ব নিয়ে আলোচনা, বয়—' মারিচেন পরিচারককে ব্রাণ্ডি আনতে হুকুম দিল।

আমি তাকে বাধা দিলাম: 'না, না, ব্রাণ্ডি নয়। বয়, নেবু দিয়ে চা তৈরি ক'রে নিয়ে এস।'

'বেশ, তাই হোক্।' তারপর ফ্রাউ বি'র দিকে তাকিয়ে মারিচেন বলল: 'আপনার বুঝি ওসব খেয়াল নেই?' ফ্রাউ বি মাথা নাড়ল। 'প্রতি সোমবার

আমার এই বন্ধুটি এসে এই আলোচনায় যোগ দেন, কিন্তু কাল ওঁকে দেখতে পাই নি। অথচ ওঁর অনুপস্থিতি এই প্রথম। তাই মনে ভাবনা হচ্ছিল। যাক্, তোমাকে বহাল তবিয়তে দেখে খুশিই হলাম!'

হার্বার্ট এতক্ষণ চুপ করেছিল, এবার বলল: 'প্রেততত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করার ওঁর সময় কোথায়? রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়েই উনি মেতে আছেন। আর এখন তো তারই মরশুম লেগেছে। এই দেখুন না, এইমাত্র ঐ ব্যাপার নিয়েই আলোচনা চলছিল।'

আমি কথাটা এড়িয়ে যাবার ভান করলাম। মারিচেনের দিকে তাকিয়ে বললাম: 'কেমন কাটল গতকাল সন্ধ্যেবেলা?'

'তুমি ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাচ্ছ কেন?' হার্বার্ট বলল: 'বল, আমরা শুনতে চাই। কবে ঘটল কাণ্ডটা?' সেও অভিনয় করছে। ফ্রাউ বি'র দিকে তাকিয়ে বললে: 'তোমার তারিখটা মনে আছে?'

'গত সোমবারের আগের সোমবার,' ফ্রাউ বি উত্তর দিল। সে বুঝি অসতর্ক হয়েই বলে ফেলল। বুদ্ধিমতী মেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই বুঝল তার ভুল হয়ে গেছে।

'গত সপ্তাহের সোমবারে তো?' মারিচেন বলল: 'হাঁ হাঁ, সত্যিই একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল। সেদিনকার কথা নিয়েই তো কাল আমাদের আলোচনা হলো। আহা, ও কাল ছিল না বলে তাইতো আমাদের আলোচনাটা জমল না।'

কয়েক মুহূর্তের বিরতি, জোড়ায় জোড়ায় তরুণ-তরুণী আমাদের সামনে নাচছে; ঢেউয়ের মত ধেয়ে আসছে আবার চলে যাচ্ছে।

ফ্রাউ বি'র স্বর এবার শোনা গেল, সে মারিচেনকে উদ্দেশ্য ক'রে বলছে: 'আপনাকে আমি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই; যদি প্রয়োজন হয় আপনি কি শপথ ক'রে বলতে পারবেন গত সপ্তাহের সোমবারে আমাদের বন্ধুটি আপনার সঙ্গে ছিলেন? সেখানে কি আর কেউ ছিলেন? কতক্ষণ ছিলেন উনি?'

মারিচেন খিলখিল ক'রে হেসে উঠল: 'আপনি শেষে আমার মত বুড়ীকেও ঈর্ষা করতে শুরু করলেন? তবে দরকার হলে আমি হলফ ক'রে বলব, উনি আমারই সঙ্গে সোমবারটা কাটিয়ে ছিলেন। এমনি প্রতি সোমবারেই উনি বছরের পর বছর আমার বাড়িতে হাজরে দেন! তবে কালকের সোমবারটাই বাদ গেছে। কেন তা জানি না। হয়তো—'

'অন্য কোন অতিথি সেখানে ছিলেন?' ফ্রাউ বি অত্যন্ত অভদ্রভাবে জিজ্ঞেস ক'রে বসল।

'ছিলেন বই কি! আপনি এত অস্থির হয়ে উঠেছেন কেন? আমার মত বুড়ীর সঙ্গে কেউ কি আর একা বসে গল্প করতে চায়? ছিলেন, আরো পাঁচজন অতিথি ছিলেন। তাঁরা ডিনারের পরে চলে যান। আমার মত আয়ে পাঁচজন অতিথিকে সামলানো দায়, কিন্তু তবু বন্ধুত্বের খাতিরে সামলাতেই হয়।'

'ডিনার শুরু হয় কখন?'

'ওঃ, আপনি দেখছি সব খুঁটিয়ে জানতে চান? বেশ তো, আমার আপত্তি নেই! বলুন, কি জানতে চান? কখন আমরা ডিনার শুরু করলাম? তা ন'টা হবে। অন্যান্য অতিথিরা সাড়ে দশটায় এলেন, তারপর প্রেতচক্র বসল, ঠিক দুপুর রাতে এলেন আমাদের অশরীরী অতিথি।'

'দুপুর রাত পর্যন্ত উনি ছিলেন?'

'ছিলেন বই কি, খুকুমুণি আমার!'

'আপনি আমাকে খুকুমুণি বলবেন না।'

'আহা খুকুর নার্ভ এত দুর্বল!—এ তো ভাল কথা নয়!'

ফ্রাউ বি হঠাৎ উঠে পড়ল: 'আমাকে ক্ষমা করবেন, সন্ধ্যায় অভিনয় করেছি মাথাটা ধরে আছে। থাক থাক হার্বার্ট, আমাকে আজ আর বাড়ি পৌছে দিতে হবে না—' আমাদের কোন সম্ভাষণ না জানিয়েই সে বেরিয়ে গেল।

আমরা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলাম; প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল, কিন্তু কারো মুখে কথা নেই। মারিচেন অবশেষে বলল: 'কেমন বুড়ী কাউণ্টেসের অভিনয় করলাম, একটু তারিফও করলেন না? বুড়ী হলেও বুদ্ধিতে মরচে ধরে নি। একেবারে বোকা বনে যাই নি!'

হার্বার্ট আর আমি এবার মারিচেনকে চুপ করতে বললাম। হাতের দস্তানা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে বেশ খানিকটা ব্রাণ্ডির ফরমায়েস দিলাম। মারিচেন খুশি হয়ে গেল।

আমরা মারিচেনকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। পথ জনবিরল; তবু পেছন তাকিয়ে বারবার দেখছিলাম, কেউ আমাদের অনুসরণ করছে কিনা। এবার আমরা এসে পৌছলাম কমিউনিস্টদের ছোট্ট রেস্তরাঁটায়।

সবাই জানে। মারিচেনকে কাউণ্টেসের বেশে দেখে চিৎকার জুড়ে দিল। এখানে বসে বহুক্ষণ পানভোজন আর গল্প চলল। কিন্তু অটোর দেখা নেই। মারিচেনকে পাঠিয়ে দেয়ার সময় বলেছিল: আমাদের জন্য সে এইখানে অপেক্ষা করবে।

রাতে বিছানায় শুয়ে সমস্ত ব্যাপারটা একবার ভাল ক'রে খতিয়ে দেখলাম।

ওরা বার্টেলস্মানের ছাপাখানায় বে-আইনী কাগজপত্র পেয়েছে, এবার নিশ্চয়ই হামবুর্গের প্রতিটি প্রেসে খানাতল্লাসি শুরু হবে। বার্টেলস্মানকে জিজ্ঞেস ক'রে যারা কাগজ ছাপাতে এসেছিল, তাদের চেহারার বর্ণনা ওরা নিশ্চয়ই পেয়েছে। না হ'লে আমাকে সনাক্ত করল কি ক'রে? আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য ওরা ফ্রাউ বি'কে পাঠিয়েছিল। এসব ব্যাপারে সে আনাড়ি বলে খুব ধাপ্পা দিয়ে এড়িয়ে গেছি। কিন্তু এখনও ভয় আছে।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, হয়তো আর মুহূর্ত পরেই ভাবনার উপর ঘুমের স্রোত বয়ে যাবে। এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল।

'আমি কাইসার, গোয়েন্দা বিভাগ থেকে বলছি।'

'কি ব্যাপার?'

'শুভরাত্রি! আপনাকে এত রাতে বিরক্ত করছি বলে দুঃখিত। কিন্তু কেন ফোন করছি শুনলে আশা করি ক্ষমা করবেন। একটা খুন হয়েছে; রাজনীতির সঙ্গে তার যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। আমার যতদূর মনে হয়, হামবুর্গে বোধহয় এই প্রথম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড।'

'হের কাইসার, আমি বড়ই দুঃখিত। আপনার কাছ থেকে খবর আমি চাই না। পুলিশ প্রেস বিভাগ থেকে খবরটা আমি কাল জেনে নেব।'

'আপনার কথা শুনে বড় দুঃখিত হলাম। জানিনা, কেন আপনি আমার উপর বিরূপ। শুনুন, আমি আপনাকে জবর খবর দিচ্ছি, যাকে বলে "স্কুপ" —তাই।'

'ব্যাপারটা কি?'

'ভয়ানক ব্যাপার। একটিবার চলে আসুন না! বেশি দূর নয়। আমি গ্রস ব্লাইস-এ আছি।'

'দশমিনিটের ভিতরেই আসছি; কিন্তু একা আসব না। সেকথা নিশ্চয়ই আপনি জানেন।'

'হা ঈশ্বর! এখনও আমাকে সন্দেহ! আপনার সহযোগীরা যাতে খবরটা আগে না পায়, তারই ব্যবস্থা করলাম আমি আর—'

'আচ্ছা, একাই আসছি। কিন্তু আসার আগে আমি শুধু খবরটা বিদেশী সংবাদপত্রের আমার কোন সবযোগীকে জানাতে চাই। কোথাও যেতে হ'লে এই আমার নিয়ম। না, না, ফোনে নয় হের কাইসার, দশমিনিটের ভিতরই আসছি।'

রিসিভারটা রেখে দিলাম ; মাথা ঠিক রাখতে হবে। এসেন-এ এমনি এক সংবাদদাতাকে গোয়েন্দা বিভাগ থেকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, সে-খবর আমি জানি। তার আর কোন সন্ধানই মেলে নি। সুতরাং আট-ঘাট বেঁধেই কাজে নামতে হবে।

পোষাক পরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, বোধহয় কাইসারের গুপ্তচর। আমি আর দেরি না ক'রে সাধারণের ব্যবহৃত টেলিফোন বক্সে ঢুকে ডুটো ফোন করলাম, ইয়াঙ্কী আর সুইস্ সহকর্মীকে। এবার নিশ্চিন্ত। এখন হের কাইসারের ওখানে যাওয়া যেতে পারে।

বোঝা গেল, কাইসারের আপাতত কোন দুরভিসন্ধি নেই। নইলে ফোনে সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করাই সম্ভব হতো না। কিন্তু তবুও সন্দেহ গেল না। ভয়ে ভয়ে—গ্রস ব্লাইস-এর ঠিকানায় এসে পৌঁছলাম।

রাত দুপুর, পথ জনহীন, বন্ধ-শার্সি অন্ধকার বাড়িগুলো। কিন্তু এ-বাড়িতে আলো জ্বলছে, লোকের গোলমাল। খবর পেয়ে হের কাইসার আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল। আমরা এলাম যে ঘরে খুন হয়েছে সেখানে। মেঝেয় পড়ে আছে লোকটা, কপালে গুলি লেগেছে ; মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত।

'লোকটার নাম ট্রালোউ,' কাইসার বললে।

নোটবই বার ক'রে পেন্সিল দিয়ে খানিকটা হিজিবিজি কাটলাম। এমন বিশেষ কোন খবর নয় যে নোট রাখা দরকার। কাইসার আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। কি চায় সে?

'কমিউনিস্টরা ওকে খুন করেছে,' সে বলল: 'গরিব বেচারা, আমাদের গোয়েন্দা ছিল, ওকে ছেড়ে দিলেই বা কি ক্ষতি ছিল? কিন্তু কমিউনিস্টরা দল ছেড়ে-যাওয়া লোকদের রেহাই দিতে রাজী নয়।'

'আমার তো মনে হয়, কে দল ছেড়ে দিচ্ছে, না-দিচ্ছে তা নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় না।—' এবার আমি উত্তর দিলাম : 'কিন্তু যদি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে, যাদের সঙ্গে লড়াই করেছে তাদের যদি বিকিয়ে দিতে চায়, হের কাইসার—'

কাইসারের ঠোঁট নড়ে উঠল ; কি যেন সে বলতে চায়। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস ক'রে বলল : 'আমি জানি, আমি জানি, আমাকেও ওরা—তার আগে যদি আমিই—কি বলেন আপনি?' কাইসার আর বলতে পারল না।

খুন-হওয়া লোকটি পড়ে আছে। স্থির ক্ষত থেকে আর রক্ত নিস্রাব হচ্ছে

না। কাইসারের দিকে তাকালাম। তেমনি ফ্যাকাশে তার মুখ, থরথর ক'রে বুঝি বা কাঁপছে।

আমি এবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম। হঠাৎ দপ্ ক'রে বাতিগুলো নিবে গেল। অন্ধকার। নিশ্বাস বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। এ যেন এক প্রতীক্ষা—দীর্ঘ প্রতীক্ষা। অন্ধকারে এখুনি পড়বে আততায়ীর আঘাত।

না, কিছুই তো ঘটল না। দেশলাই জ্বালালাম। তারপর সুইচবোর্ডের কাছে গিয়ে টিপে দিলাম সুইচটা। আবার জ্বলে উঠল সিঁড়ির নিঃসঙ্গ আলোটা, কিন্তু তার স্থায়িত্ব তো ক্ষণিকের, আবারও নিবে গেল, আমি ছুটে নেমে এলাম। জনহীন পথ। আস্তে আস্তে নেমে পথে এসে দাঁড়ালাম। আমার পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে নিস্তব্ধতায়। শুধু কি তাই? পেছনে কে যেন আসছে। ফিরে তাকালাম। ম্যাক্স। কি যেন ভাবছে সে। আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। তারপর মিলিয়ে গেল ঐ মৃত্যুপুরীর গহ্বরে। বাড়ি ফিরে এসে আবার গা এলিয়ে দিলাম বিছানায়। মনে হলো এবার পালাতে হবে আমার পিতৃভুমি ছেড়ে—যে-কোন দেশে পালিয়ে যেতে হবে।

দেওয়ালপঞ্জীর পাতাটার উপর নজর পড়ল।

আজ ২৮শে মার্চ।

।। দশ ।।

অটো এসে উঠেছে গ্রিণ্ডেলহউ পাড়ার একটা বাড়িতে। এ বাড়ির মালিক এক বিধবা। স্বামী ইন্সিওরেন্সে কাজ করতেন। তাঁর একটি মেয়ে আছে; সে ইস্কুলে পড়ায়। মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হয় নি ব'লে ছেড়ে এসেছে। অটো এখানে পরিচয় দিয়েছে, এক চিনি আমদানির সওদাগরি অফিসে কাজ করে। দাড়ি রেখে চশমা প'রে ভোলও পাল্টে ফেলেছে। হামবুর্গের উচ্চারণে এখন আর সে কথা বলে না, তার উচ্চারণেও পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন তার স্ত্রী আর শ্যালকের জন্য; তারা এখন তাকে পথে দেখেও চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ। ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে তার কয়েকবার দেখা হয়েছে এবং সে বার বার আমাকে সাবধান ক'রে দিয়েছে, আমি যেন পয়লা এপ্রিল খুব সতর্ক থাকি। হিটলার গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেছে, পয়লা এপ্রিল ইহুদী-বর্জনের দিন।

সেই পয়লা এপ্রিল এল। কিন্তু সেদিনকার ঘটনা বর্ণনা করতে আমি পারব না। সেদিন নয়া-জার্মানীর নব্যন্যায়ে চোলাই-করা নির্যাতনের নমুনা দেখতে পেল মানুষ। লৌহকঠিন, বিসমার্কের অধিনায়কত্ব নির্যাতনের এ পরিকল্পনা কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি, কাইসারী শাসন-ব্যবস্থাও যা ভাবেনি, যা ছিল অতীতের বাইবেল-বর্ণিত গল্প—সেই গল্পকে নতুন ক'রে রূপ দিল জাতীয়-সমাজতন্ত্রী নাৎসীরা। পিতৃভূমির জন্য যারা যুগে যুগে প্রাণ দিয়েছে, যারা তাকে সংস্কৃতির গৌরবে গৌরবান্বিত করেছে, তারাই সেদিন হলো জাতিচ্যুত, নির্যাতিত। তাদের সে-কাহিনী অগ্নিবর্ণে লেখা রইল জার্মানীর বুকে, সেখান থেকে উঠবে প্রতিশোধোন্মত্ত চিৎকার; আর সে-চিৎকারে কেঁপে উঠবে হিটলারী মসনদ। সেদিন কবে আসবে? বোধহয় সেদিন বেশি দূরে নয়।

পয়লা এপ্রিল সন্ধ্যেয় ভাক্টমান-এর নৃত্যশালায় ঝঞ্ঝাবাহিনীর উৎসব। আমার সেখানে যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অটো আমাকে যেতে বারণ করল। হার্বার্ট, অটো আর একজন পুরোনো সাথী পার্টির তিনটি মেয়ে নিয়ে সে-উৎসবে যোগ দিতে গেল। ডিউক আগে থেকেই টিকিটের বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছিল, তাই তারা নিরাপদেই ভিতরে গিয়ে পৌছল। অটো আর হার্বার্ট উৎসবে যোগ দিয়ে নাচল, একটু-আধটু সৌখিন প্রেমের অভিনয়ও করল। প্রায় দুপুর রাতে তাদের দলে এসে যোগ দিল ফ্রাউ বি। ফ্রাউ বি'র সঙ্গে ইদানীং হার্বার্টের বহু বাক্‌বিতণ্ডা হয়ে গেছে রাজনৈতিক মতামত নিয়ে। পরস্পরকে তারা ভালোবাসে, তাই ঘৃণাও দেখা দিয়েছে প্রবলভাবে। তারা একজন আর-একজনকে নিজের মতে আনবার বহু চেষ্টা করেছে, কখন কখনও কেঁদেছে, কিন্তু কেউ কাউকে টলাতে পারে নি। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার! এখানে হাসির সঙ্গে আছে দুঃখের রেশ, তারাও একথা বোঝে। কিন্তু উপায় কি? উপায় নেই বলেই তো ভালোবাসাকে ক্ষণে ক্ষণে আচ্ছন্ন ক'রে দেয় ঘৃণা, এ ওকে পার্টির ভাষায় গালাগাল দেয়।

ফ্রাউ বি হার্বার্টকে উৎসবে দেখেই চিৎকার ক'রে উঠল: 'গোয়েন্দা!' অটো আমাকে এই ঘটনাটা পরে বলেছিল। হার্বার্ট কিছু বলতে পারল না, ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রাউ বি এবার বুঝতে পারল, কি সর্বনাশ সে করেছে। সে হার্বার্টের গলা জড়িয়ে ধরে তার কাছে ক্ষমা চাইল। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। চারদিক থেকে নাৎসীরা এসে জড় হয়েছে। হার্বার্ট একটি কথাও বলল না। তার মুখে মৃত্যুর ম্লানিমা।

কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণই মিলল না। কিন্তু তবু বিচারসভা বসল। বিচারের সময় ফ্রাউ বি বলল, গুপ্তচর বলতে সে সাধারণ গুপ্তচর বোঝায় নি, সে তার প্রেমিকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছিল, প্রেমিক তার একান্ত নিজস্ব খবরগুলো পর্যন্ত জেনে ফেলেছে। এই মামলায় কাইসার ছিল একজন সাক্ষী। সে বিচারকের কানে কানে কি বলল। বিচারক হার্বার্টকে মুক্তি দিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বললেন: 'আসামীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আছে বলেই তিনি তাকে কড়া পাহারায় রাখবার আদেশ দিচ্ছেন।'

হার্বার্টকে ভিট্‌মুর-এর বন্দিশিবিরে পাঠান হলো।

হার্বার্টের সম্পর্কে আমি ম্যাক্সের সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করলাম। সে এখন ঝঞ্ঝাবাহিনীর একজন ছোটখাটো নেতা। তার সেই ঢিলেঢালা বেঢপ পোষাক নেই, গায়ে এখন চাপিয়েছে নেতার উর্দি। কিন্তু এখনো তেমনি নোংরা, তেমনি ভয়ে ভয়ে কথা বলে। কারো মুখের দিকে তাকাবার সাহস নেই। দেখা ক'রে ম্যাক্সকে হার্বার্টের কথা বললাম।

'আমি হার্বার্টের জন্য কিছু করতে পারব না ; পারলেও করব না। আমাকে বলা বৃথা—,' ম্যাক্স স্পষ্ট জানিয়ে দিল: 'আমি একজন ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্ট, এই নীতির উপর আমার বিশ্বাস আছে। আপনারা যাঁরা আমাকে চেনেন, তাঁরা নিশ্চয়ই আমার এ কথা বিশ্বাস করবেন। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, সত্যিকারের রাজনীতি বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করে না, করে চরিত্রের দৃঢ়তার উপর। আমি তো বলেছি, আমি একজন নাৎসী। হার্বার্টের জন্য আমি কিছু করতে পারব না। কিন্তু নাৎসী দলে এসে আমি আমার পুরোনো কমরেডদের কাউকে ধরিয়ে দিই নি, দেবও না। তবে আমার কাছে কোন সাহায্য প্রত্যাশা করা বৃথা। বিশ্বাসঘাতকতা আমি করব না, তবে তারা যে শত্রু—একথা মনে করতে আমার কিছুমাত্র দ্বিধা নেই, স্বীকার করতে বাধা নেই। আপনার জন্য আমি কাজ করেছি, কিন্তু সে সম্পূর্ণ আপনারই খাতিরে। আপনাকে আমি কয়েকবার সতর্ক ক'রে দিয়েছি।'

'ও' তাহ'লে তুমিই সেদিন ফোন করেছিলে!'

'হাঁ আমিই, কিন্তু তারপরে অনুতাপ হয়েছে, কেন করলাম। আজ আর আমি কিছুই করতে পারব না, করব না।'

ম্যাক্সের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলাম কাইসারের কাছে।

সে বলল: 'আপনার অনুরোধ রাখতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু উপায়

নেই। হার্বার্ট যুব-সোশ্যালিস্ট পার্টির লোক। সে ছাড়া পেলে তাদের হয়েই কাজ করবে, একথা বোধহয় আপনি অস্বীকার করবেন না। ভিট্‌মুর-এ সে ভালই আছে। তারপর ফ্রাউ বি'র সম্বন্ধেও আমাদের ভাবতে হবে। সে কাজ ভালই করছে। হার্বার্ট তার প্রেমিক, সে তাকেই ধরিয়ে দিয়েছে, এতে সে যে খাঁটি নাৎসী, তারই পরিচয় পাওয়া যায়। এখন হার্বার্টকে ছেড়ে দিলে ফ্রাউ বি'র প্রতি অবিচারই করা হবে। এমন অবস্থায় আপনিই বিচার ক'রে দেখুন, আমি কিছু করতে পারি কিনা!'

হার্বার্ট সম্বন্ধে খবর পেলাম তার মৃত্যুর অনেক পরে। তাকে বাইরের কাজ দেওয়া হয়েছিল। তার তাতে কোন নালিশ ছিল না। তাকে বাঁধ বাঁধার কাজ প্রথম দেয়া হয়। তার গায়ে ছিল জোর, কাজ করতে তাকে বিন্দুমাত্র অসুবিধে ভোগ করতে হয় নি। মে মাসে যখন হামবুর্গের ঝঞ্ঝাবাহিনীদের বদলে লুনেবুর্গের একদল ধাড়ী বদমাশদের শিবির-রক্ষী নিযুক্ত করা হলো, তখন হার্বার্টকে বদলি করা হলো রন্ধনশালায়। চমৎকার দেখতে ছিল সে। এই সব অসভ্য বদমাশরা কি ক'রে তাদের লালসা-প্রবৃত্তি তার উপর চরিতার্থ করেছিল তার কদর্য কাহিনী এসে পৌঁছেছিল আমাদের কাছে বহু পরে। সে-কাহিনী ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। মানুষের মনের গহনে যে পাপ-বোধ থাকে, অস্বাভাবিক সমাজ-ব্যবস্থা যার জন্ম দেয়, যাকে লালন-পালন করে, তারই চরম নিদর্শন পেয়ে সেদিন আমরা শিউরে উঠেছিলাম। হার্বার্ট হয়েছিল সেই বিকৃত যৌন-লালসার শিকার। এমনি কত শিকার সেদিন জার্মানীতে বলি পড়েছিল তার ঠিক নেই···নাৎসী সরকার পর্যন্ত এই বিকৃত অত্যাচারের খবর পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তাই তারা লুনেবুর্গের শিবির ভেঙে দিল, কিন্তু হার্বার্ট মুক্তি পেল না। সে তখন উন্মাদ হয়ে গেছে। তারপর তার খবর জানি না। কী আর খবর জানবার ছিল! তৃতীয় রাইখের কোন অভিশপ্ত পাগলা গারদে তার শেষ দিন কটা কেটে গেছে। তার বেশি আর কোন খবর তার থাকতে পারে না। হার্বার্টরা তো এমনি করেই সেদিন মৃত্যু বরণ করেছে।

মে মাসের শেষ দিকে ফ্রাউ বি সাতজন্ অভিনেতাদের সঙ্গে বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টিতে এসে যোগ দিল। হার্বার্টের সঙ্গে একই বন্দিশিবিরে ছিল, এমন দু'জন বন্দীর স্ত্রীরাও দলে এল। তারাই হার্বার্টের শেষ কথা ফ্রাউ বি'কে জানায়। উন্মাদ হার্বার্ট তার প্রেমিকাকে তাদের মারফৎ শেষ সম্ভাষণ জানিয়েছিল।

জনের সঙ্গে বহুদিন দেখা হয় নি। আর এতদিন তার খোঁজ খবর নেওয়ারও সময় ছিল না। তখন সবাই নিজের ভাবনা নিয়েই অস্থির। তাছাড়া সর্বত্র নতুন নতুন মুখ দেখা দিয়েছে যাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। নাৎসীরা কমিউনিস্টদের পথ ধরেছে! গোয়েন্দা-বিভাগের হোম্‌রা-চোম্‌রাদের তখন আর পাত্তা নেই, তাদের জায়গায় দেখা দিয়েছে নতুন মুখ। শহরের পরিবেশই তখন বদলে গেছে। সামনে দেখা যাচ্ছে নতুন নাৎসী নেতাদের। তারা তরুণ। কাজে আনাড়ি। তবে নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে প্রখর ভাবে সজাগ। তাই দলে শুরু হয়েছে বিরোধ। কমিউনিস্ট পদ্ধতি নকল করেও নাৎসীরা কমিউনিস্টদের মতো সফল হতে পারছে না।

এপ্রিলের শেষে অপ্রত্যাশিতভাবে তার দেখা পেলাম। আমি ঝঞ্ঝাবাহিনীর সৈনিকের বেশে তাকে দেখলাম পথে। সে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম! ছুটলাম অটোর অফিসে। অটো আমার কথা শুনে হেসে বলল: 'জন কিছুদিন হলো ঝঞ্ঝাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে, বেচারার এখনো প্রমোশন হয়নি। তা টিকে থাকতে পারলে হবেই, নাৎসীরা গুণী লোকের কদর জানে।'

আমি অটোর কাছ থেকেই প্রথম খবর পেলাম, পার্টির আদেশে বহুলোক ঝঞ্ঝাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। জন তাদেরই একজন।

'ন্যাশনাল-স্যোশ্যালিজমের বিরুদ্ধে বিপ্লব,' অটো আমার দিকে তাকিয়ে বলল: [—১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাস তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আপনাদের সে-কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—] 'কখনও বাইরে থেকে সম্ভব হবে না। সে-চেষ্টা বৃথাই হবে। আমাদের বিপ্লব সার্থক হবে যদি আমরা সাধারণ ধর্মঘট চালাতে পারি—তাও শত্রুদের অস্ত্র-শক্তি ভেঙে দেয়ার পর। আমরা যে কর্মসূচী তৈরী করেছি, তাতে তাড়াতাড়ি কিছু হবার উপায় নেই, অনেক দেরি করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত জার্মান জাত বিশ্বাস করবে—হিটলার তার প্রতিজ্ঞা অনুসারে কাজ করতে পারে, হিটলার তাদের দিতে পারবে শান্তি, সমৃদ্ধি, ততদিন আমরা জাতির কাছ থেকে কোন সাহায্যই পাবো না। বিপ্লবের জয় হয় তখনই, যখন জনগণ পুরাতন মহাপুরুষের উপর বিশ্বাস হারিয়ে নতুনের দিকে ফিরে তাকায়—পৃথিবীর ইতিহাসের এই আইন কখনো রদ-বদল হবে না, হতে পারে না।'

অটো আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সে আরও কিছু বলতে চাইছে। আমি বুঝতে পারলাম, কি সে বলতে চায়। বললাম:

'ওরা ভাল আছে। পলা এখন বুঝতে পেরেছে, তোমার পথই একমাত্র পথ। সে তোমাকে জানিয়েছে সম্ভাষণ।'

'সে বুঝতে পেরেছে?'

'হাঁ, বন্ধু!'

কিন্তু পলা কিছুই বুঝছে পারে নি। অটোকে শুধু সান্ত্বনা দিলাম আমি। পরদিন বিকেলে পলার ওখানে গেলাম। সে চা খাচ্ছিল, আমাকে দেখে চমকে উঠল, কেঁপে উঠে কেঁদে ফেলল পলা।

তাকে হাত ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললাম:

'পলা, পলা কাঁদছ কেন? কি হয়েছে তোমার?'

কয়েক মুহূর্ত সে কথা বলতে পারল না, তারপর বিড়বিড় ক'রে বলল: 'প্রতিমুহূর্তে প্রতিক্ষণে আমার মনে হয় এই বুঝি আপনি দুঃসংবাদ নিয়ে এলেন হয়তো সে ধরা পড়েছে, নয়তো তাকে তারা হত্যা করেছে। প্রতি-মুহূর্তে আমার আশঙ্কা হয়—'

'পলা, এ তোমার নিছক পাগলামো। সাহসে বুক বাঁধো! তুমি না একজন পুরোনো বিপ্লবী! অটো বেশ আছে। সে তোমাকে জানিয়েছে তার ভালোবাসা। খোকাদের কথা জানতে চেয়েছে।'

'খোকারা?' পলা মৃদু স্বরে বলল: 'ওরা তো বিশেষ কিছুই বোঝে না, ভালই কাটছে ওদের। এইতো এইমাত্র বাড়ি ফিরেছে। বড় খোকা বললে—'

তারপর খোকাদের গল্পই করল পলা। কি দুঃসহ জীবন সে কাটাচ্ছে! এই কী বিপ্লবীর সহধর্মিনীর জীবন? আগেও জীবনে স্বচ্ছলতা ছিল না, আনন্দ ছিল না বটে, কিন্তু ছিল স্বামীর সাহচর্য; আজ শুধু শূন্যতা। কোথায় আছে স্বামী, সে তাও জানে না। সে এখানে একা, একেবারে একা। তার স্বামীই তো তার জীবন, তার জীবনের আলো, সে ছাড়া তো তার আর কেউ নেই। আর সেই স্বামীই আজ চলে গেছে, হয়তো অন্য শহরে সে বাসা বেঁধেছে। আমরা যে কথা ওকে বলেছিলাম ও সেই কথা বলেই ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলল।

হঠাৎ সে বলে উঠল: 'আমি একা বলেই আমার ভাই মাঝে মাঝে আসে। অটো তো এখানে নেই, ওর আর আসতে বাধা কি? আমার ছোট ভাই, আমি ওর দিদি। সময় সময় মনে হয়, যদি কম বয়েসী হতাম, অটো কি এমনি ক'রে ছেড়ে চলে যেতে পারত?'

'কি বলছ তুমি পাগলের মত!' আমি ওকে থামিয়ে দিলাম। একটু বা

রেগেই উঠলাম। অটো মানুষ হিসেবে সকলের চেয়ে বড়, পিতা হিসেবে তার জুড়ি মেলে না—স্বামী হিসেবেও সে অতুলনীয়। সেই অটোর বিরুদ্ধে কেমন ক'রে একথা বলল তার স্ত্রী? ওর ভাই আসা-যাওয়া করছে শুনেও আমি খুশি হতে পারলাম না, সে পলার মন অটোর উপর বুঝি বিরূপই ক'রে তুলেছে। পলা আমাকে জানাল, সে তার ভাইয়ের কাছে অনেক কথাই শুনেছে। শুনে বুঝলাম, এ ওর কথা নয়, ওর ভাই ওকে এই কথাই বুঝিয়েছে। সে ওকে বলেছে, অটো অন্য একটি মেয়েকে নিয়ে হামবুর্গের আর এক পাড়ায় আছে। পলার বয়েস হয়েছে, তাকে আর অটো চায় না। তাই আজ পলা নিজের বয়েসের উল্লেখ ক'রে অটোকে অবিশ্বাস করছে।

কিন্তু এ তার ভাইয়ের কীর্তিও নয়। ঝঞ্ঝাবাহিনীর কোনো নেতা পলা, অটো আর তার ভাইয়ের অদৃষ্ট নিয়ে জমিয়ে তুলেছে এক বিয়োগান্ত নাটক। যবনিকা কবে পড়বে কে জানে।

আমি পলার ওখান থেকে বেরিয়ে গেলাম অটোর কাছে। কিন্তু তার দেখা পেলাম না। ছ'দিন পর যখন দেখা পেলাম, তখন অনেক কিছু ঘটে গেছে।

সোমবার ২৪শে এপ্রিল। কয়েকটা জরুরী কাজের জন্য আমাকে বার্লিনে যেতে হলো। ট্রেনে রেস্তঁরা-কারে অভাবনীয় ব্যাপার ঘটল। জার্মানীতে প্রতি ট্রেনের রেস্তঁরা-কারে টেবিলে টেবিলে যে সংবাদপত্র দেয়া হয়, সেটি হচ্ছে 'মিত্রোপ সৎসাইটুঙ্'। সেদিন ঐ সংবাদপত্রের সঙ্গে একটি ক্রোড়পত্রও ছিল। এই ক্রোড়পত্রটি কৌতুহলোদ্দীপক, তার গুরুত্বও যথেষ্ট। যাত্রীরা টেবিলে বসে যখন সংখ্যাগুলো হাতে নিয়েছে, পরিচারকরা তখন টের পেল যে, প্রতিসংখ্যার ভিতরে একখানা ক'রে ক্রোড়পত্র আছে। এই ক্রোড়পত্রটি আট পৃষ্ঠা। প্রথম পাতা জুড়ে আছে একজন মৃতের ছবি। মৃত কথা কয় না, সে তো চিরতরে নীরব হয়ে গেছে! কিন্তু এই ছবি দেখে মনে হলো—সে যেন কথা কইছে। চিৎকার ক'রে উঠছে। জীবন্তের চেয়েও সে যেন জীবন্ত, তার চিৎকারে শুধু মানুষের বুকেই সাড়া জাগে না, পাথরও নড়ে নড়ে ওঠে।

যাত্রীরা কাগজ খুলে পড়ছে, এমন সময় পরিচারকদের দল এসে ক্রোড়পত্রগুলি চাইল। কিন্তু যাত্রীদের কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। পরিচারকরা ফিরে গেল। এবার এল প্রধান পরিচারক হাঁফাতে হাঁফাতে, সে ক্রোড়পত্র-গুলির জন্য অনুনয়-বিনয় করল। কিন্তু যাত্রীরা অসম্মত। শেষে পরিচারক

জানাল, ওগুলি পত্রিকার ভিতরে কারা কৌশলে পুরে দিয়েছে। কিন্তু ওগুলো ফিরিয়ে নেওয়া দরকার। প্রায় তিরিশ জন যাত্রীর মধ্যে তিন চার জন ফিরিয়ে দিল। অন্য সবাই অস্বীকার করল। তাদের মধ্যে একজন হোমরা-চোমরা রাজকর্মচারী, দু'তিন জন চঞ্চল তরুণী, আর ক'জন ঝঞ্ঝাবাহিনীর পদস্থ কর্মচারীও ছিল। তখন জার্মানীতে প্রেস-আইনের খুব কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। সংবাদপত্রগুলো তারই কবলে পড়ে ব্যতিব্যস্ত, সত্য সংবাদ প্রকাশ তাদের পক্ষে দুরুহ। অথচ জনগণ জানতে চায় সত্য খবর। তাই জার্মানীতে বিদেশী সংবাদ-পত্রের চাহিদা বেড়ে গেছে। সত্য জানতে চায় সবাই, শত্রুর মুখ থেকে জানতে পারলেও মনোরঞ্জন করতে পারছে না।

প্রধান পরিচারক চলে গেলে ঘণ্টা কয়েক ধরে প্রস্রাবখানায় যাত্রীদের যাতায়াত চলল। রাজপুরুষ, ঝঞ্ঝাবাহিনীর উপরওলা সদস্য, এমন কি বিলাসিনী দু'টি তরুণীও বাদ গেল না। সবাই সেখানে বসে পড়ে নিল নিষিদ্ধ ক্রোড়পত্র। আমিও গোপনে পড়লাম। ক্রোড়পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় এক জীবন্মৃতের একটা জীবন্ত ছবি। নাম, উইলি ডিয়েৰ্কসন—তরুণ শিল্পী। পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, সোশ্যালিস্টরা কোথায় অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে, তা বলতে হবে। কিন্তু শত নির্যাতনেও তার মুখ থেকে একটি কথা তারা বার করতে পারে নি। তার মৃত্যুর পর কফিন খুলে দেখতে বাবা-মাকে বারণ করা হয়। কিন্তু ভীত সন্ত্রস্ত বাবা-মা সে-কথা শুনলেও, যুব সোশ্যালিস্ট সঙ্ঘ সে-কথা শোনে নি। তারা তাদের হতভাগ্য কমরেডের ছবি তুলে সেই ছবিই এখানে ছাপিয়েছে। তার সেই তরুণ মুখখানি দেখলে আর চেনা যায় না। রক্ত জমে আছে, বিকৃত হয়ে গেছে মুখ, নাক থেঁতলে গেছে। মাথার খুলি ভাঙা। একজন একজন ক'রে যখন প্রস্রাবখানার বাইরে আসছিল, দেখলাম তাদের মুখ সাদা হয়ে গেছে। নাৎসীদের অপকীর্তি তাদের ভয়ার্ত ক'রে তুলেছে। কারো দিকে তাকাবার পর্যন্ত তাদের সাহস নেই।

এই গোপন সাহিত্য-প্রচারের সুফল ফলল। দেখতে দেখতে জার্মানীতে এমনি হাজার হাজার বে-আইনী সংবাদপত্র দেখা দিল। গোয়েরিং এবার এক আইন জারী করল: সে-আইন নয়, হত্যার নামান্তর মাত্র। হিটলার পর্যন্ত সে-দলিলে দু'মাস স্বাক্ষর করতে রাজী হয় নি। অবশেষে আইন জারি হলো: যদি কাউকে বে-আইনী পুস্তিকা প্রচার করতে দেখা যায়, তাকে তক্ষুণি গুলি করা হবে, এর জন্ম কোন বিচারের প্রয়োজন নেই।

প্রতি সপ্তাহে জার্মানীর তরুণরা জহ্লাদের হাতে প্রাণ দিল। তাদের একমাত্র অপরাধ, তারা ন্যাশন্যাল-সোশ্যালিজমকে আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করতে পারে নি। জার্মান রাইখের জহ্লাদ গ্রোয়েব্‌লার পদত্যাগ করল। সে বলল: 'স্নায়ুতন্ত্রের উপর এত অত্যাচার সহ্য করতে পারছি না।'

কিন্তু গোয়েরিং-এর স্নায়ুতন্ত্র তখনো দৃঢ়। চলল হত্যার উৎসব।

হামবুর্গে ফিরে এলাম। নিকলের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হতে লাগল। এখনও নিত্য-নতুন গাড়ি ভাড়া ক'রে সে তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। একদিন একটা মোড়ে তাকে ধরে ফেললাম। তখন ভিড়-নিয়ন্ত্রণের লাল আলো জ্বলে উঠেছিল। নইলে নিকলের দেখা পাওয়া সম্ভব হতো না। সে যা জোরে গাড়ি চালায়! পিছনের সিটে গগল্‌স্‌-আঁটা, ফার কোট-পরা আর-একজন লোককে দেখলাম। একটু লক্ষ্য করতেই চিনতে পারলাম, ভাণ্ডারলিক!

ওরা কি ক'রে মিললো কে জানে? এবার আলো হলদে, তারপর সবুজ হলো। নিকল কি যেন বলতে যাচ্ছিল, আমি তাড়াতাড়ি তার পাশে এসে দাঁড়ালাম। সে আমাকে গাড়িতে তুলে নিল। তারপর ছুটল গাড়ি। সেন্ট্রাল স্টেশনে এসে সে কুলিকে ডেকে গাড়ি থেকে প্যাকেট তুলে লাগেজ-অফিসে নিয়ে যেতে বলল। কুলিটা ফিরে এসে তার হাতে মালের রসিদ দিল। তারপর আরও দু'তিনটে প্যাকেট স্টেশনে পাঠানো হলো।

এবার আমরা এসে পড়লাম স্টেফান্‌স প্লাৎস-এর পথে। নিকল হেসে ভাণ্ডারলিককে বললে: 'সবগুলোর বিলিব্যবস্থা তো করলাম, এবার আমাদের এই বন্ধুটির ব্যবস্থা। ওকে এবার গলায় পাথর বেঁধে নদীতে ডুবিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্তি!'

'তা রাজী আছি! কিন্তু তার আগে তোমাকে বলতে হবে, কি ক'রে তুমি এই বে-আইনী কাগজপত্র পাঠাচ্ছো, কি করেই বা সেগুলো বিলি হচ্ছে।'

নিকল হাসল, কোন কথা বলল না। আমি অবশ্য কয়েক সপ্তাহ পরেই জানতে পারলাম নিকলের এই গুপ্ত প্রতিষ্ঠানের খবর।

একদিন সংবাদপত্রে দেখলাম, ভাণ্ডারলিক ধরা পড়েছে। আর তাকে ধরেছে সেই কাঠের পা-ওলা গোয়েন্দা হের মির।

সে এক চমকপ্রদ নাটকীয় কাহিনী। ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্ট গুপ্তচর

বিভাগের দপ্তরে একখানা বই আছে : সন্দেহজনক ব্যক্তিদের নাম-ধাম সেখানে লিখে রাখা হয়। গ্রেপ্তার করার মত সন্তোষজনক প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাদের গতিবিধির উপর থাকে গোয়েন্দা-পুলিশের কড়া নজর। ভাণ্ডারলিকের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় না। তাকে বিভিন্ন স্টেশন অঞ্চলে প্রায়ই দেখা যায়, একথা পুলিশ জানতে পেরেছিল। তাই পুলিশের ব্যক্তিগত সংবাদ-বিভাগের বড়কর্তা মির ছদ্মনামে রেলওয়েতে কাজ নিল। প্রথমে হলো সে টিকিট কলেক্টর, তারপর কুলি, তারপর সহকারী স্টেশন মাস্টার। তার বিশ্বাস ছিল যে, ভাণ্ডারলিকের স্টেশনে আসা-যাওয়ার রহস্যের সন্ধান সে এই উপায়েই পাবে।

দামতর স্টেশনে সেদিন মির কুলির কাজ করছে। এমন সময় একখানা ট্যাক্সি স্টেফান্‌স প্লাৎস্‌-এর দিক থেকে এসে স্টেশনে থামল। ট্যাক্সিতে দু'জন যুবক, তাদের সঙ্গে আছে একটা বিরাট স্যুটকেস। মির ছুটে গেল তাদের মাল তুলতে। বেচারী মির! ভারী বাক্স, প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি তার পিঠখানা ভেঙ্গে যায়। অনেক কষ্টে সে মাল তুলে দিল গাড়ীতে। এবার ভাড়া চুকিয়ে তাকে বিদায় ক'রে দেওয়া হলো। মির চলে গেল ট্রেনের গোসলখানায় তার পিঠের শুশ্রূষা করতে। কিন্তু তাই বলে নিজের কাজ সে ভুলে গেল না। সন্ধান যখন পেয়েছে, সহজে কি আর ছেড়ে দেবে? সে অন্য কামরায় উঠে নজর রাখল ওদের কামরার উপর। দু'ঘণ্টা পরে ট্রেন এসে থামল ভিটেনবুর্গ-এ। মির গাড়ী থেকে নেমে যুবক দু'টির কামরার দিকে ছুটে গেল। কোথায় তারা? শুধু বিরাট স্যুটকেসটা পড়ে আছে। মির তাড়াতাড়ি স্যুটকেসটা খুলে ফেলল। অস্ত্র-শস্ত্র তো দূরের কথা একখানা ইস্তাহারও নেই! বিরাট একখানা গ্রানাইট পাথর পড়ে আছে, তার উপর লাল রঙে লেখা—আমাদের প্রিয়তম গোয়েন্দা মিরকে সর্বহারাদের সঙ্গে হাত মেলানোর জন্য যুব কমিউনিস্ট সঙ্ঘ থেকে এই পুরস্কার দেয়া হলো!

মির ফিরে এল হামবুর্গে। কিন্তু কুলিদের মধ্যে তখন ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে। দেখা হলেই তাকে তারা ঠাট্টা করতে লাগল। তাই এবার সে কাজ নিল স্টের্ন শানজো স্টেশনে। প্লাটফর্মে একজন যাত্রীকে ট্রেন ছাড়বার ভুল সময় বলে এখানেও সে বাঁধাল বিপদ। যাত্রীটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে গিয়ে নালিস করলেন। মির-এর অমনি তলব পড়ল। মির স্টেশন মাস্টারের ঘরের দিকে যাচ্ছে, এমন সময় দেখতে পেল, ভাণ্ডারলিক ট্যাক্সিতে বসে একজন

কুলিকে একটা বাণ্ডিল লাগেজ করতে পাঠাচ্ছে। মির তখনই কিছু করল না। ভাণ্ডারলিকের দিকে শুধু রাখল নজর। কুলিটি চলে গেল।

এবার মির নেমে এল প্লাটফর্মের সিঁড়ি বেয়ে। এমন সময় কুলিটি টিকিট নিয়ে ফিরে এল। ভাণ্ডারলিক ট্যাক্সি থেকে ঝুঁকে পড়ে কুলিকে বকশিস দিচ্ছিল, মির তাকে চিনে ফেলল। এতক্ষণ ছিল দ্বিধা, সন্দেহ ; এবার সন্দেহ ভঞ্জন হলো। এ ভাণ্ডারলিকই বটে।

মির আর দেরী না ক'রে ট্যাক্সির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তার হাতে ছিল একটা রিভলভার। ভাণ্ডারলিক মাথার উপরে হাত তুলতে বাধ্য হলো। তার হাতের আঙুলগুলো একবার সে মুঠো করছিল, আর একবার খুলছিল। কুলিটি বুঝতে পারল তার সংকেত। মির এবার কুলিকে হুকুম দিল : 'আমি গোয়েন্দা। যা, প্যাকেটটা নিয়ে আয়।'

কুলি যো হুকুম বলে চলে গেল। ভাণ্ডারলিকের তখন ভয়ানক অবস্থা : তার কপাল বেয়ে দরদর ধারায় ঘাম ঝরছে। কুলিটা ফিরে এসে বললে : '১১-১০ ; ৩-১৫ ; ৯-২০। এক্সপ্রেস কিনা, বেশি লাগবে।'

মির চিৎকার ক'রে বলল : 'কি মাল পেলি ? জিনিসগুলো না পেলে আমি তোকে গ্রেপ্তার করব।'

কুলি তবু ভাণ্ডারলিকের আঙুলগুলোর দিকে তাকাল। তখনো সে একবার মুঠো করছে, আর একবার খুলছে আঙুলগুলো। এই সংকেতের মানে এই যে, প্রচুর টাকা সে পাবে। সে এবার মিরের দিকে ফিরে বলল : 'বুড়ো মানুষ পেয়ে আমাকে খুব শাসাচ্ছেন কর্তা। আমিও একজন গোয়েন্দা পুলিশের লোক। আমি তো আপনাকে বলছি, উনি আমাকে কোন জিনিসই দেন নি! শুধু হানোভারের ট্রেনের সময় জানতে চেয়েছিলেন। তা অত গালাগাল দেবেন না, আমি স্টেশন মাস্টারকে জানাতে বাধ্য হবো।'

মির এবার একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেল। হামবুর্গে সে নতুন, তাই ওদের হালচাল সম্বন্ধে সে ওয়াকিবহাল নয়। কুলির কথায় তার আর সন্দেহ রইল না। কিন্তু ভাণ্ডারলিককে সে ছাড়ল না। ভাণ্ডারলিকের বিরুদ্ধে কাইসারকে হত্যার চেষ্টার জন্য এক হুলিয়া বেরিয়েছিল। তার উপর, সে হচ্ছে যুব সোশ্যালিস্ট সঙ্ঘের একজন পাণ্ডা।

ভাণ্ডারলিক গ্রেপ্তার হলো বটে, কিন্তু পুলিশ তাকে বেশিদিন ধরে রাখতে পারে নি। ফুলসবুত্তের-এর বন্দীশিবিরে নিয়ে যাওয়ার পথে সে কিভাবে

পালাল সে-খবর জানতে পারি নি। সোশ্যালিস্ট যুব-সঙ্ঘ এ বিষয়ে নির্বাক রইল। যাক্, যে কোন উপায়ে হোক্, ভাণ্ডারলিক পালাল। গোপন ইস্তাহার বিলির ব্যাপার চলল পূর্ণমাত্রায়।

শেষ ধরা পড়বার আগেও কয়েকবার ভাণ্ডারলিকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ভাণ্ডারলিক ছিল অত্যন্ত লাজুক, মুখচোরা ছেলে। তাকে দেখে কেউ কোনদিন ধারণাও করতে পারে নি যে, তার ভিতরে একটা গোপন আন্দোলন চালাবার শক্তি লুকিয়ে আছে। অথচ হামবুর্গের গোপন আন্দোলনের সে ছিল প্রাণশক্তি। যখন ভাণ্ডারলিকের মত ছেলেদের পরিচয় পেয়েছি, আমার মনে হয়েছে, মজুর-আন্দোলনে নেতার কখনো অভাব হয় না। তার প্রয়োজন মত সে নেতা গড়ে নেয়। আন্দোলনের আগে সে নেতা প্রসব করে না বটে, কিন্তু সময় এলে বিন্দুমাত্র দেরিও তার হয় না।

।। এগারো ।।

পয়লা মে'র এক সপ্তাহ আগে খবর পেলাম, লাইপার্ট হামবুর্গে এসেছেন। ভূতপূর্ব সোশ্যালিস্ট ডেপুটি বিদেরমানকে তাই চিঠি লিখলাম, তিনি যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করার বন্দোবস্ত ক'রে দেন। আমি জানতাম, লাইপার্ট হামবুর্গে এলে তাঁর বাড়িতেই ওঠেন। দু'তিন দিন পর বিদেরমান-এর চিঠি এল। চিঠি পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। বিদেরমান লিখেছেন :

"একথা ভুলবেন না, আজ এই দুর্দিনেও আমি অস্বীকার করিনি যে, আমার যৌবনে আমি সোশ্যালিজমের জন্য যুদ্ধ করেছিলুম ; একথাও আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি যে, আমরা প্রবীণরা বহু ভুল করেছি। কেননা, বুড়োদের ভুল তো হবেই। আমরা ভুল করেছি এই যে, আমরা যুদ্ধ করার মত কোন মহান্ উদ্দেশ্যের হদিস পাইনি। দু'বছর আগে তাই আমি একদিন সোশ্যালিস্ট পার্টিকে জানিয়েছিলুম, বিজ্ঞতা পরিহার ক'রে আমাদের যুবকদের নেতৃত্ব স্বীকার ক'রে নেওয়া উচিত। আশা করি, সে-কথা আপনি ভুলে যান নি। আপনি কি মনে করেন, আমার সেই ঘোষণার পরেও ট্রেড ইউনিয়নের হোমরা-চোমরা সভ্য লাইপার্ট আমার বাড়িতে অতিথি হতে পারেন ? না। ঘোষণা করেই

যে আমি তখন ক্ষান্ত হই নি, আমার সেই প্রলাপোক্তি (হ্যাঁ, অনেকের কাছে তাই মনে হয়েছে—) আমি পার্টির সভ্যদের কাছে পাঠিয়েছিলুম, আমি সাধারণ্যে জানিয়েছিলুম। তার ফলে ট্রেড ইউনিয়ন আমাকে তৎক্ষণাৎ বহিষ্কৃত ক'রে দেয়। সুতরাং লাইপার্ট আমার বাড়িত উঠবেন—একথা আজ কল্পনাও করবেন না।”

চিঠি পেয়ে বিদেরমান-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। রাইখস্টাগের নির্বাচনে সোশ্যাল-ডেমোক্রাট পার্টির প্রতিযোগিদের তিনি ছিলেন পুরোধা। এই কয়েক সপ্তাহে তিনি বেশ বুড়িয়ে গেছেন। আমি তাঁকে সে-কথা বলতে তিনি হাসলেন। বললেন: 'যাহোক বুড়োর প্রতি এখনো আপনার সহানুভূতি আছে। অথচ এখন তো আমার চারদিকেই শত্রু।' বৃদ্ধ বিদেরমান এই কথা বলেই আমার দিকে তাকালেন, যেন তাঁর জীবনের হতাশার একটি সদুত্তর খুঁজে পেতে চান আমার কাছ থেকে।

কথায় কথায় আমি তাঁর পার্টির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলাম: 'আপনাদের উপর জার্মান সাধারণতন্ত্র, জার্মান সংস্কৃতি,—জার্মানীর মহান্ যা কিছু, রক্ষার ভার দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, কিন্তু কি করলেন আপনারা? সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেল।'

'সব ধ্বংস হয়ে গেল,' বৃদ্ধ বললেন: 'কিন্তু সে-দোষ কি আমাদের? কি করেছি আমরা? সারা জীবন ভোর থেকে শুরু ক'রে দুপুর রাত পর্যন্ত বিবেকের আদেশ অনুসারে আমি খেটেছি, আমার যা ক্ষমতা ছিল করেছি, আর আজ আপনি আমাকে অভিযুক্ত করছেন? যারা কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত অযথা গালাগাল দেয় আপনিও দেখছি তাদেরই দলে!'

'হের বিদেরমান, আপনি আমার কথা বুঝতে পারেন নি—আমার মতে, আপনি এবং আপনার মতন প্রবীণ কমরেডরা জার্মানীতে আজ যে দুর্দিন এসেছে তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। জনগণ আপনাদের নির্বাচিত করেছিল জার্মানীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। আপনি তো জানেন, স্বাধীনতা আর সমাজতন্ত্রের জন্য কত শ্রমিক তাদের জীবন বিসর্জন দিয়েছে! কিন্তু আপনারা তাদের ভোটে মনোনীত হয়ে কি করলেন? ক্ষমতা আপনাদের হাতে এল। সোশ্যালিজম, মানুষের মর্যাদাবোধ, গণতন্ত্র, এই ছিল আপনাদের মূলমন্ত্র। আপনারা বুঝতে পারলেন, এই মূলমন্ত্রকে কাজে ফলাতে হবে আপনাদের। কিন্তু কি করলেন আপনারা? আপনারা নির্বাচিত হয়ে সেই মূলমন্ত্র ভুলে গেলেন:

ভুলে গেলেন জনগণকে—যারা আপনাদের আসনে এনে বসিয়েছিল। এ কি বিশ্বাসঘাতকতা নয় হের বিদেরমান? আমার তো মনে হয়, জনগণের বিশ্বাস নিয়ে এমন ছিনিমিনি একমাত্র আপনারাই খেলতে পেরেছেন।'

'কিন্তু জনগণের মঙ্গলই কি ছিল না আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা?'

'আকাঙ্ক্ষা? হাঁ, আমিও সে-কথা অস্বীকার করি না। আপনাদের কয়েকজনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল জনগণের মঙ্গল, কিন্তু রাজনীতির কারবার যাঁরা করেন, তাঁদের শুধু শুভ আকাঙ্ক্ষা থাকলেই তো চলবে না, সফলতার সেখানে দাম অনেক বেশী। আপেনাদের আকাঙ্ক্ষা কখনও কাজে ফলল না, আকাঙ্ক্ষা আকাঙ্ক্ষাই রয়ে গেল। আর এদিকে আমরা জনগণ, আমরা হারালাম আমাদের গৃহ। আমাদের বন্ধুরা হলো হত, আমাদের জীবনের যা কিছু মূল্য ধ্বংস হয়ে গেল। বিদেশীরা আমাদের প্রতি ঘৃণায় হয়ে উঠল কণ্টকিত। হের বিদেরমান, এ দোষ আপনাদের, এ দোষ আপনাদের! আপনারাই এর জন্য দায়ী।'

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। বিদেরমান চুপ ক'রে বসে রইলেন; আরাম-কেদারায় বসে আছেন শুভ্রকেশ বৃদ্ধ, হাঁটুর উপর একখানা ছোট কম্বল বিছানো, তারই উপর হাত রেখেছেন; দেখে মনে হয়, বড় অসহায় জীব। এবার তিনি ধীরে ধীরে কম্পিত স্বরে বলে চললেন:

'আপনি যুবক, ভাব-প্রবণ, তাই কঠোর কথা বলতে একটুও বাধলো না।... আপনি ঠিকই বলেছেন। আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছি; সর্বনাশ করেছি নিজেদের, সর্বনাশ করেছি জাতির। যদি দূরদর্শী হতুম, সতর্ক হয়ে কাজ করতুম! না, কিন্তু তা করিনি। আপনারা যুবকরা যখন আমাদের সতর্ক ক'রে দিয়েছেন, তখন আমরা আপনাদের বিশ্বাস করতে পারি নি। আপনারা জিজ্ঞেস করলেন, আগামী বছরে জার্মানীর ভাগ্য তাকে কোন্‌দিকে নিয়ে যাবে? আমরা তার উত্তরে কার্যসূচীর এক লম্বা ফিরিস্তি আপনাদের দিলুম। সত্যই আমরা নিজেদের সর্বনাশ টেনে এনেছি। তাই দেখছেন এই সর্বনাশের দিনে চুপ ক'রে বসে আছি, কি করব জানি না। মাথায় নানা অলস কল্পনা ফুট কাটছে, কিন্তু তাকে কাজে রূপ দেবার পথ নেই। এই কয়েক সপ্তাহে যেন আরও বুড়ো হয়ে গেছি। পথে বেরোই না। বেরোলেই মনে হয়, ছেলের হাত ধরে ঐ যে মেয়েটি চলেছে, ও যেন আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলছে, তার স্বামীর মৃত্যুর কারণ আমি! কি করব, বলুন, আমি কি করব? আমি আমার বন্ধুদের

জিজ্ঞেস করেছি, তারা বলেছে, এখন আর কিছু করার উপায় নেই। তারা আমার সঙ্গে কাজ করতেও চায় না। বলেছে, পৃথিবী পচে গলে গেছে, এখানে আর কাজ করা সম্ভব নয়। তারা কানে তুলো গুঁজে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। কিন্তু আমি তো পারছি না। আমি তাদের বলেছি পথের ঐ মেয়েটির কথা, সন্তানকে সে বক্ষে তুলে ধরে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে! কিন্তু ওরা আমার আবেদনে সায় দেয় নি। আমাদের তরুণ কমরেডরা গোপন আন্দোলন চালাচ্ছে শুনে তাদের কাছে গিয়ে বলেছি, আমিও তোমাদেরই একজন; আমাকে নাও—' তিনি থামলেন!

জিজ্ঞেস করলাম: 'কি বলছে তারা?'

তিনি মৃদু হাসলেন। 'আমাকে আর জিজ্ঞেস করছেন কেন? আপনি নিজেই জানেন, কি উত্তর তারা দিয়েছে। তাই আমি চুপ ক'রে এখানে বসে আছি। কম্বলে বুড়ো হাড় ক'খানা ঢেকে বসে আছি।'

'কিন্তু আপনি—'

'কি করতে পারি আমি? কিছুই না। হাঁ, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে পারি, নিজে গুলি ক'রে আত্মহত্যা করতে পারি। হয়তো নাৎসীদের একজনকে খুন করতে পারি। কিন্তু কি হবে? বরং ওদের প্রচারেরই সুবিধে ক'রে দেয়া হবে। আর একজন 'শহীদ' বাড়বে নাৎসীদের। না, না, ও কোন কাজের কথা নয়। তাই আমি অনেক ভেবে, আমার পুরোনো বন্ধুদের কাছে চিঠি লিখেছিলুম।'

'কি উত্তর তাঁরা দিয়েছেন?'

'তারা যে উত্তর দিয়েছে, আমি স্বপ্নেও তা ভাবতে পারি না। একসঙ্গে কাজ করেছি, সহ্য করেছি দুঃখ। সেদিনের কথা কি তারা ভুলে গেছে? আমাদের দলে সবাই ছিলুম আমরা মজুর শ্রেণীর। কেউ ছুতোর, কেউ কসাই, কেউ দপ্তরী, কেউ কামার। আমরা কাজের ফাঁকে ফাঁকে রাজনীতির চর্চা করতুম, তারপর ধরা পড়লুম। এক জেল থেকে আর এক জেলে, এমনি ক'রে কেটেছে আমাদের জীবন। জার্মানীর প্রতিটি জেলের সঙ্গে আমি পরিচিত। তখন ছিল বিসমার্কের শাসনকাল। তার সমাজতন্ত্র-বিরোধী আইনের বেড়াজালে আমরা হাঁপিয়ে উঠেছিলুম। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কাছাকাছি শহরে গিয়ে কাজ খুঁজে নিতুম, তারপর রাতে শুরু হতো গুজগুজ-ফিসফিস্, চিঠি লেখা, বক্তৃতা দেয়া। এমনি ক'রে সোশ্যালিস্ট যুব-সঙ্ঘের একদিন পত্তন হলো। পুলিশ টের পেল। আবার আমরা গ্রেফ্‌তার হলুম। জেলে বসে আমরা

বক্তৃতা দিতুম, তর্ক করতুম ; রিভলবারের ক্ষত নিয়ে গর্ব করতুম কত। ভয় আমরা কাউকে করতুম না। আমরা তখন আমাদের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছি ; তুচ্ছ প্রাণের মায়া আমরা করি নি। এমনি ক'রে চলল আমাদের সংগ্রাম, তারপর একদিন রাইখস্টাগে পেলুম আমরা কয়েকটি মাত্র আসন। কিন্তু তখনও আমাদের সংগ্রাম শেষ হয় নি। তখনো আমরা কাজ করেছি, একদিনও বিশ্রাম নিই নি, বা আরামের জীবন বরণ ক'রে নিতেও ছুটি নি। আমরা যেমন গ্রামে, তেমনি শহরের শ্রমিকদের মধ্যে কাজ ক'রে চলেছিলুম। মাঝে মাঝে যখন রোগে পড়তুম, তখন দু'দিনের অবসর নিতুম হাসপাতালে। কিন্তু সুস্থ হয়েই আবার ছুটে যেতুম নিজেদের কাজে। তারপর একদিন সংগ্রাম শেষ হলো, আমরা বিজয়ী হলুম, রাইখস্টাগে আমরা হলুম সব চাইতে ক্ষমতাশালী, সর্বশ্রেষ্ঠ দল—'

বিদেরমান চুপ ক'রে রইলেন। আমার ইচ্ছে হলো বলি, 'কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ পরাজয়ও এল সঙ্গে সঙ্গে।' তিনি আবার বলতে লাগলেন :

'ভেবেছিলেম, সংগ্রাম, জীবন আর মৃত্যু যাদের এক গোষ্ঠীতে পরিণত করেছে, চিরদিনই তারা এক গোষ্ঠী হয়েই থাকবে। কিন্তু সে-ধারণা ভুল, মস্ত বড় ভুল! তারা আজ আমাকে ছেড়ে গেল!'

'আপনার চিঠির তাঁরা উত্তর দেন নি নিশ্চয়ই?'

'হাঁ, বেশির ভাগ সভ্যই দেয় নি। কেউ বা চিঠিখানা নেয়ওনি, ফেরত পাঠিয়েছে। জানিয়েছে, রাজনীতির ভেতর তারা আর মাথা গলাতে রাজী নয়।'

'আর পুরোনো নেতারা?'

'তাদের কথা আর বলবেন না! তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। তাদের জন্য কি না করেছি আমি! ঐ যে লাইপার্ট আজ ট্রেড ইউনিয়নের হর্তা-কর্তা, কিন্তু সে তো আমারই জন্য ; আমিই তার নাম প্রস্তাব করি। তার নির্বাচনে আমিই সাহায্য করেছিলুম সব চাইতে বেশী।'

'আপনি? আপনি তার নাম প্রস্তাব করেছিলেন? তাকে জার্মানীর মজুর-সঙ্ঘের সর্বময় কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন আপনি? আপনার বিবেক তাহলে আর অক্ষত নেই? সে আপনাকে এরই জন্য এখন খোঁচা দিচ্ছে নিশ্চয়ই?'

'শুধু তাই নয়, ইয়নি এন্‌রেনটাইট, যে আজ হামবুর্গের সোশ্যাল-ডেমোক্রাট পার্টির প্রধান, লাইপার্ট-এর ডান হাত—সেও আমারই সাহায্যে আজ অত উঁচুতে উঠেছে।'

'সে আপনার চিঠি পেয়ে কি উত্তর দিয়েছে ?'

'উত্তর আমি পেয়েছি : চিঠি সে গোয়েন্দা বিভাগে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

বিদেরমান-এর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ইনিই একদিন সোশ্যাল-ডেমোক্রাট পার্টির নেতা ছিলেন, আর আজ এত অসহায়! তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয় নি। তিন সপ্তাহ পর একদিন তাঁর দেহ রেক্‌লিঙ হাউসেন্‌-এর রেল-লাইনের ধারে পাওয়া গেল, দেহ ক্ষতবিক্ষত, মাথার খুলি ভাঙা, গুঁড়োনো—এই তাঁর শেষ পরিণাম! কর্তৃপক্ষ সংবাদটা গোপন রাখতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফল হয় নি। সেদিন ওল্‌ডর্ফ কবরখানায় হামবুর্গের হাজার হাজার শ্রমিক তাদের প্রিয় নেতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে এল। সবাই তারা ধীর-গম্ভীর, শোকে ম্রিয়মাণ। হঠাৎ সেই জনতার ভেতর থেকে একজন যুবক চিৎকার ক'রে উঠল। সে গ্রাহ্য করল না কর্তৃপক্ষের রক্তচক্ষু, বিজেতার রক্ত-তৃষা। সে বলল : 'ভুলব না, আমরা ভুলব না! কিছুই আমরা ভুলব না, এর বদ্‌লা আমাদের নিতে হবে ভাইসব! অপেক্ষা করব আমরা। আগামী বিজয় দীর্ঘজীবী হোক্‌!' গোয়েন্দা তাকে খোঁজ করার আগেই সে ভিড়ের ভিতর মিলিয়ে গেল।

এখানে যে বীজ সেদিন পড়ল, সে-ই একদিন লৌহ-শাসনের আড়ালে বেড়ে উঠবে; মহামহীরুহ হয়ে নাৎসীদের কুশাসন-প্রাকারে ফাটল ধরিয়ে দেবে। কিন্তু পুলিশ সে-কথা বোঝবার আগেই যুবক অদৃশ্য হয়ে গেল।

লাইপার্ট-এর সঙ্গে আমার দেখা হলো না। আমার একজন ইয়াঙ্কী সহযোগী খবর দিলেন, তিনি এন্‌রেনটাইট-এর সঙ্গে দেখা করেছেন। তিনি তাঁকে বলেছেন যে ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে হিটলারী গভর্ণমেণ্টের একটা আপস হয়ে গেছে এবং ট্রেড ইউনিয়ন ভেঙ্গে শীঘ্রই এক নতুন নাৎসী-সংস্থা গড়ে তোলা হবে। দিন-তারিখও সব ঠিক। পয়লা মে'ই সেদিন। তবে গভর্ণমেণ্ট ভয় করছে, মজুররা হাঙ্গামা করতে পারে ; তাই তারিখটা দু'এক দিন পেছিয়ে যেতে পারে।

আমি কিছুদিন ধরেই অটোর দেখা পাচ্ছিলাম না, তাই তাকে চিঠিতে এই খবরটা জানিয়ে দিলাম। তাকে আরো লিখলাম পয়লা মে বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী সম্বন্ধেও যেন সে জানায়। এর কারণও ছিল। আমার মার্কিন সাংবাদিক বন্ধু এন্‌রেনটাইট-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের খবর আমাকে দিয়েছিলেন এই প্রতিশ্রুতিতে যে, আমি তাঁকে তাঁর কাগজের জন্য কিছু চমকপ্রদ খবর যোগাব। খবরের কাগজের প্রতিনিধিরা তো তখন টাটকা খবরের জন্য অস্থির ও উদ্‌গ্রীব। পয়লা মে এসে গেল। ক্ষমতা পাওয়ার আগে

থেকেই নাৎসীরা এই দিনটির বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেছিল। তাই সবাই ভেবেছিল, এবার ক্ষমতা হাতে পেয়ে তারা বোধহয় শ্রমিকদের এই ছুটির দিনটি তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবে। পয়লা মে'র কিছুদিন আগে থেকেই হামবুর্গে ইংরেজ আর ইয়াঙ্কী সংবাদদাতাদের ভিড় শুরু হয়ে গেল। শ্রমিকদের স্মৃতি-উৎসবে গভর্ণমেণ্ট কি চাল চালবে, সবাই তা জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব। অবশেষে হিটলারের ঘোষণা বেরুল। পয়লা মে উৎসব নাৎসী জার্মানীতে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু সাংবাদিকরা খবর পেয়েছিলেন, বার্লিন গোপন আন্দোলনের সদর ঘাঁটি নয়, সে-ঘাঁটি এখন হামবুর্গে। তাই দলে দলে তাঁরা এসে হামবুর্গে জুটছিলেন। সবাই টাটকা খবর চান, তাই পয়লা মে'র আশায় সবাই বসেছিলেন। সেদিন নিশ্চয় চাঞ্চল্যকর কিছু ঘটবেই—নাৎসীবাদী মজুরদের স্মৃতি-উৎসব রূপে নয়, জাতীয় শ্রমিক-দিবস রূপে।

নাৎসীরা জাঁক-জমক ক'রে সভা সমিতি, মিছিলের আয়োজন করল। হল্‌গুলি সেজে উঠল পতাকায়, সভামঞ্চ তৈরি হলো, মিছিলের বিজ্ঞপ্তি বেরুল পথের হদিশ দিয়ে। লাখে লাখে মার্ক খরচ হলো এই উৎসবে। না, না, উপবাসী শ্রমিকরা রুটি আর আলু পেল না, কিন্তু বাজি পোড়ানো হলো বহু টাকার!

গোপন আন্দোলনকারীরাও চুপ ক'রে বসে রইল না। তারা আবার নাৎসী লোহার খুরের নিচে একে একে এসে জড়ো হচ্ছিল। তারা চাইছিল এমন কিছু করতে যাতে সারা জার্মানী বুঝতে পারে, তারা এখনও আছে, একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। কিন্তু কি করবে তারা? টাকা নেই, তাদের লোকক্ষয়েও এক্ষুণি তারা রাজী নয়। তাই তারা আয়োজন করছিল সতর্ক হয়ে।

ইতিমধ্যে অটোর কাছ থেকে কোন খবর নেই। অবশেষে গ্রিণ্ডেলহফ-এ গিয়ে তার বাড়িউলীর কাছে খোঁজ নিলাম। তিনি বললেন, সে আজকাল জার্মান "জাতীয় কেরাণী সঙ্ঘে"র পয়লা মে'র উৎসবের ব্যাপারে মেতে আছে। কোনদিন বাড়ি ফেরে, কোনদিন ফেরে না।

আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলাম।

শুক্রবার সকাল আটটা হবে, এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল। বার্মাবেক-এর কার্সটাড্ কারখানা থেকে ফোন। তারা একটা লেখকদের মেলা করতে চায়। সেখানে হামবুর্গের প্রতি লেখক তাঁদের নিজেদের সই-করা বই নিজেরা বিক্রি করবেন। সে-সম্বন্ধে পরামর্শ করতে আমাকে ডাকছে। আমি জানিয়ে দিলাম, ঘণ্টাখানেকের ভেতর যাচ্ছি।

একঘণ্টা পরে কারখানার পাঁচতলায় গিয়ে হাজির হলাম। একজন লোক আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। সে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল। সে আর কেউ নয়, অটো। তার চেহারা ক'মাসে অদ্ভুত রকম বদলে গেছে। অটো আমাকে নিয়ে এল ছাদে। এখানে টবে টবে গাছ বসিয়ে একটি বাগান তৈরি করা হয়েছে। কয়েকটি মেয়ে রেলিঙে ভর দিয়ে পথের দিকে চেয়ে আছে; অটো আর আমি তাদের পাশ কাটিয়ে চললাম। আমি থেমে পড়ে এবার একটা সিগারেট ধরালাম। দেখলাম, মেয়েদের হাতে এক-একটি বড় ঝুড়ি, তাতে গাদা করা ইশতাহার। ছাদের কার্নিসের কাছে ওরা ঝুড়িগুলো রেখেছে। ওখান থেকে একটু হেলিয়ে দিলেই ইশতাহারগুলো খসে-খসে নীচে পড়বে।

আমি নেমে এলাম ছাদ থেকে। লিফ্‌ট থেকে নেমে অটোর কাছে বিদায় নিলাম। আবার পথ চলতে শুরু করলাম।

বেলা ন'টা বাজে। হামবুর্গারস্ট্রাসে গাড়ি, সাইকেল, ট্রাম আর লোকে ভর্তি। সবাই কাজে চলেছে। হঠাৎ জনতা থেমে গেল; থেমে গেল গাড়ি আর ট্রামের সার। চারদিকে গোলমাল। কি ব্যাপার! চেয়ে দেখি, সাদা একটা ঢেউ ধীরে ধীরে নেমে আসছে। ইশতাহারের ঢেউ!

এবার বেজে উঠল বিউগল, পুলিশের গাড়ি আসছে। জনতা সরে গিয়ে পথ ক'রে দিল। অনেকে পালিয়ে গেল আশে পাশের বাড়ির ভেতর; কেউবা ট্রামে উঠে পড়ল, কেউবা দেয়ালের সঙ্গে মিশে রইল। দু'একজন ইশতাহার ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে দেখাল তাদের নাৎসী-শাসনের প্রতি অচলা ভক্তি। কারখানার বিরাট ফটক বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে। ভিতরে যাকে পাওয়া গেল, সেই বন্দী হলো। কিন্তু যারা কাজের কাজী, তাদের পাত্তা মিলল না।

পুলিশ দেখাল অদ্ভুত তৎপরতা। দেখতে-দেখতে এবার দড়ি দিয়ে ঘিরে দিল চারদিক। যারা পালাতে পারে নি, তাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত তন্ন তন্ন ক'রে তল্লাস করা হলো। পুরুষ, স্ত্রীলোক, শিশু কেউ বাদ পড়ল না; ইশতাহার যাদের কাছে পাওয়া গেল, লাঠির ঘায়ে তারা লুটিয়ে পড়ল। আর সবাই ছুটে পালাল।

দশ মিনিট পরে সব ঠাণ্ডা। আবার তেমনি ট্রাম চলছে; চলছে জনতা। পুলিশ তখনো কারখানায় তল্লাসী চালাচ্ছে। রবারের চাবুক মারছে; ভ্যানে তুলছে বন্দীদের। আমি এবার গিয়ে কাছের একটা রেস্তরাঁয় ঢুকলাম। দেখলাম অটো আর সেই ছাদের মেয়ে তিনটি বসে বিয়ার খাচ্ছে। আমি ঢুকেই রেস্তরাঁ থেকে আমার একজন ইয়াঙ্কী সহকর্মীকে ফোন ক'রে গল্পটা বললাম। অটো

এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বলল : 'ওকে বলে দাও, কাল সন্ধ্যে ছয়টায় গ্রাডেনফির্স-এর সামনে থাকতে।' আমি তাকে অটোর এই অনুরোধ জানিয়ে দিলাম। ইয়াঙ্কী সহকর্মীটি উত্তেজিত হয়ে জানতে চাইলেন : 'কি ব্যাপার!' আমি তাঁকে শান্ত ক'রে বললাম : 'উত্তেজনা এখন মুলতুবি রাখুন, সময়ে জানতে পারবেন।'

২৯শে এপ্রিল। ইতিমধ্যে নাৎসীরা সরকারী হুকুম জারী ক'রে দিয়েছে, পয়লা মে'র মিছিলে সবাইকে যোগ দিতে হবে। ইচ্ছে থাক আর না-থাক, যোগ দিতে হবে—নাৎসী সরকারের হুকুম। যোগ না দিলে কারখানায় কারখানায় নোটিশ বোর্ডে দেখা যাবে বিজ্ঞপ্তি। সে বিজ্ঞপ্তির মর্ম এই :

> আগামী মঙ্গলবার মিছিল বেরুবে। গতবারে জানা গেছে, কারখানার অমুক অমুক শ্রমিক মিছিলে যোগ দেয় নি। এবার যদি তারা অনুপস্থিত হয়, তাহ'লে কারখানার কর্তৃপক্ষ বিচার ক'রে দেখবেন, এই বেকার সমস্যার দিনে, যখন হাজার হাজার লোক চাকরীর জন্য হাহাকার ক'রে বেড়াচ্ছে, নবীন জার্মানীর উৎসবে যাদের প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় নি, তারা সত্যিই কাজ করার উপযুক্ত কি না।

এমনি বিজ্ঞপ্তি হামবুর্গের 'ব্লম-আরভস'-এর কারখানায় দেখা গেছে। জার্মানীর অন্যত্রও এ-বিজ্ঞপ্তি জনগণের নজরে পড়েছে। এমনি বিজ্ঞপ্তির পরে যোগ না দিয়ে আর উপায় আছে? তাই দেখা যায় নাৎসী-শাসনে প্রতি উৎসবে লাখে লাখে শ্রমিক এসে ভিড় করেছে। আর হিটলার [illegible]দেশীদের কাছে প্রচার করেছে, নাৎসী-শাসনের আর-এক নাম মজুরদের রাজত্ব। এবং বিদেশীরাও এই মিথ্যা প্রচারে মুগ্ধ হয়ে নাৎসী-শাসনের গুণ-কীর্তন করেছে। তাদের এই মোহ কবে ভাঙবে, কে জানে!

॥ বারো ॥

শনিবার, ২৯শে এপ্রিল। পথে ভিড়। ভিড় ঠেলে কোন রকমে এসে আমার ফ্লাটে পৌছলাম। ভিড় দেখে বার বার মনে হচ্ছিল, এই হাজার হাজার মানুষ, চিন্তাশীল, শ্রম-সহিষ্ণু মানুষ,—ন্যাশনাল-সোশ্যালিজমের এরা হলো শীকার! এরা যুদ্ধ চায় না, চায় বাঁচতে, কিন্তু এডলফ্ হিটলারের যুদ্ধে এদের নামতে হবে অদূর ভবিষ্যতে। এ এক হেঁয়ালি। ইতিহাস বরাবর এই হেঁয়ালিরই পুনরাবৃত্তি

করেছে, আর অস্ত্র-শস্ত্রের কারখানার দার্শনিকেরা গলাবাজি ক'রে বলেছেন, 'যুদ্ধ হচ্ছে সামাজিক প্রয়োজন।'

আবার আমরা নামব এক মহাসমরে। স্বাস্থ্যবতী শ্রমিক রমণীর দল, আজ যারা ক্ষিপ্রপদে চলেছে কর্মস্থলে, তারা গোলার আঘাতে পড়বে লুটিয়ে। পুরুষরা দেবে প্রাণ সীমান্তে; আর শিশুরা? তাদের জন্য আছে শত্রুর উড়োজাহাজ থেকে ছড়ানো বিষাক্ত গ্যাস আর বীজাণু!

যুদ্ধ, এক মহান্ যুদ্ধ! জাতির মর্যাদাবোধ, অধিনায়কের সম্মান! নেতা নিরাপত্তার কোলে শুয়ে হুকুম চালাবেন, আর সীমান্তে মরবে জনগণ, রক্ত ঝরবে তাদের! এই তো যুদ্ধ, মহান্ যুদ্ধ!

৩০শে এপ্রিল, রবিবার, ডিউকের কাছ থেকে একটা জরুরী খবর পেলাম। এই তার শেষ খবর। সে যে ফন্দি এতদিন ধরে আঁটছিল, তাকে সমাপ্তির পথে নিয়ে এসেছে। অটোকে তাড়াতাড়ি সংবাদটা পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু সংবাদ-বাহক ফিরে এল না। ভাবলাম, আমি নিজেই যখন অটোর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, তখন আর দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

সাড়ে পাঁচটায় গ্রাডেনফির্স-এ গিয়ে হাজির হলাম। ইতিমধ্যে গীর্জার কাছে ভিড় জমে উঠেছে। কিন্তু চাঞ্চল্য নেই, নেই সোরগোল। ঝঞ্ঝাবাহিনীর সৈনিকরা গীর্জার সামনে খানিকটা জায়গা দখল ক'রে আছে। কাউকে কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। কি ব্যাপার বুঝতে পারছিলাম না; হঠাৎ উপর দিকে তাকাতেই ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে গেল।

গীর্জার গম্বুজে উড়ছে লাল নিশান: বাতাসে দুলে দুলে মজুরের বিজয় ঘোষণা করছে।

আমি ঝঞ্ঝাবাহিনীর একজন সৈনিকের কাছে গিয়ে আমার প্রেস-কার্ড দেখিয়ে, তার উপরওলার সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। আমার ইয়াঙ্কী সহ-কর্মীটিও ইতিমধ্যে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ চোখ থেকে যেন খুশি উপচে পড়ছিল। আমি রক্ষীকে বললাম: 'সত্যি, এই বলশেবিকগুলোর কাণ্ড দেখে তাজ্জব বনে গেছি! তুমি ব্যাপারটা খুলে বল তো বন্ধু।'

সে উত্তর দিল: 'আরে মশাই, ব্যাপারটা কখন ঘটেছে কেউ টেরই পায় নি। বোধহয়, উপাসনার সময়ই বেটারা এই কাণ্ড করেছে, যাতে গীর্জা থেকে বেরিয়ে এসেই সবাই প্রথম দেখতে পায়! এদিকে তখনই পুলিশে খবর দিলে কাজ হতো। তা না, ধর্মযাজক মশাই সবাইকে সরিয়ে দিয়ে তারপর পুলিশে

খবর দিলেন। এদিকে আমরাও খবর পেয়ে এসে গেলাম। কিন্তু কে যে এমন ছেলেমানুষি কাণ্ড ক'রে উধাও হলো, তার পাত্তাটি পেলাম না।'

'কি ভয়ানক ব্যাপার!' টাটকা সংবাদ-পাগল আমার ইয়াঙ্কী বন্ধুটি বলে উঠলেন। তার চোখে মুখে তখনও খুশি উছলে পড়ছে।

'তোমরা নিশানটা নামিয়ে ফেলছ না কেন!' জিজ্ঞেস করলাম।

ঝঞ্ঝাবাহিনীর উপরওলাটি কখন এসে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, টের পাই নি। উত্তেজিত হয়ে বললেন: 'বদমাসরা কি তার উপায় রেখেছে। ওরা চাবির গর্তগুলো সীসে গালিয়ে বন্ধ ক'রে দিয়েছে। এদিকে ধর্মযাজক মশাই গীর্জার দরজা ভাঙতে দিতে নারাজ। দরজাগুলোর নাকি ঐতিহাসিক মূল্য খুবই বেশি। আমরা অবশ্য তাঁকে গ্রেপ্তার করেছি। কিন্তু ওপর থেকে হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই করতে পারছি না। ধর্মযাজক মশাইয়ের উপর তম্বি করার মানে বোঝেন তো?'

'সীসে গালিয়ে গর্তগুলো বুজিয়ে দিয়েছে। চমৎকার!' ইয়াঙ্কী সহকর্মীটি হঠাৎ বলে উঠলেন।

'কি বললেন, চমৎকার?' রেগে উঠল ঝঞ্ঝাবাহিনীর কর্মচারীটি।

'কমিউনিস্ট বদমাসদের গুপ্ত ষড়যন্ত্রের চমৎকার প্রমাণ নয় কি?' আমি তাড়াতাড়ি বললাম।

আমরা কর্মচারীটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবার ভিড়ের ভেতরে মিশে গেলাম। দেখলাম, জনতা নিশানের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে। কেউ কেউ বা কমিউনিস্টদের গালাগাল দিচ্ছে। কিন্তু তারা সংখ্যায় খুবই কম। আর সবাই তাকিয়ে দেখছে। কি অধীর আগ্রহ তাদের চোখে! একজন তরুণ কমিউনিস্ট-এর সঙ্গে দেখা হলো। বয়েস বছর আঠার। তার সঙ্গে আমার পূর্বপরিচয় ছিল। সে আমাকে দেখেই ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরে কানে কানে বললে: 'আমি ভাবছিলাম, সব বুঝি শেষ হয়ে গেছে! পার্টির তো কোন পাত্তাই নেই। আমাদের দলের নেতা পয়লা মার্চ ধরা পড়েছেন। কিন্তু আজ এই নিশান দেখে বুঝলাম, আছে, পার্টি আছে। এত খুশি হয়েছি, কি বলব! ইচ্ছে করছে খানিকক্ষণ কাঁদি! এক টুকরো লাল কাপড় উড়ছে, অথচ ঐ কাপড়ই আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেল, আমি একা নই। পার্টি বেঁচে আছে, কাজ চলছে আমাদের!' তরুণ কর্মীটি এই বলে ছুটে ভিড়ের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ইয়াঙ্কী সহকর্মীটি এবার আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। কাতারে কাতারে চলেছে জনতা। ঐ বিপ্লবের রক্ত পতাকার দিকে তাকিয়ে দেখছে। তারপর নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে। আগুন যারা নেবায় তারা ছাদে উঠে নিশান নামাবার চেষ্টা করছে। নিশান দুলছে, উড়ছে হাওয়ায়। নীচে নিঃশব্দে মুখের সার মাথা উঁচিয়ে দেখছে, তারা বুঝি রুদ্ধশ্বাস হয়ে দেখছে। আমার ইয়াঙ্কী সহযোগী দেখছিলেন। তিনি এবার অস্ফুট স্বরে বললেন: 'আন্দোলন বেঁচে আছে, মরে যায় নি—'

দু'দিন ধরে রক্ত পতাকা গম্বুজের উপর উড়ল; জার্মানীর জনগণকে জানিয়ে দিল, পার্টি এখনও বেঁচে আছে, তারা যেন নিরাশ না হয়। পয়লা মে চলে গেল: দোসরা মে চাবির গর্ত থেকে গলানো সীসা ছেঁকে ফেলে গীর্জার দরজা খোলা হলো, নিশান নামাল নাৎসীরা। গুজব শোনা গেল, ধর্মযাজক অভিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু সঠিক সংবাদ আমি আর পাই নি।

অটোর সঙ্গে কিন্তু এই ভিড়ে দেখা হলো না। তার দেখা পেলাম তার পর দিন, পয়লা তারিখে। পয়লা মে নাৎসীদের শোভাযাত্রার ভেতরে তাকে দেখতে পেলাম। বে-আইনী সঙ্ঘের আরো বহু সভ্যকেও দেখা গেল। অটো আমাকে দেখে শোভাযাত্রা থেকে বেরিয়ে এল। সে আমাকে ডিউকের দেয়া খবর পাঠাবার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলল: 'শুনলাম, তোমার ইয়াঙ্কী বন্ধুটি নাকি গীর্জার নিশান দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গেছেন। তোমার বন্ধুটিকে জানিও, এ খবর আমরা পেয়েছি, ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছে আছে, বন্দোবস্ত কর না!'

আমি ফোনে আমার বন্ধুটিকে ডেকে বললাম, তিনি যেন আধঘণ্টা পর স্টাইডেনহাম্ আর ল্যাবেফেরতর-এর মোড়ে দেখা করেন।

আমরা এবার স্টাইডেনহাম-এর দিকে চলতে শুরু করলাম, অটো এবার বলল: 'জনতার এই মিছিল খুবই কার্যকরী হয়েছে। জনগণ যদিও জানে, তারা এসে যোগ দিয়েছে কর্তৃপক্ষের হুমকিতে, তবু এখন ওদের মুখের দিকে চেয়ে দেখ, ওরা সে-কথা একেবারে ভুলে গেছে। একটা উত্তেজনা এসেছে সারা দেহে। জনগণের মিছিল বা সভার এই তো বিশেষত্ব, জনগণকে সে চালিয়ে নিয়ে যায়, গণসংযোগ ঘটায়। তাকে একাত্ম ক'রে তোলে। হিটলার একথা ভাল ক'রে জানে, যদিও এটা তার নিজের মৌলিক চিন্তার ফল নয়। মস্কো থেকেই সে চুরি করেছে কল্পনাটা। মস্কো বছরের পর বছর ধরে জনগণের উৎসব

ক'রে তাদের ভেতর এনেছে নব অনুপ্রেরণা। রাজনীতিক মনস্তত্বে এর দাম কম নয়। এ মনস্তত্ব মস্কোর আগে কেউ আবিষ্কার করে নি।'

মার্কিন বন্ধুটি এসে এবার হাজির হলেন। অটোকে হের হাস্ এই নামে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। বন্ধুটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হলো, তিনি এই হের হাস্-এর পরিচয় আরো ভাল ক'রে জানতে চান। অটো সে-কথা বুঝতে পেরে তাঁকে জানিয়ে দিল, সে কমিউনিস্ট পার্টির উপরওলা কেউ নয়, একজন সাধারণ সভ্য মাত্র। পার্টি যখন বে-আইনী ছিল তখন থেকেই সে সভ্য, এখনও তাই আছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও সে জানিয়ে দিল, সে বন্ধুটিকে বিশ্বাস করেই একথা বলছে। সে জানে, তিনি নিশ্চয়ই তাকে ধরিয়ে দেবেন না, দিতে পারেন না।

মার্কিন বন্ধুটি একজন ঝুনো সাংবদিক। গৃহী হিসেবে ধর্ম এবং পুরোনো সংস্কারের প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা, সুতরাং কমিউনিজমের তিনি বিরোধী হবেনই। তার উপর প্রতিপক্ষের চোলাই করা কমিউনিস্ট কীর্তি-কাহিনীর সংবাদও তিনি সংবাদপত্রের মারফৎ গিলে থাকেন। এবং এই সব কাগজের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তাই তিনিও কমিউনিজমকে 'সুনিয়ন্ত্রিত দস্যুবৃত্তি' বলতে কখনও দ্বিধা করেন নি। তখনও একথা তিনি ভেবে দেখেন নি যে, প্রতি প্রাগগ্রসর আন্দোলনের ইতিহাসের মতই কমিউনিজমকেও যুক্তিহীনতা, নিন্দা এবং ঘৃণার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। কিন্তু তবু একজন গোপন আন্দোলনকারী কমিউনিস্টের দেখা পাবার জন্য তাঁর সাংবাদিক মন এতদিন ধরে উন্মুখ হয়েছিল, আজ তাঁর সে-সাধ মিটল।

তাঁর সাংবাদিক মন অটোর কাছ থেকে জানতে চাইল গোপন আন্দোলনের কথা, অন্যদিকে তাঁর ধর্মভীরু গৃহীমন অটোর প্রতি শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে গেল। অটো তাঁকে বিশ্বাস করেছে, সেইটেই তাঁর কাছে এক মস্ত কথা হয়ে দাঁড়াল। তিনি প্রাণ গেলেও সে-বিশ্বাস ভঙ্গ করবেন না—এটা আমি বুঝতে পারলাম। অটোরও সে-বিশ্বাস আছে। অটো আর তিনি উত্তেজিত স্বরে কথা বলতে বলতে পথ চলছিলেন। হঠাৎ অটো পেছন ফিরে আমাকে বলল: 'আমাদের বন্ধুটি অবাক হয়ে যাচ্ছেন—কারণ, আমাদের গোপন আন্দোলনের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো পর্যন্ত তাঁর কাছে গোপন করছি না। অথচ এর একটা কথা আমার নাৎসী উপরওলা জানতে পারলে আমার ভাগ্যে কি আছে সে আমিই জানি। তুমি এবং তোমার এই বন্ধুটি কমিউনিস্ট নও, বুর্জোয়া সংবাদ-

পত্রের সংবাদদাতা। অন্যের সঙ্গে তোমাদের পার্থক্য এই—তোমরা বাস্তবকে চুল-চেরা বিচার ক'রে দেখবার চেষ্টা কর। অন্যে তা করে না। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোমরা বহু শুনেছ। কিন্তু অভিযোগের মধ্যে গলাবাজি আছে, নেই সাধারণ ভদ্রতা। আমরা ভদ্র প্রতিদ্বন্দ্বী চাই। আমরা ইংরেজ আর আমেরিকানদের জানিয়ে দিতে চাই, সুনিয়ন্ত্রিত দস্যু-বৃত্তি আমাদের পেশা নয়। আমরা অন্য সবার মতই সাধারণ ভদ্রভাবে জীবন যাপন করি। আমাদেরও স্ত্রী আছে, পরিবার আছে, তোমাদের মতই আমাদের ঠাণ্ডা লাগে, তোমাদের মতই আমরা কেউ চশমা পরি, কেউ পরি না। অদ্ভুত জীব আমরা নই, অতিমানুষের যেমন দাবি করতে আমরা চাই না, অমানুষের খেতাব নিতেও তেমনি রাজী নই আমরা। আমরা মানুষ, এক মহান্ বিশ্বাসের সূত্রে বাঁধা। আমি শুধু এই চাই, আমেরিকা আর ইংলণ্ড যেন আমাদের ভীতিপ্রদ কোন বস্তু বলে মনে না করে। আমরা পৃথিবীর এক নতুন মতবাদের প্রতিনিধি—এই বলেই যেন তারা ভাবে। আমাদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য এই—আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য এক সুষ্ঠু সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি। আমরা সে-ভবিষ্যতের ভাগ পাব না, কিন্তু পাবে আমাদের সন্তান, আমাদের শত্রুদের সন্তান। শুধু সেই ভবিষ্যতের জন্য আমাদের এই সংগ্রাম, এই আত্মোৎসর্গ। আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তোমরা লড়াই কর তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু শহীদের সম্মানটুকুর দাবি আমরা করবই। আমাদের দিতে হবে সে-সম্মান।'

এবার আমরা একটা ছোট ছবিঘরের সামনে এসে হাজির হলাম। বারোটা বাজে। অটো তিনখানা টিকিট পকেট থেকে বার করল। পোষ্টারে দেখলাম 'মনিং ডন' নামে একখানি দেশাত্মবোধক ছবি দেখানো হচ্ছে। ছবিটিতে অভিনয় করেছেন জার্মানীর বিখ্যাত অভিনেতা রুডলফ্ ফস্টার।

'আমি কি করতে ভেতরে যাব?' মার্কিন বন্ধুটি অবাক হয়ে শুধালেন।

টিকিট-ঘরটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম—টিকিট-ঘরে কেউ টিকিট কিনছে না। জাল-দেওয়া খুপরিটার ভিতরে বসে আছে একটি মেয়ে। কেউ টিকিট কিনতে এলে সে জানিয়ে দেবে—বারোটার শো'র টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। তবে দু'টোর শোর টিকিট দিতে পারে[১]।

'চলুন।' অটো এই বলে আমাদের নিয়ে হলের ভিতরে ঢুকল। অন্ধকার হল্, ফ্লাস ল্যাম্পের আলো ঝলসে উঠছে মাঝে মাঝে, আর ফিসফিসানি।

১ য়ুরোপের ছবিঘরে একই ছবি সারাদিন ও রাত ধরে হয়—অনুবাদক।

আমাদের ইয়াঙ্কী বন্ধুটি চুপচাপ, চারদিকে তাকিয়ে দেখছেন। ঘণ্টা বেজে উঠল। অন্ধকারে দেখতে পেলাম, কে যেন আসন ছেড়ে মঞ্চের উপর পর্দার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, মুখ দেখা যাচ্ছে না।

এবার সে বলতে শুরু করল। আমার মেরুদণ্ড বেয়ে উত্তেজনার শিরশিরাণি উঠছে, চারদিকে উত্তেজিত জনতা ; অধীর উন্মুখতা।

এক মুহূর্তের বিরাম। ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ ; স্তব্ধতা। বাইরে সূর্যের আলো, জনতার মিছিল ; আর এক পৃথিবী। আর এখানে !

সেই অস্পষ্ট মুখখানি আবার ডাকলে : 'কমরেডগণ !—'

ছোট হল্। এখানে মজুরশ্রেণীর মেয়েরা আসে তাদের প্রিয় তারকাদের হাসি আর কান্নার অভিনয় দেখতে। নিজেদের বঞ্চিত জীবনকে তারা ছবির নায়ক-নায়িকার ভেতরে খুঁজে পায়। তারা কাঁদে হাসে আর ভাবে—আছে, সুন্দর পৃথিবী আছে। সেখানে হাড়ভাঙা মেহনতি করছে এমন মেয়েও কাউণ্টের প্রেমে পড়ে। আবার সে-প্রেমেরও প্রতিদান পায়। সেখানে যত স্বপ্ন সার্থক হয়। স্বপ্নেই শুধু সেখানে প্রবেশ সম্ভব, কিন্তু এমনিতে তা নিষিদ্ধ। তাদের ভাগ্যে শুধু হাড়ভাঙা মেহনতি, অন্য কিছুই নয়। আজও তারা এসেছে, ভিড় জমিয়েছে। মজুর মেয়েদের একমাত্র কামনার পরিপূরক এই সব ছবি। এই তো তাদের অধিকার।

'কমরেড—' বক্তার স্বর আবার ঝড়ে পড়ল।

বাইরে ঝঞ্ঝাবাহিনীর সৈনিকদের পদধ্বনি, রিভলভারের নিরাপদ-ধৃতি খোলা। সেলে সেলে হাজার হাজার নির্যাতিতের গোঙানি। ওদিকে হিটলার টেম্পেলহফ ময়দানে বিশ লক্ষ দেশবাসীর মৌতাতের ব্যবস্থা করছে।

'কমরেডগণ !' হামবুর্গের নগণ্য এক বক্তা ডাকছেন নির্যাতিত মানুষদের, জানাচ্ছেন সংগ্রামের আহ্বান। পয়লা মে'র বাণী !

পরদিন মঙ্গলবার, দোসরা মে। ট্রেড ইউনিয়নের অফিসগুলোর উপর ঝঞ্ঝাবাহিনী হানা দিল। আসবাবপত্র ভাঙা, নিম্নতম কর্মচারীদের নিগ্রহ, তহবিল লুণ্ঠন—সব কিছু চলল একযোগে। ইউনিয়নের উপরওলারা তফাতে রইলেন, তাই তাঁদের গায়ে আঁচড়টুকু লাগল না, কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন ভেঙে গেল। জার্মানীর দুই-তৃতীয়াংশ যারা, সেই শ্রমিকরা হারাল তাদের স্বাধিকার। কিন্তু কেউই একটা আঙুল তুলল না হিটলারী হানাদারীর বিরুদ্ধে।

বড় বড় শহরে নাৎসী-বিরোধী উত্তেজনা থিতিয়ে এল। শুধু সমাজের নিচু

তলায় তখনো জ্বলছে আগুন। ডর্টমুণ্ড, বার্লিন, কোনিগস্‌বুর্গ-এ বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে লেখা ফুটে উঠল হামবুর্গের মতোই : 'হিটলার, আমাদের রুটি দাও, তা না হ'লে আমরা আবার কমিউনিস্ট হব।'

হিটলার এবার জনগণের উপর হুমকি ছাড়ল : 'দ্বিতীয় বিপ্লবের চিন্তা করাও জাতির কাছে অপরাধ, দেশদ্রোহিতা।' বে-আইনী সোশ্যালিস্ট পার্টি এক ইশতাহার এই মর্মে বার করল যে, ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট পার্টি তাদের জাতীয়তাবাদের পর্ব শেষ করেছে। কিন্তু তাদের কর্মসূচীর দিক্‌ দিয়ে বিচার করতে গেলে এতো কিছুই নয়। আমরা তাদের সমাজতান্ত্রিকতার দিক্‌টা দেখার জন্য উৎসুক হয়ে আছি। সেদিক দিয়ে তারা কি করবে?

এবার এল মোহ-বিচ্যুতি। যে-মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিটলারকে মহাত্মার পর্যায়ে উন্নীত করেছিল, তাদের মধ্যেই হতাশা এল প্রথম। কিন্তু নিম্ন-মধ্যবিত্তরা তখনো বিশ্বাস হারায় নি, হিটলার তখনো তাদের মেসায়া, তখনো মহাপুরুষ। তারা শুধু বলল : '**সময় দাও, সময় দাও, হিটলার সব ঠিক ক'রে দেবেন!** আর শিশুরাষ্ট্রকে সময় না দিলে চলবে কেন?'

এদিকে গোপন আন্দোলন চলতে লাগল।

॥ তেরো ॥

গাঙেফিরৃতেল-এর পুলিশী হানায় ডিউক ধরা পড়ল। তাকে যখন পুলিশ ধরে তখন সে নাৎসী পার্টির কতগুলো জরুরী দলিলের ফটোগ্রাফ নিচ্ছিল। তার পরনে ছিল ঝঞ্ঝাবাহিনীর উর্দি। নাৎসী পার্টির গোপনীয় খবরগুলো কিছুদিন থেকেই শত্রুপক্ষ জেনে ফেলছে, একথা পুলিশ টের পায়। এবং সন্দেহের বশবর্তী হয়েই তারা গাঙেফিরৃতেল পাড়ায় হানা দেয়। ডিউককে গ্রেফতার ক'রে নিয়ে যাওয়া হলো প্রধান থানার ২০৩ নম্বর কক্ষে। পুলিশী নির্যাতন-নিপীড়নের সহস্র স্মৃতি বহন ক'রে এই কক্ষটি কুখ্যাত। একদফা নির্যাতন তার উপর আগেই হয়ে গেছে। চলার শক্তি ছিল না তার, ধরাধরি ক'রে লিফটে তুলে তাকে নিয়ে আসা হলো ২০৩ নং কক্ষে। ঝঞ্ঝাবাহিনীর একজন সৈনিকের মুখে আমরা একথা শুনেছি : তখন সে সেখানে উপস্থিত ছিল। পরে সে দল ছেড়ে দেয়।

ডিউকের সারা দেহ রক্তমাখা। তবু স্বীকারোক্তির জন্য চলল আর একদফা অত্যাচার, কিন্তু একটি কথাও তার মুখ দিয়ে বেরুল না। সে চেতনা হারাল। বালতি-বালতি জল ঢেলে করা হলো জ্ঞান-সঞ্চার, চোখ মেলে তাকাল ডিউক। রক্তাক্ত তার চোখ, মুখে অসহ্য বেদনার ছাপ। তবু ঠোঁটে দৃঢ়তা। সে বলল: 'তোরা এখনো আমাকে শেষ ক'রে ফেলিসনি? একটা কথাও আমার মুখ দিয়ে বার করতে পারবি না।' তারপর কয়েকটা গুলির শব্দ। তারপর সব শেষ।

গাওফিবুতেল-এর পুলিশী হানা বেশ জাঁকজমকের সঙ্গেই হলো, কিন্তু তেমন কোন জাঁদরেল ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করতে পুলিশ পারল না। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে অটোর বহু গুপ্তচর ছিল, তারাই কমিউনিস্টদের আগে সাবধান ক'রে দিল। তখনো ভোর হয় নি, অন্ধকার বেশ আছে, এমন সময় পুলিশ এবং ঝঞ্ঝাবাহিনীর সৈনিকরা সমস্ত পাড়া ঘিরে ফেলল। পথের মোড়ে মোড়ে বসান হলো মেসিনগান; ভোর সাতটার ভেতর সব প্রস্তুত। একটি প্রাণীরও পালাবার উপায় রইল না। এবার চলল হানা। ঘরে ঘরে খানাতল্লাসী শুরু হলো। পাড়ার প্রতি লোককে আপাদমস্তক তল্লাস করা হলো, গাড়ি আর সাইকেলের উপর রাখা হলো কড়া নজর। দুধের বালতিগুলো রাস্তার উপর ঢেলে ফেলা হলো, গাড়ির গদি কেটে চলল পরীক্ষা। প্রতি বাড়ির দেয়ালের কাগজ ছিঁড়ে, আস্তর ভেঙে, বাক্স-পেঁটরা তছনছ ক'রে, গদি কেটে পুলিশী তল্লাসী চলল। গৃহস্বামীরা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো।

এই পাড়ার অন্ধকূপে, এই দারিদ্র্যের আস্তাকুঁড়ে যত বদমাসদের আস্তানা ছিল, তাদের হলো বিপদ। একটা জাল নোট তৈরির গোটা কারখানা আবিষ্কৃত হলো, কয়েকজন দাগী বদমাসও ধরা পড়ল; কিন্তু যাদের জন্য এই হানা তারা কোথায়? কমিউনিস্টরা আগেই বে-আইনী সঙ্ঘগুলোকে সাবধান ক'রে দিয়েছিল, তাই পুলিশ যখন এল, তখন তাদের আস্তানা ফাঁকা। পুলিশ দু'একখানা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইশতাহার, খানকয়েক বামপন্থী উপন্যাস ও গোটা-দু'য়েক মরচে-ধরা রিভলভার ছাড়া আর কিছুই পেল না।

অবশেষে সাড়ে বারোটার সময় পুলিশ হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলে হানা শেষ হলো। পুলিশের বড়কর্তা এবার বিখ্যাত সংবাদপত্রগুলোর সংবাদদাতাদের ডেকে পাঠিয়ে এক বিবৃতি দিলেন তাদের কাছে। তিনি যদিও সংবাদদাতাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করলেন, তবুও মনে হলো, রাগে তিনি ফুসে উঠছেন।

তিনটে বাজে তখন। তিনি এক-একখানা কাগজ সংবাদদাতাদের হাতে তুলে দিলেন। কাগজ সবে ছাপাখানা থেকে বেরিয়েছে, তখনো শুকোয় নি। পড়ে দেখলাম নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পত্রিকা হামবুর্গের "ফলকৎসাইতুঙ-"এর এক ক্ষুদ্র সংস্করণ! পত্রিকায় এই সংবাদটি ছিল :

"গাঙেফিরতেল-এ হানা"

"এই মুহূর্তে ছ'হাজার পুলিশ গাঙেফিরতেল পাড়ায় হানা দিয়েছে, চলছে খানাতল্লাস। আমাদের কমরেডদের কাল রাত্রেই এ সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দেয়া হয়েছিল। চিরাচরিত বর্বরতার সঙ্গেই এই তল্লাসী চলছে, বর্বরতা আরো বেড়ে উঠেছে এইজন্য যে, পুলিশ রাস্তার মোড়ে যে মেসিনগান বসিয়েছে তা ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে না। কেননা, এমন কোন সাংঘাতিক মাল-মসলা পাওয়া যায় নি, যার জন্য এই মেসিনগানের ব্যবহার চলতে পারে। আমাদের গোপন সংবাদ-সংগ্রহ বিভাগ শীঘ্রই হানার বিস্তৃত বিবরণ দেবেন, তখন আমাদের পাঠকরা জানতে পারবেন, পুলিশের এবং সেনাবাহিনীর কোন্ কোন্ বিভাগ এই কার্যে লিপ্ত আছে এবং ক্ষতির পরিমাণই বা কত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশী ভণ্ডামির পরিচয়ও পাওয়া যাবে। এই যে গরীবদের উপর অমানুষিক অত্যাচার হলো, আশা করি সরকার তার ক্ষতিপূরণ করবে। আমরা সেই দাবিই করছি।...

"এই সংবাদ ছাপা হয়ে যাওয়ার পর আমরা আরো একটি চমকপ্রদ ঘটনার সংবাদ পেয়েছি। সংবাদটি এই :—

"সাড়ে এগারোটার সময় পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, কোন গোপন অস্ত্রাগার বা ছাপাখানা আবিষ্কার এ পাড়ায় সম্ভব নয়। তখন হামবুর্গের পুলিশ কমিশনার বিহ্বল এবং পুলিশের সেক্রেটারী ষ্টোয়েগল্‌স্,—এরা দু'জনেই কমিউনিস্ট আন্দোলন দমন করার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী—পরামর্শ ক'রে এই হুকুম দেয় যে, একখানা পুলিশ ভ্যান দু শ' রিভলভার সমেত বাওষ্ট্রাসের ব্যারাক থেকে গাঙেফিরতেল-এ নিয়ে আসা হোক্। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে এই হুকুম জারী করা হলো এবং হুকুমানুযায়ী কাজও হলো। রিভলভার সমেত ভ্যান কাইসার হ্বিলহেলমষ্ট্রাসে এবং নরস্টাডষ্ট্রাস-এর পথে গাঙেফিরতেল-এ এসে পৌছল। তখন বেলা বারটা বেজে দশ মিনিট।...

"বারোটা পনেরোতে পুলিশ নরস্টাডষ্ট্রাস-এর এক বাড়িতে হানা দিয়ে দু শ'

রিভলভার পেল! যাহোক্, কমিউনিস্ট অস্ত্রাগার অবশেষে আবিষ্কৃত হলো! পুলিশের মান রক্ষা হলো। এই চমকপ্রদ আবিষ্কারের দ্বারা পুলিশ কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্রের এক গোপন অধ্যায় উদ্ঘাটন করল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই আড়ম্বরপূর্ণ হানারও একটা অর্থ খুঁজে পেল। তারপরই বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সংবাদদাতাদের আমন্ত্রণ ক'রে আনিয়ে তাঁদের এই হানা বিষয়ক একখানা ছাপানো বিবৃতি দেয়া হলো। বেলা একটার কিছু পরে হামবুর্গের ফ্রেমডেনব্লাটের বিশেষ সংখ্যায় তা আপনারা দেখতে পেয়েছেন।···

"আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে, পুলিশ-ভ্যান যখন কমিউনিস্টদের এই গোপন অস্ত্রাগারের লুণ্ঠিত সামগ্রী নিয়ে ব্যারাকের দিকে যাচ্ছিল, তখন এক দুর্ঘটনা ঘটে। দু শ' রিভলভারের মধ্যে নাকি চৌষট্টিটির কোন হদিশই মেলে নি। অথচ ভ্যানের পুলিশ কর্মচারীরা হলফ ক'রে বলেছে, গাঙেফিব্‌তেল থেকে ব্যারাক পর্যন্ত একবারও গাড়ি থামানো হয় নি। কিন্তু গাঙেফিব্‌তেল-এ যখন গাড়িতে মাল তোলা হয়, তখন দু শ'টি রিভলভারই গুনে তোলা হয়েছিল। কি ব্যাপার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। পুলিশের কর্তা অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েছেন। আমরা তাকে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি!"

'ভদ্রমহোদয়গণ,' নাৎসী পুলিশের কর্তা ক্যাপ্টেন আব্রাহম বললেন: 'আপনাদের কাছে এই বে-আইনী পত্রিকাটির কপি এই জন্যই পেশ করলাম, যাতে ভবিষ্যতে আপনারা এই গোপন ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে না গিয়ে আমাদের কাছেই সংবাদ সংগ্রহ করতে আসেন। দেখলেন তো, সংবাদের নামে কি নির্জলা মিথ্যা তারা প্রচার করছে—! অথচ আপনারা তাদেরই কাছে ছোটেন সংবাদ সংগ্রহ করতে।' এই বলেই তিনি আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমার উদ্দেশ্যেই যে কথাটা বলা হয়েছে, বেশ বুঝতে পারলাম। একটু থেমে তিনি এবার বললেন: 'তবে আমাদের প্রচারেরও একটু অতিরঞ্জন আছে বৈ-কি। দু শ'টি রিভলভার আমরা পাইনি, পেয়েছি একশ' চৌষট্টিটি। কিন্তু ওটুকু রঙ না চড়ালে চলে না, এ নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারেন।'

একজন ইংরেজ সাংবাদিক বললেন: 'গোপন অস্ত্রাগার কোথায় পাওয়া গেল? বাড়িটা কোন্ রাস্তায়, ঠিকানা কি? আমি একটা ফটো তুলতে চাই।'

'একশ' চৌষট্টি কি বলছেন, ক্যাপ্টেন? গাড়িতে যখন তোলা হয়, আমি

নিজে গুনে দেখেছি, দু শ'টা রিভলভার ছিল,' একজন ফরাসী সাংবাদিক ছুড়ে মারলেন কথাটা পুলিশের কর্তার মুখের উপর।

'কি ক'রে কমিউনিস্টরা এ খবর পেলো?' আর-একজন জিজ্ঞেস করলেন। ক্যাপ্টেন আব্রাহম চটে গিয়ে এবার সাংবাদিকদের বিদায় দিলেন।

চারটের সময় কাফে হুরনের্-এ নিকলের সঙ্গে কফি খাওয়ার কথা। গিয়ে হাজির হলাম। বড়ই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল নিকলকে। "ফলকৎসাতুঙ"-র জন্ম অবিশ্রান্ত তাকে খাটতে হচ্ছে। শ্রমিকদের যে সব চিঠি আসে, সেগুলোর সম্পাদনার ভার তার উপর। তা ছাড়া কম্পোজও সে করে এবং কাগজ ছাপা হলে বিলি করতেও হয় তাকেই। রোজ একই ট্যাক্সি নিয়ে সে কাগজ বিলি করতে বেরোয় না। নিত্য নতুন ট্যাক্সি নিয়ে সে স্টেশনে সংবাদপত্র বিক্রেতাদের কাছে "ফলকৎসাইটুঙ" দিয়ে আসে, কাগজ তাঁদের মারফৎ ছড়িয়ে পড়ে সারা শহরে। কি অদ্ভুত কাজই সে নিয়েছে! বিংশ শতকের বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, নিজে লিখে, কম্পোজ ক'রে ছাপিয়ে বিলি করছে কাগজ! কিছুদিন আগেও কি একথা কেউ বিশ্বাস করতে পারত?

নিকল আমাকে বললে: 'আমরা এবার চেষ্টা করছি, বাইরে থেকে কাগজ আনতে। যে কাগজ ছাপাতে হচ্ছে তা এখনও সেই আদিম অবস্থায়ই আছে। আমরা সুবিধে বুঝে নিজেদের একটা ছাপাখানাও করব। জানো তো, প্রতি ছাপাখানার উপর নাৎসীদের কি কড়া নজর! তার উপর ছাপাখানার মালিক হলো সব বুর্জোয়ারা। ইতিমধ্যে কি করতে হয়েছে জানো? রাতে ছাপাখানার দরজা ভেঙে কাজ করতে হয়েছে। ব্যাপারটা খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু কি করব, অন্য উপায় ছিল না। তবে খুব জরুরী না হলে এতখানি ঝুঁকি আমরা নিতাম না। সত্যি, এখন আর বুর্জোয়া ছাপাখানা থেকে কাজ করিয়ে নেয়ার উপায় নেই। ছোট বা মাঝারি ছাপাখানার মালিকরা যে আমাদের ছাপতে দিতে গররাজি তা নয়। নাৎসীদের নিয়ন্ত্রণের ধাক্কায় তাদের আর্থিক অবস্থা এখন সঙ্গীন। মধ্যবিত্তরা হিটলারী স্বর্ণযুগের আশায় বসে থেকে হতাশ হয়ে পড়েছে। সুতরাং টাকা পেলে কাজ তারা নেবে বৈ-কি। একথাও তারা জানে টাকা আমরা ওদের কাজের সঙ্গে সঙ্গেই মিটিয়ে দেব, এমন কি অগ্রিম চাইলেও মিলবে। মুস্কিল হয়েছে, ছাপাখানা তো মিলবে, কিন্তু ছাপার কাজের লোক কোথায়? ছাপাখানার লোকদের দিয়ে কাজ করাতে আমাদের আর মালিকদের দু'দলেরই ভরসা হয় না। কি জানি যদি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে! তাই

নিজেদের লোক নিয়ে গিয়ে ছাপার কাজ করতে হয়। কিন্তু সেখানেও ওস্তাদ মেসিন-ম্যানের অভাব। তারা দিনে হাড়-ভাঙা মেহনত ক'রে আবার রাতে খাটতে পারে না।···তুমি বুঝতেই পারছ কি বিপদেই পড়েছি আমরা। এখন দেখছি নিজেদের ছাপাখানা না করলে আর কাজ চালানো যাবে না। কিন্তু ছাপাখানা যে করব, টাকা কোথায়? আমাদের বেশীর ভাগ লোকই বেকার। তাদের চাঁদা থেকে যা ওঠে, তা দিয়ে প্রেস কেনা অসম্ভব। তাই 'রোনিও' দিয়ে এখন কাজ চালাচ্ছি। এই সারা ভাসেরকাণ্ট এলাকায় মাত্র দু'টি হাত-প্রেসে কাজ চলছে, বাকি সব রোনিও; তবু আমরা দমে যাইনি, এখনও কাগজ রীতিমত বেরোচ্ছে!'

'বাইরের থেকে প্রচারের কাগজ-পত্র আনবার বন্দোবস্ত করছ না কেন?' ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

'তার কারণ হচ্ছে, এখনও পুরোপুরিভাবে আমরা সংস্থা গড়ে তুলতে পারিনি। আর এই গড়ে তোলার জন্যই একখানা সত্যিকারের সংবাদপত্রের দরকার আমরা যা বার করছি, একে বিজ্ঞাপন বলতে পার, কিন্তু সংবাদপত্র নয়। অবশ্য এই নাৎসী জার্মানীতে এমন সংবাদপত্র বলতে একখানাও বেরোচ্ছে কি না সন্দেহ, সবই তো প্রচারপত্র। আমাদের কাগজে যেটুকুও বা প্রকৃত খবর থাকে, নাৎসী কাগজে তাও থাকে না। তাই আমাদের গ্রাহক কম নয়। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, বহু বুর্জোয়ার চিঠির বাক্সে আমাদের কাগজ বিলি করা হয়। আর তার এক মাসের দক্ষিণা দেয় তারা ত্রিশটা মার্ক। কিন্তু কাগজের অভাবে আর গ্রাহক-সাংখ্যা বাড়ানো যাচ্ছে না, তাছাড়া অন্যান্য বই ছাপার তো কোন বন্দোবস্তই ক'রে উঠেতে পারছি না। সবই বাইরে থেকে আমদানি করতে হচ্ছে। উত্তর জার্মানীতে আমরা ডেনমার্ক আর ইংলণ্ড থেকে বই আমদানি করছি।'

'কি ক'রে আনছ?'

নিকলের জবানিতে উত্তর না দিয়ে আমি এখানে ১৯২৪ সালে প্রুশীয় পুলিশ দপ্তর থেকে প্রচারিত এ সম্বন্ধে একখানি সরকারী ইশতাহার উদ্ধৃত ক'রে দিলাম:

"প্রচার-পুস্তিকা প্রভৃতি বাহির হইতে গোপনে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া কি ভাবে জার্মানীতে প্রবেশ করে, তাহা গোয়ন্দা পুলিশ ইদানীং আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে। এই সকল পুস্তিকা বিদেশী নাবিক, রেলওয়ের লোক, সাধারণ পর্যটক ও পার্টির বিশেষভাবে নিয়োজিত লোকের দ্বারা ট্রাক বা গাড়িতে চালান

হইয়া আসে। কখনও কখনও বেলুন এবং বোতলের সাহায্য লওয়া হয়। বাতাস এবং জলস্রোতের দ্বারা চালিত হইয়া ইহারা নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করে; ইহা ছাড়া ডাকবিভাগের সাহায্যেও পুস্তিকা পাঠানো হয়। আমরা কতগুলি বে-আইনী প্রচার-পুস্তিকা পাইয়াছি, তাহার কভারের উপর লেখা—'জার্মান বয়েজ লাইব্রেরী,' 'কি করিয়া ভেষজ গুল্ম বাছাই করিতে হয়,' মমসেনের 'রোমের ইতিহাস,' ইত্যাদি"···

এই ইশতাহারে নিষিদ্ধ পুস্তিকা প্রচারের কৌশল সম্বন্ধেও লেখা আছে। গোপন আন্দোলনকারীরা এই সব প্রচার পুস্তিকা বা ইশতাহার রেলের কামরায় রেখে আসে, কখনো বা ব্যক্তিগত প্রতিনিধির বাক্সগুলির ভিতরেও চালান ক'রে দেয়। তা'ছাড়া ডাকবিভাগের সাহায্য তো নেওয়াই হয়। সেটা কিছু নতুন ব্যাপার নয়। তা'ছাড়া গাড়ি থেকে ছুঁড়েও পথে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, কখনো বা পথচারীর হাতেও গুঁজে দেয়। বড়ই বিপজ্জনক এই উপায়। কিন্তু বিপদকে তুচ্ছ করতে তারা শিখেছে, এই তাদের ধর্ম।

অটোর সঙ্গে শুক্রবার অলস্টার পাভিলিয়নে দেখা হলো। সে ইশারায় আমাকে পাশের টেবিলের দিকে লক্ষ্য করতে বলল। তাকিয়ে দেখলাম, তিনজন লোক বসে আছে পাশের টেবিলে।

'ওই হেলার,' অটো ফিস ফিস ক'রে বললে।

'হেলার, কে হেলার ?'

'হেলারকে চেন না!' অটো বলল: 'হেলার হচ্ছে কমিউনিস্ট গোপন আন্দোলন দমনের জন্য বার্লিনে যে নয়া গোয়েন্দা বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে তার কর্তা। হামবুর্গে হঠাৎ এর আগমন কেন? বোধহয়, এখানকার গোয়েন্দা বিভাগকে একটু তালিম দিতে এসেছে।'

অটো হাসল। দেখ দেখি গাণ্ডেফির্তেল-এ যদি মাল-মশলা সব পাওয়া যেত তাহলে কি আর হেলারকে এই অসময়ে হামবুর্গে ছুটে আসতে হতো গোয়েন্দা বিভাগটিকে আবার ঢেলে সাজাতে? নাৎসী গোয়েন্দা বিভাগ কত পয়সা খরচ ক'রে অমন জাঁকজমকের সঙ্গে হানা দিল অথচ ছেঁড়া কাগজ ছাড়া কিছুই পেল না! নাঃ, কমিউনিস্টদের এ বড় অন্যায়! তারপর দু শ' রিভলভারের ব্যাপার। একটু রসবোধ থাকলে পৃথিবীসুদ্ধ লোক যে আজ দম বন্ধ হয়ে মারা যেত! ডিউকের কাছ থেকে সময়ে খবরটা পাওয়া গিয়েছিল বলেই এই প্রহসনের সৃষ্টি হলো। কিন্তু ডিউককে প্রাণ দিতে হলো, শহীদ

ডিউক !···কি করব, উপায় নেই। কিন্তু আমাদের পেছনে যে জনগণের সমর্থন আছে, একথা সে প্রমাণ করেছে। আর নিজের জীবনের মূল্যে সে পার্টিকে দিয়ে গেছে এক একান্ত প্রয়োজনীয় খবর।'

'কি সে খবর ?'

অটো চুপ ক'রে রইল। এক বছর পরে জানতে পারলাম, ডিউকের জীবনের মূল্যের সে-দান, সেই খবর।

ডিউক আর্ন্টোনার রিক্টের ট্রুপ-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে জানতে পেরেছিল যে, এই দলের ভেতরে বিদেশে গুপ্ত গোয়েন্দাগিরি করার জন্য এক বিশেষ বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে। জার্মানী থেকে যে সব লোক বিদেশে গিয়ে নাৎসী জার্মানীর আসল রূপ প্রকাশ করছে, তাদের বাধা দেওয়াই হচ্ছে এই বিভাগের কাজ। এক বছর পরে এই বিভাগের কার্যকলাপ আমি জানতে পারি। এই বিভাগে যারা কাজ করে তারা কমিউনিস্ট পার্টির ভূতপূর্ব সভ্য, বুদ্ধিজীবী, সুবিধাবাদী। তারা বিদেশে গিয়ে জার্মানী থেকে বিতাড়িত জ্ঞানী-গুণীদের বিরুদ্ধে বিদেশী জনমতকে বিষাক্ত ক'রে তোলে, জার্মানীর সত্যরূপ প্রচারে বাধা দেয়। এই দল হামবুর্গের পররাষ্ট্র বিভাগের অধীনে। গত মহাযুদ্ধের পর পরই পিতৃভূমি জার্মানীর সঙ্গে চল্লিশ লক্ষ প্রবাসী জার্মানের যোগসূত্র স্থাপন করার জন্য এক সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়। তার নাম বি. ডি. এ (Bund der auslands Deutchen, অথবা জার্মান প্রবাসী-সঙ্ঘ) – পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন, প্রতিটি জার্মান এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত। হিটলার ক্ষমতা পাওয়ার পরে এই সংস্কৃতি সঙ্ঘের ভোল বদলে গেছে। এই সঙ্ঘের পুরোনো কার্যনির্বাহক দল বদল হয়ে সেখানে এসেছে ঝুনো ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্টরা। আজ বি. ডি. এ. আর সংস্কৃতি সঙ্ঘ নয় : সংস্কৃতির আড়ালে, সংস্কৃতির নাম ভাঙিয়ে সে আজ গুপ্তচর সঙ্ঘ হয়ে উঠেছে। বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত নাৎসীরা আজ দেশে দেশে এই সংস্কৃতি সঙ্ঘের পুরোধা, তাদের প্রধান কেন্দ্র আজ হামবুর্গের ঝঞ্ঝাবাহিনীর ব্যারাকে। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। জার্মানীর সংস্কৃতি আজ রিভলভরের নিরাপদ-ধৃতি উন্মোচনে, আর জার্মানীর সর্বাধিনায়কই তা গলাবাজি ক'রে জাহির করেছে!

বার্লিনের বিখ্যাত গোয়েন্দাটির দিকে একবার ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখে অটোকে জিজ্ঞেস করলাম : 'তুমি কি ঠিক জানো, হেলার এই ব্যাপারেই হামবুর্গে এসেছে ?'

'ঠিক জানি না বটে, কিন্তু তাই আশঙ্কা করছি। ঐ যে মোটা-সোটা লোকটি, উনিও যে-সে নন! উনি হানৎস্, পুলিশ কর্মচারী। এক সময় সোশ্যাল-ডেমোক্রাট ছিলেন, এখন উনি গোয়ন্দা বিভাগের কর্তা-বিশেষ। ওঁর উপরওলা যিনি, শুনলে বিস্মিত হবে, তিনি এক সময়ে প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন! এই তো অবস্থা!' অটো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

বার্লিনের পুলিশের কর্তাটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। জার্মানীর নতুন ধর্মাধিকরণের এই প্রতিনিধি আমাদের পাশের টেবিলে বসে গল্প করছে; তিনি কি স্বপ্নেও একথা ভাবতে পারছেন যে, তাঁরই পাশের টেবিলে বসে আছে এমন একজন লোক, যাকে তিনি সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করেন, বোধ হয় ভয়ও করেন! সে হামবুর্গের গোয়েন্দা পুলিসের এমন আড়ম্বরপূর্ণ হানা ব্যর্থ ক'রে তাঁকে গোয়েন্দা বিভাগ পুনর্গঠন করার জন্য হামবুর্গে ছুটে আসতে বাধ্য করেছে— একথা কি একবারও ভাবতে পারছেন তিনি! অটোর দিকে একবার তাকালাম, আর একবার চোখ ফিরে গেল গোয়েন্দা পুলিশের কর্তার দিকে। একদিকে মদ-গর্বী অস্ত্র-সুসজ্জিত শাসনযন্ত্র, যার কবলে আজ জনগণের জীবন বিপন্ন, জনগণের অধিকারের প্রতি যে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে নারাজ; আর একদিকে একজন শ্রমিক। শিক্ষা নেই, নেই সংস্কৃতি, ফোন আর বেতারযন্ত্রের সুযোগ নেই, তার পেছনে নেই সুসজ্জিত সেনাবাহিনী—তবু সে লড়ছে, শাসনযন্ত্রকে বিকল ক'রে দিচ্ছে, পরিপূর্ণরূপে বিকল সে করতে চাইছে। অটোর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নুয়ে পড়ল। এই আমার বন্ধু অটো!

অটো এবার হেসে বলল: 'কি ভাবছ? জানো, বার্লিনে ওরা একটা জবর ব্যাপারে হাত দিয়েছে। ব্যাপারটা যদি ঘটে, তখন দেখবে! এখন শোন—'

গোয়েন্দা পুলিশের কর্তার মাত্র পাঁচ ফুট দূরে বসে অটো বলতে লাগল বার্লিনের নিষিদ্ধ পার্টির কর্মসূচী। 'এতদিন তারা সুনিয়ন্ত্রিত হতে পারে নি। কিন্তু লোক তাদের যথেষ্ট, যদি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা না করে, শীগ্‌গিরই এক শক্তিশালী দলে তারা পরিণত হবে। আমি শুনেছিলাম, সোশ্যালিস্ট যুব-সঙ্ঘ খুব সুবিধে ক'রে উঠতে পারছে না, কিন্তু সোশ্যালিস্ট লেবার পার্টি পূর্ণোদ্যমে কাজ করছে। পুরোনো রাজকীয় দলও গোপন আন্দোলন চালাচ্ছে। তাদের প্রচুর টাকা, তাছাড়া জনগণের সহানুভূতিও তারা পাচ্ছে। আমরা বার্লিনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য সংবাদবাহক বিভাগ খুলেছি,' অটো ফিসফিস ক'রে বলে চললো: 'এস্ হচ্ছে এই বিভাগের কর্তা। বার্লিনে ওদের কোন বন্দোবস্ত

নেই। আজ যে সংবাদ এসেছে তাতে জানতে পারলাম, ওরা গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরির বন্দোবস্ত করছে। হাজার হাজার রেকর্ড তৈরি হবে। রেকর্ডের প্রথম পিঠে থাকবে হাল্কা বাজনা বা গান, আর ওপিঠে রাইখস্টাগ অগ্নিকাণ্ডের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিবৃতি। একই দিনে একই সময়ে জার্মানীর প্রতি শহরে পথে পথে এই রেকর্ডগুলো বিক্রি হবে। ওরা একটা পুরোনো কারখানা যোগাড় ক'রে সব করছে। কারখানা আজ দু'বছর ধরে বন্ধ, যন্ত্রপাতি সবই আছে। আমাদের কমরেডরা কয়েকজন ওস্তাদ কারিগর নিয়ে রেকর্ড তৈরি করতে শুরু করেছে। কাজে নানা ফেঁকড়া আছে জানি, তবু রেকর্ড শীগ্‌গিরই শুনতে পাবে সারা জার্মানী, জানতে পারবে রাইখস্টাগ অগ্নিকাণ্ডের জন্য কারা সত্যই দায়ী।···

'সত্যি, কি সময়ের ভেতর দিয়েই আমরা কাটাচ্ছি! কোন লেখক হয়তো আমাদের এই সত্যিকারের এ্যাডভেঞ্চার নিয়ে একদিন বই লিখবে। ওরা রেকর্ড তৈরির গালা পাচ্ছে কোথায় জানো? দোকান থেকে কিনতে গেলে তো ধরে ফেলবে। রেকর্ড তৈরি করতে যা কিছু মাল-মসলা লাগে, সব এক এক ক'রে সংগ্রহ করছে। তারপর সব মিশিয়ে গালিয়ে তৈরি করছে, কিন্তু এখানে আর এক বিপদ আছে। কারখানার চোঙ দিয়ে ধোঁয়া বেরুলেই সব মাটি, সেদিকেও ওদের সাবধান হতে হয়েছে। কেমন একটা প্লট বলো তো? উপন্যাসকেও হার মানায়। এসব মনে ক'রে রেখো বন্ধু, ভবিষ্যতে তোমার উপন্যাসের খোরাক হয়ে রইল।'

সেই শুক্রবারেই "হামবুর্গ একো"র অফিসে সোশ্যালিস্ট যুব-সঙ্ঘের অধিবেশনে আমার যোগ দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঠিক সন্ধ্যায় যাওয়া হলো না; সংবাদ এল, বার্লিনে জন ধরা পড়েছে। জন ফাটেরলাণ্ড প্রমোদাগারে কি জন্য গিয়েছিল, সেখাতে একজন গ্যাসের কারখানার লোক তাকে চিনতে পেরে পুলিশে ধরিয়ে দেয়। জন অবশ্য অস্বীকার করেছিল যে, সে গোপন ষড়যন্ত্রকারীদের কেউ নয়, কিন্তু পুলিশ তার শরীর তল্লাস ক'রে গোপনীয় কাগজ-পত্র পায়।

হামবুর্গে খবর এসে পৌঁছতেই আমাকে অটো বলল: 'এই খবর মারিচেনকে দিতে হবে। কিন্তু কে যাবে?' শেষে ঠিক হলো, একজন সংবাদবাহক যাবে খবর নিয়ে—আমিও তার সঙ্গে যাব। বেচারী মারিচেন! মাসের পর মাস তার ভাই জনকে সে পথে পথে ঝঞ্ঝাবাহিনীর য়ুনিফর্ম পরে ঘুরতে দেখেছে, কিন্তু একটিবারও কথা বলার সুযোগ পায় নি। আজ এল তার ধরা পড়ার খবর!

কি আর করি, মারিচেনের কাছে যেতে হলো। মারিচেন শান্তভাবে সব শুনল। তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল, তবু সে খুঁটিয়ে সব কথা জিজ্ঞেস করল। তাকিয়ে দেখলাম, সে যেন খবরটা শুনে বুড়িয়ে গেছে। অবশ্য বয়সও তার কম হয় নি। সে আর তার ভাই জন গোড়া থেকেই পার্টিতে আছে। নির্যাতন ও অপমান তাকে কম সহ্য করতে হয়নি।

'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ,' মারিচেন ক্ষীণস্বরে বলল: 'কাজ আমাদের চালাতে হবেই। কিন্তু এখন আপনারা অনুগ্রহ ক'রে চলে যান, যান—!'

মনে হলো, সে আর সইতে পারছে না, এবার হয়তো উদ্বেল হয়ে উঠবে কান্নায়। তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চললাম সোশ্যালিস্ট পার্টির অধিবেশনে।

বেশ দেরীই হয়ে গেল। প্রায় ন'টায় গিয়ে হাজির হলাম "হামবুর্গ একো"র অফিসের সামনে। কি ব্যাপার! চারদিকে পুলিশ রাস্তা ঘিরে ফেলেছে। যা শুনলাম তাতে এই বিলম্বের জন্য আনন্দই হলো। এক নিষ্ঠুর নিয়তির হাত থেকে রক্ষা পেলাম। ব্যাপারটা কি প্রথমে বুঝতেই পারলাম না। পরে জানা গেল।

"হামবুর্গ একো"র শিল-মোহর করা বে-আইনী অফিসে সোশ্যালিস্টদের অধিবেশন রীতিমতই বসেছিল। তারা ভাবতেই পারেনি যে, সেখানে পুলিশ হানা দেবে। কিন্তু ভাগ্যের এমনি বিপর্যয় যে, তারা সেইখানেই ধরা পড়ল। আর তাও পড়ল এমন একটি লোকের জন্য, যাদের সঙ্গে তাদের কোন সম্বন্ধ নেই। সোশ্যালিস্টরা সাধারণতঃ যে ঘরে সভা করত, সেখানে সেদিন তাপ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় তারা অন্য ঘরে গিয়ে বসে। এই ঘরটা ঠিক ফেলাগুস্ট্রাস-এর মুখোমুখী। তারা অবশ্য ঘরের পুরু পর্দাগুলো ফেলে দিয়ে ঘরখানা সভার উপযোগী ক'রে নিল, যাতে আলো না বাইরে যেতে পারে।

নটা বাজতে তখন পনেরো: ফেলাগুস্ট্রাস-এ দিয়ে ঝঞ্ঝাবাহিনীর দু'জন পুলিশ রোঁদে বেরিয়েছে। তারা ভাবতেও পারলো না যে, গোপন ষড়যন্ত্রকারীরা তাদেরই একেবারে নাকের নীচে সভা করছে। তারা "হামবুর্গ একো"র অফিসের সুমুখ দিয়ে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ একজন সৈনিক দেখতে পেল, দোতলা থেকে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা এসে পথে পড়েছে। তারা ভাবল, দারোয়ানটাকে একটু ধমকে দেবে। তারা দরজায় গিয়ে ঘণ্টা বাজাল। দারোয়ান দরজা খুলে দেখল, দু'জন ঝঞ্ঝাবাহিনীর উর্দিপরা সৈনিক। সে আর দ্বিরুক্তি না ক'রে দরজায় খিল এঁটে দিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের চিৎকার ক'রে জানিয়ে দিল, পুলিশ এসেছে। চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। সকলেরই পালাবার তাড়া।

তখন দেরী হয়ে গেছে। পুলিশ তু'জনের হুইশল বেজে উঠল, ঝঞ্ঝাবাহিনীর সৈনিকরা এসে ঘেরাও করল বাড়ি। যুব সোশ্যালিস্ট সঙ্ঘের বিপ্লব করা আর হলো না, তারা ধরা পড়ল।

দশটা এরই মধ্যে বেজে গেছে। আমি ফেলাগুস্ট্রাস-এর মোড়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার পিছনে ঝঞ্ঝাবাহিনীর বেড়াজাল। তখনো রাস্তা দড়ি দিয়ে ঘিরে খানাতল্লাস চালাচ্ছে। জনতা ভিড় করছে, পুলিশ ধাক্কা দিয়ে বার বার সরিয়ে দিচ্ছে তাদের। এই হানার যিনি কর্তা, আমি তাঁর সঙ্গে তু'একটা কথা বলার বৃথা চেষ্টা করলাম। এমন সময় আমার মার্কিন সাংবাদিক বন্ধুকে দেখতে পেলাম। তিনি কাছে এসে বললেন : 'পুলিশের সদর থেকে হুকুম না পেলে ওরা কোন সংবাদ দেবে না।'

বারোজন এই হানায় ধরা পড়ল। তাদের নিয়ে যাওয়া হলো সদর কোতোয়ালির সেই কুখ্যাত ২০৩ নং ঘরে। চলল জেরা। তু'একজনকে বেদম প্রহারও করা হলো। ভোরে তাদের মধ্যে পাঁচজনকে সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে ফুলস্‌বুত্তেল-এর জেলে পঠোনো হলো।

তরুণ সোশ্যালিস্টরা তবু দমল না। আবার তারা নতুন ক'রে দল গড়ে তুলল। তাদের নেতারা অজ্ঞাত ছিলেন। তাই দেশের অন্যান্য সোশ্যালিস্ট দলের সঙ্গে নতুন ক'রে যোগসূত্র স্থাপন সম্ভব হলো। এক বছর চলে গেল সেই দল গড়তে। এবার সারা দেশের বিভিন্ন দলগুলিকে একসূত্রে বাধা হলো, যোগ-সূত্র স্থাপিত হলো। কমিউনিস্ট ও তরুণ সোশ্যালিস্ট, এই তুই দলই বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠল। কিন্তু তু'দল এক হয়ে কাজ করতে এগিয়ে এল না। সেই ছত্রভঙ্গের দিনে জার্মানীর প্রতিটি বে-আইনী সঙ্ঘই পরস্পরকে সাহায্য করেছিল, তারা ছিল একতাবদ্ধ; সুনিয়ন্ত্রিত হবার পর তাদের একতাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। তবু আশা রইল, ভবিষ্যতের বিপ্লবে তারা এক হয়েই লড়বে।

কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরেও নানা পরিবর্তন দেখা দিল। কাজ পুরোদমেই চলতে লাগল। কোন দলাদলি সৃষ্টি হলো না। ভিতরের সংঘাতের সময় তখন নয়, তখন সবাই একযোগে বাইরের সংঘাতের মোকাবিলার জন্য তৈরি। মাঝে মাঝে পার্টির নেতাদের ধরে তাঁদের স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য পুলিশের অকথ্য নির্যাতন চলতে লাগল। পুলিশ জানতে চাইল, তাঁদের অস্ত্রাগার, তাঁদের ছাপাখানার হদিশ, কিন্তু তাঁরা কি স্বীকার করবেন? তাঁরা মাত্র দলের পাঁচ-ছ'জনকে ছাড়া কাউকে চেনেন না। তখন কমিউনিস্ট পার্টি ছোট ছোট দলে

বিভক্ত হয়ে গেছে। প্রতি দলে পাঁচজন কি ছ'জন সভ্য। নেতারাও সভ্য হিসেবে এই পাঁচজন কি ছ'জনের খবর জানতেন, তার বেশি নয়।

আর গোপন ছাপাখানা? কেউ তার হদিশই জানত না!

অস্ত্রাগার? কমিউনিস্টদের অস্ত্রাগার তো ঝঞ্ঝাবাহিনী আর পুলিশের ব্যারাকে ব্যারাকে।

ঠিক কিছুদিনের ভেতরেই হামবুর্গের ঝঞ্ঝাবাহিনীর সেই বিখ্যাত বিদ্রোহ শুরু হলো। ঝঞ্ঝাবাহিনীর নেতা বোকেনহাওয়ার হিটলারের প্রতিনিধি কাউফমানকে চড় মেরে বসলেন। শুরু হলো বিদ্রোহ। কয়েক হাজার মানুষ এই বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই বিদ্রোহের বীজ যে বুনেছিল, সে আমাদের এস্।

এস্ ইতিমধ্যেই ঝঞ্ঝাবাহিনীর একটি দলের নায়ক হয়ে বসেছিল। সে নায়কত্ব পেয়ে শুরু করল ঝঞ্ঝাবাহিনীর মধ্যে প্রচার। সে ব্যারাকে ব্যারাকে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগল। বক্তৃতার বিষয় হলো, 'সোশ্যালিজম বলতে মার্কসবাদীরা কি বোঝে'। কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে গোপনে গোপনে দেখাশুনাও করতে লাগল। এইভাবে যে ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হলো, আজও তারই দৌলতে বে-আইনী দলগুলো নাৎসীপার্টির ভিতর কাজ করতে সক্ষম হচ্ছে। একে ষড়যন্ত্র যদি বলা হয়, তো বলতে হবে ষড়যন্ত্রের ক্লাসিক।

বিদ্রোহ শুরু হতেই এস্ হামবুর্গের ঝঞ্ঝাবাহিনী থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আজও সে বার্লিনে বসে ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে। একদিন সে আমাকে বলেছিল, গোয়েরিঙের সঙ্গে এক রাতে করমর্দন করার সময় তার বলতে ইচ্ছে করছিল, কমিউনিস্টরা ষড়যন্ত্রে বিশ্বাস করে না। তারা সময় হলে সমষ্টিগতভাবে আঘাতই হানবে।

'হারমান - ' এস্ এই কথাই বলতে চেয়েছিল: 'শোনো "বন্ধু", এখন আমি তোমার পাশে পাশে যাচ্ছি, তুমি আমাকে ঝঞ্ঝাবাহিনীর একজন পদস্থ কর্মচারী ভেবে বন্ধুভাবে কথা কইছ। কিন্তু একবারও কি ভাবতে পারছ, আমি কমিউনিস্ট! তোমার বুকে যদি একটা বুলেটের গর্ত ক'রে দিই, কি তোমার জমকালো উর্দির উপর যদি একটা বোমা ফেলি—কি করতে পার তুমি! আমার কথা? মরতে কি আমি ভয় পাই? কিন্তু কেন তা করছি না জানো? আমাদের সে-মতও নয়, পথও নয়।'

এস্ বলেছিল: 'দু'একবার গোয়েরিঙের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তুমি ভাবতেও পারবে না কি কষ্টে যে চুপ ক'রে থেকেছি।'

এস্ বার্লিনে যাওয়ার পর নিকল তার জায়গায় এল। অটো ছাড়া এবার তার আর একজন সহযোগী জুটল। সে ফ্রাউ বি।

এবার এলো সেইদিন ঘনিয়ে, যে দিনের কথা আমি ভুলব না, ভুলতে পারি না।

পয়লা জুন, ১৯৩৩ সাল। অটো, অটো সেদিন ধরা পড়ল!

অটো ধরা পড়ার দু'একদিন আগে পলার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম; পলা বাড়িতেই ছিল। দরজা খুলে দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল, কোন কথা বলল না। আমি দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করলাম। সে কথা বলল না, শুধু অকারণে হাসতে লাগল। জিজ্ঞেস করলাম: 'কি ব্যাপার?'

'কি ব্যাপার? ব্যাপার কিছুই নয়।' পলা চিৎকার ক'রে উঠল।

তাকে হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে তার পাশে বসলাম।

বললাম: 'পলা, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না?'

সে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল: 'না।'

তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। অনেকক্ষণ কেটে গেল, এবার সে মাথা তুলল, চোখের জল মুছে ফেলল।

'কি হয়েছে পলা?'

পলা বলতে লাগল। তার স্বর স্পষ্ট। ক্রমে সে উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'আমি সব জানি। হাঁ, সব জেনে ফেলেছি। মনে করবেন না আমি অন্ধ। সত্যিকথা এতদিন আমাকে আপনি কেন বলেন নি? অটোকে আমি ভালোবাসি। সে যদি একবার মুখ ফুটে বলত, সে অন্য মেয়েকে ভালোবাসে, আমাকে চায় না—আমি স্বচ্ছন্দে তাকে বিদায় দিতাম, হাসিমুখেই দিতাম। সে তো সুখী হতো! সে যেতে চাইলে আমি তাকে ছেড়ে দিতাম না,—তেমন মেয়ে আমি নই! কিন্তু সে আমাকে ঘুণাক্ষরেও কোন কথা জানায় নি। এখন নাকি সে কার সঙ্গে সংসার পেতেছে, যাতে চিনতে না পারি তাই দাড়ি রেখেছে। আমার ভাই সব খবর আমাকে দিয়েছে। আমি জানি সে সুন্দরী। আমার তো সব সৌন্দর্য শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সে আমাকে বলল না কেন? আমি তার পথের কাঁটা হতাম না। এই বুঝি গোপন আন্দোলনের কাজ! দিব্যি সুন্দর মেয়ে নিয়ে সংসার পাতিয়ে বসেছে!'

'পলা,' আমি বললাম: 'তোমারই জন্য দেখছি অটো বিপদে পড়বে। আমাকে জিজ্ঞেস না ক'রে কিছু ক'রে বসো না।' এই বলে পলার কাছে বিদায়

নিয়ে অটোর কাছে গেলাম। অটো বাড়ি নেই। তার অফিসে, শহরের প্রতি স্কোয়ারে, প্রতি পানশালায় তাকে খুঁজে বেড়ালাম, কিন্তু দেখা মিলল না। প্রতি জায়গায় লিখে রেখে এলাম বিপদ উপস্থিত।

কিন্তু অটো ফিরল না।

পলার কাছে আবার ফিরে গেলাম, সে বেশ শান্ত হয়েছে। সে জিজ্ঞেস করল, আমার শেষ কথার কি মানে। তাকে বুঝিয়ে বললাম অটোকে ধরবার জন্য গোয়েন্দা পুলিশ জাল পেতেছে, আর পলার ভাইকে তারা অস্ত্ররূপে ব্যবহার করছে, যাতে পলা তার স্বামীকে ধরিয়ে দেয়।

পলা কাঁদতে লাগল। বলল : 'না না, তা কখনোই হতে পারে না। আমার ভাই মিথ্যে বলে নি। আমি যে সেই মেয়েটাকে নিজের চোখে দেখেছি!'

পলা মেয়েটির যা বর্ণনা দিল, বুঝতে পারলাম, সে আর কেউ নয়, মারিচেন। বললাম : 'যাকে সেদিন তুমি অটোর সঙ্গে দেখেছ, সে গোপন আন্দোলনের একজন কর্মী। তার ভাই বার্লিনে ধরা পড়েছে। খবর পেয়েছি, সে আর বেঁচে নেই।'

পলা চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠল, তাকে আর সান্ত্বনা দেবার তখন সময় নেই। সর্বনাশ যা করবার তা সে ক'রে ফেলেছে। অটোর গুপ্ত বাসস্থানের খবর পুলিশ জেনে গেছে। হয়তো মুর ভাইডেনস্ট্রাস-এর ব্রাউন হাউসের দপ্তরে হুলিয়া তৈরি হয়ে গেছে অটোর নামে। অটোকে ধরিয়ে দিয়েছে তার স্ত্রী পলা, তার ভাই নাৎসীদের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কি ক'রে তারা সেই অশিক্ষিত মজুরের ছেলেকে ভুলিয়ে এমন সর্বনাশ ঘটাল? কি ক'রে তারা পলাকে স্বামী-হন্ত্রীতে পরিণত করতে পারলো? কি যে নাৎসী ন্যায়শাস্ত্র, জানিনা।

পরদিনও কেটে গেল। খবরের জন্য রইলাম উন্মুখ হয়ে। রবিবার এল, এল সোমবার, মঙ্গলবার। অটোর তবু দেখা নেই। পার্টি অফিসেও তার দেখা নেই; কেউ তাকে এ ক'দিন দেখেনি। কিন্তু এইখানেই কি অটোর জীবনের যবনিকা পড়ল? না।

বুধবার পয়লা জুন। অটো একটা মোটরভ্যানে ক'রে বার্লিন থেকে হামবুর্গে আসছিল। তার সঙ্গে ছিল হাজার হাজার বে-আইনী গ্রামাফোন রেকর্ড। রেকর্ডের শুরুতে লা ত্রাভিয়াতার দু'তিনটি গৎ, তারপরেই—"রাইখস্টাগ অগ্নিকাণ্ডের সত্য রূপ"। ঐদিন ঠিক এই সময়ে আরও কয়েকখানি মোটরভ্যান বার্লিন আর রূঢ়-এর পথে ঘুরছিল। রেকর্ড বিক্রি করার তখনো কয়েক

ঘণ্টা বাকি। তারপর একই সঙ্গে, একই সময়ে রূঢ়, হামবুর্গ আর বার্লিনের পথে বিশ ফেনিগে প্রতি রেকর্ড বিক্রি হবে। সবাই পরিচয় পাবে নাৎসী চাতুর্যের, জনগণ হবে সজাগ।

অটো ড্রাইভারের পাশের সীটে বসে শিস দিচ্ছিল।

দু'একদিন আগের কথা। হামবুর্গের প্রতি পুলিশ এবং ঝঞ্ঝাবাহিনীর প্রতি সৈনিককে একখানি ক'রে ফটোগ্রাফ বিতরণ করা হয়েছিল। কমিউনিস্ট গুপ্ত আন্দোলনকারীদের নেতাদের কাছেও সে ফটোগ্রাফ পৌঁছে গিয়েছিল কিন্তু ফটোগ্রাফ দেখে তাঁরা বুঝতে পারেন নি যে, সেখানা অটোরই ছবি। কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামালেন না। অটো, অটোর বিপদ হতে পারে—একথা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি।

হামবুর্গ-বার্লিন মেইন রোডের লেভেল ক্রসিঙের সামনে দু'জন পুলিশ পাহারা দিচ্ছিল। লরি আর ভ্যান এসে জমেছে পথে, গেট খোলার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশ দু'জন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। একজন একটা সিগারেট বার ক'রে ধরাতে গেল, পকেট হাতড়ে দেখল, দেশলাই নেই। সামনের একটা ভ্যানে উঠে ড্রাইভারের কাছে দেশলাই চাইল।

ড্রাইভারের পাশের লোকটাকে দেখে মনে হলো, এরই নামে বোধহয় হুলিয়া বেরিয়েছে। সিগারেট মুখে চেপে আস্তে আস্তে বলল : 'নিচে নেমে এস।'

অটো হেসে ড্রাইভারকে বলল বিড়বিড় ক'রে : 'যত তাড়াতাড়ি পার চলে যেও!' সে পকেট হাতড়াতে লাগল। ট্রেন চলে গেছে, গেট এবার খুলবে।

'আমার কাছে তো দেশলাই নেই।' অটো বলল : 'দাঁড়াও বন্ধু, ওভারকোটের পকেটে খুঁজে দেখি।'

পুলিশটি তো তার এই শান্তভাব দেখে অবাক! তার সঙ্গীটি এবার তার পাশে এসে জিজ্ঞেস করল : 'ব্যাপার কি? লোকটাকে নামতে বলছ কেন? দেশলাই তো আমার পকেটেই আছে।'

'লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে এ সেই লোক, যার নামে হুলিয়া বেরিয়েছে। নেমে এস, দেরি করো না।'

অটো আবার হাসল। গেট এবার খুলছে। একমুহূর্তে সে কর্তব্য স্থির ক'রে নিল। হয় নিজেকে, নয় তো এই মালপত্র পুলিশের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। এখন জোরে গাড়ি চালিয়ে গেলে নম্বর টুকে নিয়ে পুলিশ গাড়ি খুঁজে বার করবে। আমি জানি না, তখন সে আর কিছু ভেবে ছিল

কিনা। বসন্ত এসেছে। হয়তো সে একবার তাকিয়ে দেখেছিল সবুজ গাছপালার দিকে। হয়তো সূর্যের দিকে তাকিয়ে বিদায় নিচ্ছিল।

* * *

ধীরে ধীরে সে নেমে এল। ড্রাইভার ধীরভাবে ক্লাচটা ঠেলে দিল। গেট খুলছে, তাদের গাড়ি সবার আগে গেট পার হয়ে যাবে। অটো বলল : 'চলে যাও, আমার জন্যে ওপাশে অপেক্ষা করবে। আমি অতটা পথ হেঁটে যেতে পারব না।'

ড্রাইভার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর শাঁ ক'রে বেরিয়ে গেল।

যদি বা সন্দেহ ছিল, তার কাগজপত্র প্রমাণ ক'রে দিল, সে অটো ছাড়া আর কেউ নয়। তার ভাগ্য স্থির হয়ে গেল। পুলিশ দু'জন তাকে হাত-কড়া পরিয়ে দিল। তারা তখন খুশিতে উপচে পড়ছে। পাঁচশ মার্ক—পাঁচশ মার্ক পুরস্কার!

ভ্যান হামবুর্গের দিকে ছুটে চলল। যখন ভ্যানের কথা তাদের স্মরণ হলো তখন গাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেছে। অটোকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, গাড়ির সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। তার অনুরোধে গাড়ির ড্রাইভার তাকে পথ থেকে তুলে নিয়েছিল। পুলিশরা তার কথা হয়তো বিশ্বাস করল, হয়তো করল না, যাহোক ভ্যানখানা তো নিরাপদে পৌছল; আর পৌছল নাৎসী-স্বরূপ প্রকাশের অস্ত্র হাজার হাজার রেকর্ড।

এই কি তার আত্মোৎসর্গের মূল্য?

অটো কোন কথা বলে নি। যারা তাকে জেরা করার সময় দেখেছিল, তারা বলেছে, তার মুখ তখন এক রক্তাক্ত ক্ষতে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু ঠোঁট তখনও দৃঢ়বদ্ধ। একটি কথাও সে বলল না। বেলা তখন অপরাহ্ন, আকাশে সূর্যের উপরে মেঘের আচ্ছাদন জমে উঠেছে। ঘরে ঘরে আলো জ্বেলেছে সবাই। মুখ? মুখ নয় তার, এক রক্তাক্ত ক্ষত! কিন্তু কথা সে বলে নি।

হামবুর্গ, মহানগরী হামবুর্গ! লাখ লাখ লোক এর পথের হাওয়ায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। শ্রমিক রাতদিন খাটে এরই কলকারখানায়। মেয়েরা প্রশস্ত সড়ক দিয়ে গর্বিত পদক্ষেপে যৌবনের বিভ্রম দেখিয়ে চলে যায়। আজ রাতে বিছানায় শুয়ে তারা চোখ মুদে ঘুমোবে, যৌন পরিতৃপ্তি পাবে দেহের ঘর্ষণে, তৃপ্তির নিশ্বাস ঝরে পড়বে—সন্তান-সম্ভবা হবে তারা। শিশুরা

ঘুমোবে দোলনায়। কি সুন্দর তারা! ছোট ছোট হাত, ছোট ছোট আঙুল, কচি মুখ, নরম ঠোঁটে হাসি, তুলতুলে কান! ঈশ্বর! কী সুন্দর তোমার এই পৃথিবী!

এক রক্তাক্ত ক্ষত! ওই কি অটোর মুখ? তুমি কি মৃত, বন্ধু, না এখনও তোমার ক্ষত থেকে জীবনীশক্তি ঝরে ঝরে পড়ছে? তোমাকে ঘিরে ওই নরপিশাচরা কি করছে? তোমার রক্তাক্ত হাতে সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরো চেপে ধরছে, তোমার চোখেও? তোমার হাত অসাড় হয়ে আসছে, বেদনা-বোধও বুঝি হারিয়ে ফেলেছ বন্ধু? কিন্তু কে ওরা? হিটলারের সৈনিক, হিটলারের প্রতিনিধি!

ঈশ্বর, কী অপরূপ সৌন্দর্যে মহীয়সী তোমার এই পৃথিবী!

মৃত্যু, রক্ত আর ভীতি শাসন করছে এই ভূমি। কারা-প্রাচীরের অন্তরালে কি ঘটছে আর কি ঘটবে—সবাই জানে। তাই আমরা রক্ত-বিলিপ্ত পদদলিত মুখ তুলে, আমাদের বিচূর্ণ দেহ নিয়ে জিজ্ঞেস করছি: 'এখনও চিৎকার ক'রে উঠছ না কেন? সময় কি আসে নি? আসে নি?'

আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু এগারো মাস বন্দীশিবিরে কাটিয়ে জার্মানীর বাইরে পালিয়ে গিয়েছিলেন। মুক্তির পর আটদিন মাত্র জীবিত ছিলেন তিনি। তারপর আত্মহত্যা করলেন। তাঁর শেষ চিঠি আমি পেয়েছিলাম। তিনি ভাবতে পারেন নি, বাইরের পৃথিবী এত উদাসীন! হিটলারের জার্মানী তার রক্তমাখা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে; আর বাইরের পৃথিবী সে-হাতে হাত মেলাচ্ছে। হত্যাকারীর হাতে হাত মেলাচ্ছে শাসকগুলো।

০ ০ ০

হে প্রভু, কী অপরূপ সৌন্দর্যে মহীয়সী তোমার পৃথিবী!

০ ০ ০

'চিৎকার ক'রে ওঠ, তাহলে চিৎকার ক'রে ওঠ—'

০ ০ ০

দুপুর থেকে পরদিন ভোর পর্যন্ত পলা কোতোয়ালির চারতলার বন্ধ দরজার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

এগিয়ে চলল আন্দোলন। এগিয়ে চলল পৃথিবী।